সাহিত্য ও পাঠক

শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

॥ কল্লোল প্রকাশনী ॥
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
আগষ্ট ১৯৫৯ সাল

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শোভা রায়
কল্লোল প্রকাশনী
এ-১৩৪, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট

প্রচ্ছদপট :
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত

মুদ্রক :
শ্রীজ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়
পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা—৬

ব্লক :
নিউ হাফটোন (প্রা লিঃ)
১ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১

বাঁধাই :
দি নিউ ষ্টার কোং
৭২।৩, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা—৯

মূল্য : পাঁচ টাকা মাত্র

ভূমিকা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পটভূমিও ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এককালে কাব্য অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ পদই ছিল সাহিত্য শিল্পীর মনের ভাব প্রকাশের একমাত্র বাহন। সাহিত্য তখন ছিল 'একতারা যন্ত্রের' মত। ক্রমে ক্রমে নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন তার ঐ যন্ত্রে সংযোজিত হওয়ায় আজ সাহিত্য বহু সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিতে সক্ষম 'বীণাযন্ত্র'-এ পরিণত হইয়াছে। সুরের পরিচয় জানা না থাকিলে যেমন সঙ্গীতের আস্বাদ সম্যকরূপে গ্রহণ করা যায় না তেমনই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বৈশিষ্ট্য অবগত না হইলে সাহিত্যরসের আস্বাদগম্যতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শিল্পী সৃষ্টি করেন আপন মনের আনন্দে, সমালোচক সেই সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া নানা সংজ্ঞায় তাহাকে অভিহিত করেন। পাঠক সাধারণের বোধগম্যতার জন্যই সমালোচকের এই প্রয়াস।

সমালোচকের এই দায়িত্ব পালনের জন্যই এই গ্রন্থের সৃষ্টি—এমন অভিমান আমার বিন্দুমাত্রও নাই। কোন প্রকার মৌলিকতার দাবীও আমি করিতেছিনা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে প্রচলিত যে-সব সুবিখ্যাত মতবাদ আছে, বলিতে গেলে আমি তাহাদের সার-সঙ্কলন করিয়াছি মাত্র। হিন্দু কলেজে বাঙ্গলা অনার্স ক্লাসের ছাত্রদের পড়াইতে গিয়া এইরূপ একখানি গ্রন্থ রচনার কথা মনে জাগে। অতঃপর বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকা 'সমকালীন' সম্পাদক বন্ধুবর সুকবি আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের প্রেরণায় কতকগুলি প্রবন্ধ রচিত হয় এবং 'সমকালীন'-এ প্রকাশিত হয়। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমানের ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই গ্রন্থ রচনায় প্রয়াস পাইয়াছি তথাপি প্রবন্ধগুলি যাহাতে একেবারে ছাত্রপাঠ্য রচনার আকৃতি ধারণ না করে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছি। সাহিত্যরস উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক সাধারণ পাঠকের প্রয়োজনীতার দিকটিও বিস্মৃত হই নাই।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি শ্রীমান পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে যে অক্লান্ত সাহায্য পাইয়াছি তাহার উল্লেখ প্রথমই করিতেছি। উপকরণ সংগ্রহ, নোট নেওয়া, প্রেস কপি তৈয়ারী করিয়া দেওয়া প্রভৃতি নানা ভাবে সে আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। সর্বোপরি এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাহার গভীর আগ্রহ আমাকে স্বভাব-আলস্য হইতে দূরে রাখিয়াছে। বস্তুতঃ তাহার

সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থের প্রকাশ যে কবে হইত তাহা বলিতে পারি না। শ্রীমান শরদিন্দুমোহন সরকারও আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছে। উহারা উভয়ই আমার স্নেহভাজন ছাত্র। জীবনে তাহারা কৃতী হউক এই কামনা করি। আমার কনিষ্ঠ মাতুল শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র ভট্টাচার্যের সাহায্যও স্মরণ করিতেছি। তবে মাতুলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বোধ হয় অবকাশ নাই।

বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি। যথাস্থানে গ্রন্থকারদের নাম উল্লেখ করিতে ভুলি নাই। যদি কোথায়ও বাদ পড়িয়া থাকে তবে তাহা নিতান্তই অনবধানতাবশতঃ। তজ্জন্য পূর্বাহ্নেই ত্রুটি স্বীকার করিয়া রাখিতেছি। গ্রন্থকারদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া পরিশিষ্টে সুদীর্ঘ গ্রন্থ-পঞ্জী সংযোজনা করিয়া অকারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করি নাই। যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহার সবগুলিই হিন্দু কলেজের গ্রন্থাগার হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। মফঃস্বল কলেজের পক্ষে এত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার অন্যত্র আছে কিনা জানি না। কলেজের গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রযত্নের ফলেই ইহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশে যাঁহাদের আগ্রহ আমাকে প্রেরণা যোগাইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু কলেজের সহাধ্যক্ষ শ্রীযুত অনন্তকুমার চক্রবর্তী, বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত সুকুমার ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক সুবক্তা শ্রীযুত ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক সুসাহিত্যিক শ্রীযুত অজিতকৃষ্ণ বসু, গ্রন্থাগারিক শ্রীযুত স্বদেশ-রঞ্জন হালদার, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের বাঙ্গলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জয়পুরিয়া কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত নির্মলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুত অনিলকুমার রায় চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থের কোন তথ্যগত প্রমাদ সম্পর্কে সুধীজনের নির্দেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হইবে।

আগষ্ট, ১৯৫৯ সাল,
হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙ্গা
২৪ পরগণা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সাহিত্যের নানা বিভাগ

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ

কাব্য ও সাহিত্য

'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাহাই হোক না কেন ইহা এখন অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সব কিছুই এখন 'সাহিত্য'—এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যাপক অর্থে এখন 'সাহিত্য' কথাটি ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতে 'কাব্য' কথাটিও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইত। কালিদাস-ভবভূতির নাটক, বাল্মীকি-বেদব্যাসের মহাকাব্য, বাণভট্টের কাদম্বরী, হর্ষচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ 'কাব্য' এই সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট হইত। অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 'কাব্য'-এর স্থান অধিকার করে 'সাহিত্য'।

সাহিত্যের সংজ্ঞার এই বিবর্তন পাশ্চাত্য সাহিত্যেও আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। সংস্কৃতের 'কাব্য' শব্দের ন্যায় পাশ্চাত্যের 'পোয়েট্রি' কথাটি এককালে খুবই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন 'লিটারেচর' 'পোয়েট্রি'-র স্থান দখল করিয়াছে। এখন শুধু যেমন ছন্দোবদ্ধ পদ বুঝাইতে আমরা 'কাব্য' কথাটি ব্যবহার করি তেমনই এই অর্থে পাশ্চাত্যে 'পোয়েট্রি' শব্দটির ব্যবহার হয়।

এই কাব্য বা সাহিত্য বস্তুটি কি ?

রস ও কাব্যের জগৎ

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সংবেদনশীল হৃদয়ে নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে। উত্তুঙ্গ গিরিমালা, নিঃসঙ্গ মরুপ্রান্তর, কলনাদিনী স্রোতস্বিনী, বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র, অনন্ত সুনীল গগন মানুষের মনে যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বিপুল বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। মানুষ এই রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটন করিতে চায়।

অপরদিকে অতি সাধারণ জিনিষ, যেমন একটি বিশীর্ণ বৃক্ষ, তাহার নিষ্পত্র শাখা, একটি নেড়ী কুকুর, এমন কি একটি মরা ইঁদুর পর্যন্ত সংবেদনশীল চিত্তে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিতে পারে। ভাবুকের হৃদয়কে এই আলোড়ন পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। প্রকাশ না করা পর্যন্ত আলোড়িত চিত্ত শান্ত হয় না। কিন্তু এইখানেই একটি প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, ভাবুক অর্থাৎ কবি বা সাহিত্যিক কি করিয়া নিজের ভাবকে প্রকাশ করিবেন। চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহার সার্থক প্রতিচ্ছবি ভাষায় ফুটাইয়া তুলিলেই কি কবির কর্তব্য সমাধা হইল? তাহা হইলে কবি ও সংবাদপত্রের রিপোর্টারের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? বস্তুতঃ, কবি কখনও তাঁহার দৃষ্ট বস্তুর হুবহু বর্ণনা দিয়া শান্তি পাইতে পারেন না। কারণ বহির্বিশ্ব কবির মনে এক নূতন জগতের সৃষ্টি করে। কবির হৃদয়ে সেই কাল্পনিক জগৎ পরমমায়ায় বিধৃত। এই জগৎ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:—

> বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

অর্থাৎ ভগবান সৃষ্ট জগৎ আর কবি সৃষ্ট জগৎ এক নহে। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এবং

তাঁহার সৃষ্টিক্ষমতার এক কণিকা লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা যেমন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষও তেমনই তাহার নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করিতে চায়।

> সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানাভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।—রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু কবি তার কল্পনা দ্বারা সাহিত্যের জগৎ সৃষ্টি করিলেও তাহা একেবারেই অপ্রাকৃত বায়বীয় নয়, তাহার সঙ্গে আমাদের এই পরিচিত জগতের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহা অনেকটা এই পরিচিত জগতেরই প্রতিরূপ। কারণ, জীবন ও জগৎকে রূপায়িত করিতে না পারিলে তাহা সাহিত্য হয়না। যে সাহিত্যে জীবনের বা আমাদের এই পরিচিত জগতের চিত্র নাই তাহার আবেদন আমাদের চিত্তগ্রাহ্য নয়। রামায়ণ, মহাভারতে বহু অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে কিন্তু তবুও উহাদের রস আমাদের মনকে উজ্জীবিত করে কেন? করে এইজন্য যে, তাহাতে একদিকে যেমন ঐ যুগের সমাজ ও সভ্যতার একটা পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে জীবনের শাশ্বত কতকগুলি উপাদান ঐ সকল গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

অবশ্য বাস্তব জগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়াই কবিকে যে পুরাদস্তুর বাস্তববাদী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন, রোমান্টিক সাহিত্যের কথাই ধরা যাক না কেন? তাহারও মূলে জগৎ ও জীবন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অহরহ যে পীড়ন অনুভব করে তাহা হইতে সে মুক্তি চায়। রোমান্স তাহাকে সেই ঈপ্সিত মুক্তি দেয়। দরিদ্র কেরাণী ধনাঢ্য শিল্পপতির কন্যাকে বিবাহ করিবার আশা করিতে পারে না। কিন্তু নাটকে বা ছায়াচিত্রে যখন এই অসম্ভব ঘটনাটি ঘটিতে দেখি তখন আনন্দ হয়। 'দত্তা' উপন্যাসে নরেন্দ্রনাথ যখন বিজয়ার প্রণয় লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করে তখন তাহার সঙ্গে আমরা গভীর সাযুজ্য অনুভব করি। সেইজন্যই কবি যদি জগৎ ও জীবনের সম্পর্কহীন কোন বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেন তখন তাহা দার্শনিক তত্ত্বে পরিণত হইয়া যায়, তাহার সঙ্গে রসসাহিত্যের কোন সম্পর্ক থাকে না। বিজন সমুদ্র-

সৈকতে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে যখন নবকুমারের সাক্ষাৎ হয় তখন নিজেকে নবকুমার ভাবিতে ইচ্ছা করে। ঘটনাটি অসম্ভব নয় কিন্তু সচরাচর কাহারও জীবনে এই ধরণের ঘটনা ঘটেনা। সাহিত্যের যে জগৎ তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতিরূপ কিন্তু সেই সঙ্গে উভয়ের মধ্যে যে একটা পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ভুলিবার উপায় নাই। তাহাতে আশ্চর্য হইবারও কিছু নাই। যে জগতে আমরা বাস করি তাহাকে আমরা সকলেই কি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করি না? স্বর্ণাভ সূর্যাস্তের দিকে তাকাইয়া সকলেই কি একই প্রকার অনুভূতির দ্বারা আলোড়িত হই? প্রত্যেকেই নিজের উপলব্ধি অনুসারে তাহাকে গ্রহণ করি। কল্পনাকুশলী কবিরা আরেক ধাপ আগাইয়া যান। তাঁহারা শুধু নিজের অনুভূতি বা উপলব্ধি লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, অপরের মনে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি অনুভূতির সৃষ্টি করিতেছে তাহাও তাঁহারা অনুভব করিতে চান, তাহারও আস্বাদ গ্রহণ করিতে চান। অর্থাৎ বাস্তব জগতের অনুরূপ আরেকটি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া জীবনরস নানা ভাবে পান করিতে চান। যদিও তৎসৃষ্ট জগৎ পরিদৃশ্যমান জগতের অনুরূপ বলিয়া মনে হয় তবুও তাহা বাস্তবানুভূতি ও কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট এক স্বতন্ত্র জগৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই জগতের উদ্ভব কবির মানসলোকে এবং প্রকৃত পক্ষে মায়ার দ্বারা (কল্পনাময়ী চেতনার দ্বারা) তিনি ইহাকে সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ রস ও কাব্যের জগৎ মায়ার জগৎ এবং তাহা লৌকিক জগতের একটি কল্পনাগ্রাহ্য আস্বাদ মাত্র।

সাহিত্য প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে

"কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।" কবি তাঁহার মায়াবী কল্পনা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগতের অনুরূপ আরেকটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাই বলিয়া কবি-সৃষ্ট জগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের হুবহু প্রতিরূপ নহে। কবি-সৃষ্ট জগতের এই তাৎপর্যের দিকটি লক্ষ্য না করিয়া গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছিলেন—আর্ট বস্তু-সত্যের অনুকৃতি মাত্র। অর্থাৎ সাহিত্য বিশ্বসৃষ্টির অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে জগৎকে আমরা প্রতিনিয়ত

দর্শন করিতেছি সেই জগৎই যেখানে আসল রূপের সন্ধান দিতে পারিতেছে না, সেখানে এই মনুষ্যসৃষ্ট সাহিত্য-রূপ নকল জগৎ কি করিয়া পরম সত্যের সন্ধান দিবে? তাই তিনি কবিকুলের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কবিদিগকে তাঁহার 'আদর্শ রাজ্য' হইতে নির্বাসনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্লেটোর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। এই জগতে প্রতিনিয়ত যাহা ঘটিতেছে তাহাই সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্য নির্বিচারে উহাদিগকে প্রকাশ করেনা। জগতে যাহা ঘটিতেছে সেই সকল সত্যের মধ্যে যাহা মহৎ, যাহা জীবনের পক্ষে পরম কল্যাণজনক এবং যাহা সুন্দর ও মহৎ আদর্শের দ্যোতক অর্থাৎ যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর—সাহিত্য তাহারই প্রতিকৃতি।

সাহিত্য বহির্বিশ্বের অনুকরণ নহে এই জন্য যে, বাহিরের জগতে নিরন্তর যাহা ঘটিতেছে, যাহা আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে জানা, আমাদের সাহিত্য জগৎ তাহাকে লইয়া গড়িয়া উঠে না। এই জানার ভিতর দিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে যে অজানা, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সীমার বাহিরে যে অনন্ত ও অসীম জগতের অশ্রুত সঙ্গীতধ্বনি অবিরত সংবেদনশীল হৃদয়ে আসিয়া অনুরণন জাগাইয়া তুলিতেছে, সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহাকে লইয়া। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পরিচিত জগৎটা অনেকাংশে উপলক্ষ মাত্র। লক্ষ্য সেই অজানা।

'স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে।'

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যাহা অজানা তাহাকে লইয়া সাহিত্যের সৃষ্টি হয় কিরূপে? তাহা সাহিত্য হয় এইজন্য যে, যাহা অজানা, বুদ্ধির সুতীব্র রশ্মিদ্বারা যাহাকে স্পষ্টীকৃত করা যায় না, তাহা সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে একটি রসস্পন্দন রূপে আবির্ভূত হয়। এই স্পন্দন হৃদয়কে এক অনির্বচনীয় রসাবেশে আপ্লুত করিয়া দেয়। তাই সাহিত্যের জগৎ অলৌকিক এবং অবাস্তব হইলেও তাহা অসত্য নহে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

> যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে, তাহাই সৃষ্টি। যাহা

স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।

কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়াসমেত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়াসমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা অপর দিকে আধ্যাত্মিক দোষ জন্মে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বহির্জগৎ ও সংবেদনশীল হৃদয়-সৃষ্ট অলৌকিক মায়ার জগৎ এই উভয়ের সংমিশ্রণে যে জগৎ গড়িয়া উঠে এবং যাহা সত্য, শিব ও সুন্দরকে প্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য। বাস্তবকে অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে অন্ধভাবে অনুকরণ করিলে যেমন সাহিত্য গড়িয়া উঠে না তেমনই শুধুমাত্র কল্পনাশ্রয়ী চিন্তাও সার্থক সাহিত্যের বাহন হইতে পারে না। কল্পনা যখন বাস্তবের অনুগামী হয়, অর্থাৎ উহা যখন সম্ভাব্য ঘটনাকে রূপদান করে, তখনই সৃষ্টি হয় সাহিত্য। এইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বস্তুরাশি পুঞ্জিত হইলেও তাহা রসোত্তীর্ণ হয় নাই। অন্যদিকে মায়াবী কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট চিত্র বাস্তব ঘটনার সমকক্ষতা দাবী করিতেছে। তাই দেখি ‘সম্মানের চির নির্বাসনে, সমাজের উচ্চমঞ্চের সঙ্কীর্ণ বাতায়নে’ বসিয়া থাকিয়াও রবীন্দ্রনাথ ‘কিনু গোয়ালার গলি’-র,

গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি
মাছের কান্‌কো
মরা বেড়ালের ছানা—
ছাইপাশ আরো কত কীযে।

এই সার্থক রূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

তাই দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকিকে বলেন,

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি,
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

প্লেটোর শিষ্য এরিষ্টটল গুরুর ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন :—

> The truth of poetry is not a copy of reality but a higher reality; what to be not what it is.

বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক হাড্‌সনও তাই বলিয়াছেন :—

> By poetic truth we mean fidelity to our emotional apprehensions of facts...........Our first test of truth in poetry, therefore, is its accuracy in expressing, not what things are in themselves, but their beauty and mystery, their interest and meaning for us.

অর্থাৎ এক কথায় সাহিত্য হইতেছে 'interpretation of life.'

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের সংজ্ঞা হইতেছে :—

> বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

অন্যান্য কলাবিদ্যার আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহারা প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। কলাবিদ্যা বলিতে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, অভিনয়কলা এবং নৃত্যকলা প্রধানতঃ এই কয়টিকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতে বস্তুর ভাব নাই, ইহা শুধু বন্ধনহীন সুরকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে। বনের পাখীদের কূজন হইতে ভারতীয় ঋষিরা সঙ্গীত সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতের মূলে অনুকরণের স্পর্শ থাকিলেও ইহা শিল্পীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। কারণ সঙ্গীতের আবেদন দেশ-কালাতীত এবং সঙ্গীত ক্ষণিকের জন্য হইলেও মানুষের মনকে এই পরিচিত জগতের সীমা ছাড়াইয়া অসীমের অনুভূতিতে পূর্ণ করিয়া তোলে।

অভিনয় কথাটির মধ্যেই অনুকরণের অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু এই অনুকরণ বাস্তব জীবনের অন্ধ অনুকরণ নয়। সাহিত্যে নাট্যকার যে জীবনকে 'আপনার মনের মাধুরী মিশায়ে' রূপদান করেন অভিনয়শিল্পী তাহাই নিজস্ব অভিব্যক্তির মাধ্যমে ফুটাইয়া তোলেন। কাজেই অভিনয়-শিল্পকেও প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ বলা চলেনা।

নৃত্যকলাও তো অনুকরণ নহে। যখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই তখন নৃত্যই মনের ভাব প্রকাশের বাহন ছিল। প্রেমিকাকে প্রণয়মুগ্ধ দেখিয়া

প্রেমিকের মনে যে বিপুল ভাবাবেগের সঞ্চার হইত প্রেমিক অপূর্ব দেহভঙ্গিমার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করিত। ইহার মধ্যে অনুকরণ কোথায়? দেবমন্দিরে ভক্ত দেবতাকে প্রণাম করিয়া থাকে কিন্তু প্রণামনৃত্যে যে ভঙ্গি ফুটিয়া উঠে তাহা কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়?

চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্যেও অনুকরণ আছে সত্য কিন্তু তাহাও সেই মায়ার জগতের অনুযায়ী। মানুষ প্রথমে অনুকরণ করিত সত্য কিন্তু যখন তাহার রসবোধ পুষ্টিলাভ করিল তখন সে 'খোদার উপর খোদকারী' আরম্ভ করিল। তাহার লীলাময় সত্তা তাহাকে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিল। শুধুমাত্র কয়েকটি রেখার মাধ্যমে যে পরমসত্যকে বিধৃত করা যায় তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারিল। হিন্দুমন্দিরগুলির বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে, বৌদ্ধস্তূপগুলির এইদিকে সেইদিকে যে পরম রমণীয় চিত্রকলার নিদর্শন দেখি তাহা কি বাস্তব জীবনের অনুকৃতি মাত্র? কখনই তাহা নহে। অথচ সেইগুলির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে আমরা যেমন একদিকে বাস্তব জীবনের স্পর্শ পাই অন্যদিকে তেমনই তাহারা আমাদের মনকে এক অনির্বচনীয় সুধারসে আপ্লুত করিয়া দেয়। শুধুমাত্র অনুচিকীর্ষা বৃত্তি হইতে এই রূপলোক সৃষ্টি অসম্ভব ছিল।

আসল কথা হইতেছে, বিশ্বের অনির্বচনীয় স্বরূপকে ভাষা দিতে মানুষ বদ্ধপরিকর, কারণ সে যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সমগোত্রীয়। কিন্তু প্রকাশ করা যায় কি করিয়া? সৃষ্ট হইল নূতন ভাষা, বিচিত্র কলা কৌশল, অঙ্গভঙ্গি অর্থাৎ সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদি। জীবন ও জগতের অনির্বচনীয় স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সাধনা দ্বারাই সে জীবন ও জগৎকে লইয়া সৃষ্টি করিয়াছে নূতন এক জগৎ। জগতের এই নূতন রূপই সাহিত্য-সৃষ্টি এবং অন্যান্য কলা-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে। এবং ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল রসসৃষ্টি। সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে আমরা জীবনের ফটোগ্রাফ-সুলভ প্রতিচ্ছবি দেখিতে চাই না। তাহাদের মধ্যে জীবনের রসরূপের আস্বাদই আমাদের কাম্য। কাজেই সাহিত্য ও অন্যান্য সকল প্রকার কলাবিদ্যার মধ্যে অনুকরণের প্রয়াস থাকিলেও তাহারা প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে।

সাহিত্যের সামগ্রী

মানব-মন আদিম যুগ হইতে নানাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকাশের নানা রঙ, নানা ভঙ্গি। আদিম যুগে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্ন ভঙ্গির আশ্রয় লইত। অপরের মনোরঞ্জনের প্রচেষ্টার অন্তরালে সেইদিন হয়ত কোন গূঢ়ার্থ নিহিত ছিল না। কিন্তু সেই প্রকাশ-ব্যাকুলতার জঠরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে শিল্প। শিল্প শিল্পীর হৃদয়ের অনুভূতির ইন্দ্রিয় ও হৃদয়গ্রাহ্য রূপ। মানুষ এই পৃথিবীর বস্তুসম্ভার হইতে আপন মনের গহনে আহরণ করে রস। মানবের সৌন্দর্য-পিপাসু মন প্রকৃতির অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে অভিভূত হইয়া তাহার সত্তাকে আপন মনের গহনে অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। সে সর্ব ইন্দ্রিয় দিয়া এই রসসুধাকে উপলব্ধি করিতে চায় সর্বদেহে মনে। মানুষের অনুভূতি যদি আপন তৃপ্তিতেই সীমিত থাকিত তাহা হইলে শিল্প জন্ম গ্রহণ করিত না। মানুষ আপনাকে বিস্তার করিয়া দিতে চায়। এই প্রয়াসই সমস্ত প্রকৃতির রাজ্যে বিরাজমান। কিন্তু মানবেতর সৃষ্টিতে এই বিস্তার কেবল বংশ বিস্তারে সীমিত, মানুষের বিস্তার-ব্যাকুলতা কেবল মাত্র আত্মজ সৃষ্টিতে থামিয়া থাকিতে পারে না। তাই মননশীল মানুষ কেবল মাত্র আপন দেহই নয়, আপন অনুভূতিকেও উত্তর পুরুষের কাছে মেলিয়া ধরিতে চায়। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়—এইগুলির মাধ্যমেই মানুষ আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। ইহারাই শিল্পকলা।

এই শিল্পের বিষয়বস্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা এই প্রকৃতি হইতেই আহৃত। সেই জন্যই শিল্পকে বলা হয় প্রকৃতির অনুকৃতি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, তাহা হইলে প্রকৃতিতে যাহা দেখি তাহাকেই যদি শিল্পের সামগ্রী বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা হইলে শিল্পের স্বতন্ত্র মর্যাদা কোথায়?

সাহিত্য এই শিল্পেরই অঙ্গীভূত। মানুষ প্রতিনিয়ত আপন মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ভাষা মনের ভাব প্রকাশের

একটি সঙ্কেত মাত্র। যাহা প্রতি মুহূর্তে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছি তাহাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছাতেই জন্ম হইয়াছে সাহিত্যের। চিত্রশিল্পী পটের উপর তুলি দিয়া অঙ্কন করেন প্রকৃতির বিভিন্ন ছবিকে। কিন্তু উহাদিগকে যথাযথ রূপে না ফুটাইয়া চিত্রশিল্পী তাহার সহিত আপন মনের রসকে মিশাইয়া তাহাকে আরও রসময় করিয়া তুলেন। সাহিত্যও পাঠকের চোখের সম্মুখে চিত্রকে ফুটাইয়া তোলে বর্ণনার সাহায্যে। যখন কালিদাস শকুন্তলার বনতোষিণী মূর্তির বর্ণনা করেন তখন পাঠকের চোখের সামনে শকুন্তলার এক অনবদ্য মূর্তি রূপ পরিগ্রহ করে। সঙ্গীত মনের অনির্বচনীয় সুর তন্ময়তাকে প্রকাশ করে। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে যে সুর প্রতিনিয়ত ভাসিয়া বেড়ায় তাহাকে রূপ দিতে চায় সঙ্গীত ও সাহিত্য। মানুষের অন্তরের সুরের এই প্রবাহকে উহারা প্রকাশ করিয়া তোলে। গীতি-কবিতার ছন্দে অথবা গীতিধর্মিতার মধ্যে দিয়া সাহিত্য এই সুরকেই প্রকাশ করিতে চায়। সাহিত্য তাহার চিত্রধর্ম এবং গীতি-ধর্ম লইয়া তাই শিল্পের রাজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

সাহিত্যকে বিচার করিতে গেলে তিনটি জিনিষের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাহিত্যিকের মন, বস্তুজগৎ এবং প্রকাশ-ভঙ্গি—এই তিনটি লইয়াই গড়িয়া উঠে সাহিত্য। যে মানুষ বস্তুজগতের মাধুর্যে কেবল মাত্র নিজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে আমরা কবি বা সাহিত্যিক বলিতে পারি না। তাহার মন এবং অনুভূতি লইয়া সে নিজেই যদি মগ্ন থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে পৃথিবীর মানুষের বিন্দুমাত্র উপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহার সেই অনুভূতির প্রকাশেই সাহিত্যের সামগ্রী। এই প্রকাশ যদি কেবল মাত্র আপনার ভাবোচ্ছ্বাস হয় তাহার সহিত যদি পৃথিবীর মানুষের মনের কোন যোগ না ঘটে তাহা হইলে তাহা লিখিত হইলেও সাহিত্য হিসাবে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না। তাহা হইলে এই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস সাহিত্যের সামগ্রী হইবে না। যাহা সর্বজনবেদ্য তাহাই কেবল মাত্র সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে।

সাহিত্যের সামগ্রীর বিচারে বস্তুজগতের আলোচনাই আসিয়া পড়ে সর্বাগ্রে। মানবের ব্যক্তিসত্তার বাহিরে যে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগৎ তাহার অনির্বচনীয় রূপ-মাধুর্য লইয়া বিরাজ করিতেছে তাহাই হইল বস্তু-জগৎ। প্রকৃতি, জীবন ও অদৃশ্য শক্তি যাহা মানুষের সুখ দুঃখের নাগালের বাহিরে

দাঁড়াইয়া অবিরত প্রাণচাঞ্চল্যকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে তাহাই হইল সাহিত্যের সামগ্রী। এক কথায় মানব-জীবন, বিশ্বপ্রকৃতি, পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য সেই সত্তা যাহা এই প্রাণচাঞ্চল্যের কেন্দ্রীভূত শক্তি,—সমস্তই হইতেছে সাহিত্যের সামগ্রী। ইহা যখন সাহিত্যিকের অন্তরের জারক রসে জারিত হইয়া নবতর রূপ-পরিগ্রহ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহা হইয়া উঠে সাহিত্য।

এই প্রকাশ যখন ভাবরূপ পরিগ্রহ করে তখন তাহা সাহিত্যের সংজ্ঞা লাভ করে। সাহিত্য কেবল মাত্র জ্ঞানের কথাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে না। কারণ জ্ঞানের যে কথা তাহা একবার বলিলেই জানা হইয়া যায়। কিন্তু সাহিত্য যাহা বলে তাহার পুনরাবৃত্তি মনে কখনও ক্লান্তি আনেনা। কারণ মানুষের মন সেই পুরাতনের বক্ষ হইতেই নিত্য নূতন সৌন্দর্যের ফল্গু ধারাকে আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হয়। জ্ঞানের কথা আজ নূতন হইতে পারে, আজ তাহাতে নূতনত্বের চমক থাকিতে পারে, কিন্তু আগামী দিনে তাহা অতি পুরাতন ও সাধারণ হইয়া যাইবে। তদুপরি আজিকার জ্ঞান আগামী দিনে ভ্রান্ত বলিয়া বাতিল হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য চিরন্তনী। যুগের প্রহরা অতিক্রম করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের পথে সে তাহার ইশারা মেলিয়া রাখে। তাই সাহিত্যে বস্তু-জগতের ভাবময় রূপই মূর্তি পরিগ্রহ করে। জ্ঞানের আবেদন বুদ্ধির কাছে আর ভাবের আবেদন হৃদয়ের কাছে। সাহিত্য হইতেছে এই হৃদয়ের ধন। কালিদাসের মেঘদূতের বিরহী যক্ষ আজ আর এই মরজগতের চতুঃসীমায় নাই, কোনদিন হয়ত ছিলও না, কিন্তু কালিদাস তাঁহার মনের যে বিরহ বেদনাকে চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও বর্ষার আগমনে মানব মনের অন্তঃস্থলে নিবিড় আনন্দের সঞ্চার করে। কারণ কালিদাস বিরহের তত্ত্বকে লিপিবদ্ধ না করিয়া তাহার ভাবকেই সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন যুগান্তের পারের মানুষের মনে, আর ইহাই সাহিত্যের কাজ। তাই সাহিত্যের সামগ্রী হইবার দাবী জ্ঞানের বিষয় হইতে ভাবের বিষয়েরই অধিক। তবে কি জ্ঞানের বিষয়ের সাহিত্যের সামগ্রী হইবার কোনই অধিকার নাই। জ্ঞানের বিষয়ও সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে যদি তাহা কোন ভাবমূর্তি লইয়া আপনাকে অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে পারে। জগদীশচন্দ্র

বসু তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রবন্ধে জ্ঞানের বিষয়কে এক ভাব-মূর্তি দান করিয়া পাঠকের মনে মহাদেবের জটা হইতে গঙ্গাবতরণের চিত্রকে সার্থকভাবে অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাহা বিজ্ঞানের পরিধি ছাড়াইয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সর্বমানবের হৃদয়গ্রাহী সুন্দরমূর্তি লইয়া যাহাই প্রকাশিত হইবে তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকাশের অন্তহীন নীলিমাই হউক আর জীবনের কুশ্রীতাই হউক।

সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়কে সুন্দর হইতে হইবে এবং সত্য হইতে হইবে। এই সত্য কি? সাহিত্য যদি বাস্তব সত্যকে তাহার স্বরূপে প্রকাশ না করে তাহা হইলে কি সত্যের অপলাপ হইবে? অনেকে মনে করেন যে, যেহেতু সাহিত্য প্রকৃতির অনুকৃতি সেইহেতু যাহা এই প্রকৃতিতে নাই তাহার রূপায়ণ প্রকৃত পক্ষে অসত্যেরই রূপায়ণ এবং যেহেতু সাহিত্য সত্যের বাহক সেইহেতু সাহিত্যে এই প্রকার রূপায়ণের কোন স্থান নাই।

কিন্তু সাহিত্যের সত্য আর বাস্তবসত্য এই দুইটি পরস্পরবিরোধী না হইলেও এক নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহার পরিচয় লাভ করি, যাহা আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ তাহাই বস্তুগত সত্য। কিন্তু সাহিত্য প্রকৃতির সকল কিছুকেই যথাযথরূপে গ্রহণ করে না। তাহাকে ঝাড়াই বাছাই করিয়া তবে গ্রহণ করে। মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতি হইতে রস আহরণ করে। সেই রস তাহার মনের রসায়নাগারে চোলাই হইয়া নবতর অনুভূতির রূপ পরিগ্রহ করে। আর এই অনুভূতি নব নব ভাবে বিলসিত হইয়া সাহিত্যে ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে।

মানুষ জীবনকে সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিতে চায়, জীবনের বেদীমূলে সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। এই চাওয়া ও পাওয়ার দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই মানুষের অগ্রগমন ঘটে। পাওয়াটা সত্য কারণ তাহা প্রত্যক্ষগোচর। আর চাওয়াটা কি অসত্য, তাহা অনুভূতিগোচর বলিয়া? ইহা হইতেই পারে না। মানুষ জীবনে যাহা চায় কিন্তু পায়না তাহাকে সে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। এই চাওয়া বাস্তবে পরিণত না হইলেও তাহা অসত্য নহে। সম্ভাব্য যাহা কিছু মানুষ কল্পনার রঙে রঙীন করিয়া অপরের সম্মুখে উপস্থিত করে সাহিত্যের সত্য তাহাই। এবং ইহা সত্যের অপলাপ নয়। আর সাহিত্য তো প্রকৃতির অনুকৃতি নয়।

মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে উপাদান সংগ্রহ করে ঠিকই কিন্তু যথাযথরূপে যদি তাহাকে তুলিয়া ধরিত তাহা হইলে যাহা কিছু বলিবার ছিল সমস্তই এতদিনে বলা হইয়া যাইত এবং যাহা কিছু বলা হইত সমস্তই হইত জ্ঞানের বিষয় মাত্র। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে মানুষের অনুভূতির তারে নূতন নূতন সুর সংযোজিত হইতেছে। এই সুরের নবীনত্ব কোনদিন ঘুচিয়া যায় না। প্রতিমুহূর্তে মানুষ আপনার মধ্যে আপনি পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্তনের জন্যই মানুষের অনুভূতিও নিত্য নূতন থাকিতেছে। এই নিত্য নূতন অনুভূতি লইয়া মানুষ প্রকৃতিকে নিত্য নূতন রঙে অবলোকন করে এবং সেই নবীনতাই সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাই সত্য। দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি তারস্বরে যতই পৃথিবীকে মায়া বলিয়া ঘোষণা করুক পৃথিবী যেমন সত্য ইহাও সেইরূপ সত্য, কারণ ইহা অনুকৃতি নয়, অনুসরণ নয়, ইহা সৃষ্টি।

সাহিত্যের সামগ্রী কোন্‌গুলি এবং কোন্‌গুলি সাহিত্যের সামগ্রী নয় এই বিচার করা কখনও সম্ভব নয়। যাহা মানুষের হৃদয়ে চিরকালীন আবেদন লইয়া প্রবেশ করিতে চায় তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী।

সাহিত্যের সত্য ও বাস্তব সত্য

যাহা প্রতিনিয়ত চোখের সামনে ঘটিতেছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি তাহাই একমাত্র সত্য, না হৃদয় দিয়া যাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি তাহাই যথার্থ সত্য—ইহা লইয়া যথেষ্ট বাগবিতণ্ডা হইলেও এই সম্পর্কে একটি স্থির মীমাংসা কাব্যরচনার সেই আদি যুগেই হইয়া গিয়াছে। ক্রৌঞ্চীর বিরহে কাতর ক্রৌঞ্চের বেদনা বাল্মীকি মুনিকে ভাবাপ্লুত করিয়া দিলে তিনি তাহা প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হইলেন। কি ভাবে তিনি তাহা প্রকাশ করিবেন, তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন :-

ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

যুগ যুগ ধরিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশু আমাদের মনে যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত করাইতেছে, রক্তিম সূর্যাস্ত প্রত্যহ আমাদের মনে ক্ষণিকের জন্য হইলেও যে সৌন্দর্যানুভূতি জাগাইয়া তুলিতেছে তাহাই কি চিরন্তন সত্য নহে ?

> আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়। দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মত জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। ……… … সূর্য যে পূর্ব দিকে ওঠে একথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না; কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীব সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন-কি, অনুভূতি যত প্রাচীনকাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে, ততই তাহার গভীরতা বৃদ্ধি হয়, ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।—রবীন্দ্রনাথ

সত্যকে আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই আবার তাহাকে হৃদয় দিয়াও উপলব্ধি করি। সত্যকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের কাজ। কিন্তু 'সত্যকে যখন আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনই তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি।' বাস্তব সত্যের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যের পার্থক্য স্পষ্টই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বাস্তব সত্যের পরিবর্তন হইতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে মানুষ এই কথাই জানিত কিন্তু আসল ঘটনা যে তাহার বিপরীত একদিন তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল। নভোমণ্ডলের সৃষ্টি কৌশল আজ আমাদের যে বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে কিছুকাল পরে আমরা তাহার রহস্যের সমাধান করিয়া ফেলিব। কিন্তু সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে পূর্বাকাশ যে অপরিসীম সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে, তাহা চিরকালই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরও হৃদয়কে আলোড়িত করিতে থাকিবে।

> সাহিত্যে ও আর্টে কোন বস্তু যে সত্য, তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ, সে বস্তু যদি এমন একটি রূপ-রেখা-গীতে সুষমা-যুক্ত ঐক্য লাভ করে, যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়।
>
> তা যদি না হয়, অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তাহলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।—রবীন্দ্রনাথ

ব্যাধের শরে নিহত ক্রৌঞ্চীর জন্য ক্রৌঞ্চের বিরহ-বেদনা বাল্মীকির কাব্যে অমর হইয়া রহিয়াছে। ব্যাধ কি ভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া ক্রৌঞ্চীকে

নিহত করিয়াছিল, বাল্মীকি সে চিত্র আঁকেন নাই। কিন্তু তবুও ক্রৌঞ্চের বেদনা ও তাহাতে বাল্মীকির বেদনা এই উভয়বিধ বেদনাই তিনি আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কি কৌশলে? কৌশল আর কিছুই নয়। আদি কবি সোজাসুজি আমাদের হৃদয়ের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধির নিকট আবেদন ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী হয়। কিন্তু হৃদয়ের নিকট আবেদন চিরস্থায়ী। শিলঙের রাজপথে বহু মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। তাহাদের সচিত্র বিবরণ আমরা কতই না পাঠ করিয়াছি, অনেকে প্রত্যক্ষও করিয়াছি। কিন্তু ঐ অগণিত দুর্ঘটনার একটিকেও কি মনে রাখিতে পারিয়াছি? রবীন্দ্রনাথও ঐ রকম দুর্ঘটনা এক আধটি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিতে পারেন এবং সেই বিবরণ তিনি যখন অমিত ও লাবণ্যের কাহিনীর মধ্যে দিয়া প্রকাশ করেন তখনই তাহা চিরকালের সামগ্রী হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সাহিত্য শুধুমাত্র হৃদয়বৃত্তির ব্যাপার, তাহাতে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধিবৃত্তির কোন স্থান নাই এ ধারণা কিন্তু নিতান্ত অমূলক। ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই হৃদয়ে পৌঁছাইতে হয়। ইন্দ্রিয়ই হৃদয়ের দ্বার। সাহিত্যিক বস্তু-জগতের বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহা রসাশ্রিত করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। তাহা পাঠ করিয়া আমাদের মনশ্চক্ষে যে চিত্র ভাসিয়া উঠে তাহা হৃদয়গ্রাহ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের চক্ষুও তো ইন্দ্রিয়। আসল কথা হইতেছে এই বস্তু-জগৎকেই আশ্রয় করিয়া সাহিত্যিক চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

> সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এইজন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদ হচ্ছে একের স্বাদ; অসীমের স্বাদ।—রবীন্দ্রনাথ

তেমনই শুধু তথ্য নয় সাহিত্য আস্বাদন করিতে হইলে বুদ্ধিরও প্রয়োজন। জল ও তেলের পার্থক্য বুঝিতে যেটুকু বুদ্ধির প্রয়োজন, উৎকৃষ্ট সাহিত্য উপলব্ধি করিতে গেলে তাহার চেয়ে আরও কিছু বেশী প্রয়োজন।

ইহা অবশ্য শুদ্ধমাত্র বুদ্ধি নয়, ইহা চেতনা হইতে উদ্ভূত একটি শক্তি বিশেষ। ইহাকেই প্রজ্ঞার দৃষ্টি বলা যাইতে পারে। কিন্তু হৃদয়ই হইতেছে

সাহিত্যরসের ক্ষরণস্থান। সাহিত্যের আনন্দকে তাই খেলার আনন্দের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের কথা ভুলিয়া আমরা যেমন নিছক অপ্রয়োজনের আনন্দে খেলায় মাতিয়া উঠি, তেমনই বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিলে সাহিত্যের আনন্দ লাভ করা যায় না।

তাহা হইলে এই কথা স্পষ্ট হইল যে, বস্তুজগতের সত্যই কবির সৃষ্টিকৌশলে কাব্যজগতের সত্যে রূপান্তরিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন :—

> বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ্ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে, তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত-তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

অর্থাৎ বাহিরের জগৎ এক স্বতন্ত্র মহিমায় কবির অন্তরের নিজস্ব জগতে পরিণত হয়। বাহিরের জগতের খণ্ড-খণ্ড চিত্রের শূন্যস্থানগুলি কবি আপনার কল্পনার দ্বারা পূর্ণ করিয়া নেন। অবশ্য সকলের মনেই যে এই বাহিরের জগৎ বিচিত্ররূপ ধারণ করে তাহা নয়, শুধুমাত্র বিশেষ ধরণের মনের অধি-কারীদের হৃদয়েই এই জগতের সৃষ্টি হয়।

বাহিরের জগৎ যখন কবির হৃদয়ে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তখন কবি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কবির মনে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কবি এমন ভাবে প্রকাশ করেন যাহাতে পাঠক-সাধারণ তাহা বুঝিতে ও উপভোগ করিতে পারে। কারণ কবির হৃদয়ের সংবাদ যদি পাঠকের হৃদয়ে গিয়া না পৌঁছিতে পারে তবে কাব্যের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং, কবিকে এমনভাবে তাঁহার হৃদয়ের সত্যকে প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তাঁহার অনুভূত ভাবগুলি পাঠকের হৃদয়ে গিয়া তদনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা হইলে মোটামুটি প্রক্রিয়াটি হইতেছে এই—

> সাধারণের জিনিষকে বিশেষ ভাবে নিজের করিয়া, সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষ ভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।—রবীন্দ্রনাথ

অর্থাৎ কবি বস্তুজগতের জিনিষ (সাধারণের জিনিষ) প্রথম নির্বিশেষে আত্মসাৎ করেন। তাহাকে হৃদয়বৃত্তির রসে জারিত করিয়া ব্যক্তিগত করিয়া তোলেন, আবার সেই ব্যক্তিগত জিনিষকেই সর্বসাধারণের করিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন।

জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য

সাহিত্যকে দুইটি প্রশস্ত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তত্ত্ব বা তথ্যমূলক সাহিত্য (জ্ঞানের সাহিত্য) এবং ভাবের সাহিত্য। ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ নিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। জ্ঞানের সাহিত্যে লেখকের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ আছে নিঃসন্দেহে কিন্তু তাহা কখনই তাঁহার অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে না। এই জ্ঞানের সাহিত্যকে এক কথায় প্রবন্ধ সাহিত্য বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। জ্ঞানের সাহিত্য বলিতে আমরা সাহিত্যের সেই অংশকেই বুঝি যাহা বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পুষ্ট করে—যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব-পরিচয়', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারত শিল্পে মূর্তি', অনাথগোপাল সেনের 'টাকার কথা', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা'। এইগুলিতে নানা বিষয়ে তথ্য পরিবেশিত হইলেও ইহারা সাহিত্য গুণসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু 'প্রাথমিক পৌর বিজ্ঞান ও অর্থনীতি' বা 'মাধ্যমিক রসায়ন' প্রভৃতিতে অজস্র তথ্য থাকিলেও তাহারা সাহিত্য নয়। অবশ্য জ্ঞানের সাহিত্য বিশুদ্ধ সাহিত্য পদবাচ্য নয়। কারণ বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবেদন হৃদয়ের কাছে আর জ্ঞানের সাহিত্যের আবেদন বুদ্ধির কাছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির যতই বিকাশ হইবে এই জ্ঞানের সাহিত্য ততই উন্নত হইবে। সৌরমণ্ডল সম্পর্কে আজ যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কয়েক বছর পরে আর তাহার কোন মূল্য থাকিবে না। কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে' বা 'পূরবী' গ্রন্থের মূল্য চিরকাল অপরিবর্তিত থাকিবে। শত বৎসর পরের যুগের মানুষেরও হৃদয়কে ইহারা অলৌকিক রসে মণ্ডিত করিয়া তুলিবে। অবশ্য এমন সার্থক শিল্পী আছেন যিনি জ্ঞানের সাহিত্যকেও কালজয়ী করিয়া তুলিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করিতে পারি।

জ্ঞানের সাহিত্যকে যুগধর্মী বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ কোন এক যুগে মানুষ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে চিন্তা করিয়াছে জ্ঞানের সাহিত্য মোটামুটি তাহাকে নিয়াই গড়িয়া উঠে। তেমন প্রতিভা-শালী শিল্পীর হাতে এই জ্ঞানের সাহিত্যও চিরন্তন আবেদন লইয়া উপস্থিত হইতে পারে, অবশ্য তেমন নিদর্শন খুবই বিরল। জ্ঞানের সাহিত্যকে যদি বলি সাময়িক তাহা হইলে ভাবের সাহিত্যকে বলিব চিরকালের। প্রথমটির আবেদন বুদ্ধিগ্রাহ্য কিন্তু দ্বিতীয়টির আবেদন হৃদয়গ্রাহ্য।

> জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয়না। আগুন গরম, সূর্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়। ...... কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শান্তিবোধ হয় না। সূর্য যে পূর্বদিকে ওঠে এ কথা আর আমাদের মন আকর্ষণ করে না। কিন্তু সূর্যোদয়ের যে সৌন্দর্য ও আনন্দ তাহা জীব সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে।—রবীন্দ্রনাথ

ভাবের সাহিত্যকে creative literature বা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বলা হয়। অর্থাৎ সাহিত্যিক জীবন ও জগতের ছবিকে আপনার মনের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এই ভাবের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যও সাহিত্যিকের মৌলিক চিন্তাশীলতার ফলে অনেক সময় ভাবের সাহিত্যে পরিণত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'লোকসাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' ইত্যাদি গ্রন্থ। সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত', ভাবের সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তেমনি অনেক সময় দেখা যায় ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থও ভাবের সাহিত্য সুলভ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস', রবীন্দ্রনাথের 'ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাজেই সাহিত্যকে মোটামুটি জ্ঞানের সাহিত্য ও ভাবের সাহিত্য এই দুই ভাগে ভাগ করিলেও ইহাদের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার বলে সাহিত্যিক বাস্তবের তথ্যকেও সাহিত্যের চিরকালীন সত্যে পরিণত করিতে পারেন।

কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। আসল সাহিত্য ভাবের বিষয়কে নিয়াই গড়িয়া উঠে জ্ঞানের বিষয়কে নিয়া নহে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

একটি বহুল-প্রচলিত উপকথায় আছে, একদা একটি কুক্কুট আহার অন্বেষণ করিবার সময় একটি মণি দেখিতে পাইয়াছিল। কুক্কুটটি ইহাকে বদরীফল মনে করিয়া আহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঠোঁট দিয়া মণিটিকে বিদ্ধ করিতে না পারায় সে উহাকে হেলায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সংসারের কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশ করিবার সময় আমরা সাধারণ মানুষেরা অনেকটা ঐ কুক্কুটটির মত আচরণ করি। আমরা বস্তুটি সম্বন্ধে কোন রায় দিতে হইলে সর্বাগ্রে বিচার করিতে বসি বস্তুটির পার্থিব উপযোগিতা কতটুকু এবং তাহার দ্বারা আমাদের বাস্তব জীবনের কতটুকু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যে বস্তু দ্বারা আমাদের বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহাই আমাদের অতি আদরের সামগ্রী। যাহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন প্রয়োজনেই আসে না, যাহার উদ্দেশ্য আমাদের পার্থিব অভাব পূরণ করিবার জন্য নহে, তাহাকে আমরা জীবন-খাতার বাম পার্শ্বে ইলেক চিহ্ন দিয়া রাখিয়া দিই। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন উহার উদ্দেশ্য কি?

তাই সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের প্রকৃতিগত এই আদিম প্রশ্নটি টানিয়া আনি। দ্বিধাহীন ভাবে আমরা সাহিত্যিককে প্রশ্ন করিয়া বসি—উদ্দেশ্য কি? সাহিত্যকারেরা তো জীবনশিল্পী। জীবনের কোন আদর্শকে তাঁহারা সাহিত্যের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিতে চলিয়াছেন।

কিন্তু ইহা রসপিপাসুর কথা নহে। ইহা বিষয়ী লোকের কথা। সাহিত্যের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে রসিকের কোন কিছু আসে যায় না। সাহিত্য রসকে ব্যঞ্জনা করে। আর আস্বাদনের বাহিরে রসের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশ্লেষণের পরীক্ষাগারে সাহিত্যের শব ব্যবচ্ছেদ ঘটাইলে তাহার প্রাণ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নির্ণয় ও তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার-বিতর্ক একটি বড় বালাই ব্যতীত আর কিছুই নহে। নির্ঝরিণীর চঞ্চল জলধারা হইতে যদি শিশি করিয়া খানিক জল আনিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে হয়ত বিজ্ঞানীর

সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে জলের মধ্যকার বীজাণুসমূহ তাহাদের সৃষ্টির উৎস সহ এক লহমায় প্রতিভাত হইয়া উঠিবে কিন্তু চলচঞ্চলা নৃত্যচপলা নির্ঝরিণীর উপর প্রভাতী সূর্যের আলোক যে অপূর্ব লীলায়িত মহিমায় শত তরঙ্গভঙ্গে মুখর হইয়া উঠে সে সৌন্দর্য ঐ পরীক্ষাগারের বিশ্লেষিত জলে অনুপস্থিত।

অপ্রয়োজনের আনন্দই আর্টের একমাত্র আনন্দ, অবশ্য এই আনন্দটি মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া প্রয়োজনটাই আর্টে কোথাও বড় হইয়া দেখা দিতে পারে নাই। সাহিত্যের উদ্দেশ্য তাই কখনও কোন প্রয়োজনের সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সাহিত্যকে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম, তাহাকে কখনই প্রকৃত সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তিনি বলেন :—

> কোন একটা বিশেষ তত্ত্ব নির্ণয় বা কোনো একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।

বাস্তবিকই তাই সাহিত্য নির্মিতি নহে, সৃষ্টি। সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নাই। বিশ্বকর্মা যখন বিশ্বসৃষ্টি করিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সৃষ্ট মানব-সন্তান বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার ভরণ পোষণ করিবে এবংবিধ উদ্দেশ্য লইয়া নিশ্চয়ই বিশ্বসৃষ্টির কাজে তিনি হাত দেন নাই। প্রজাপতির যে পক্ষ দুইটিতে তিনি রামধনুর সাতটি রঙের সমারোহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা তাহার উড়িবার সুবিধার জন্য নহে। কিন্তু মানুষ যখন অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে,—তখন তাহার পশ্চাতে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই উপস্থিত হইয়াছে। কবরের উপরে মানুষ যখন ইটের স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছে তখন তাহার পশ্চাতে একটি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে উদ্দেশ্যটি হইল মৃতদেহটিকে জীব-জন্তুর হাত হইতে রক্ষা—বড় জোর মৃতের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার মত একটি স্থান সংগ্রহ। কিন্তু সেই কবরের উপর মানুষ যখন বাইশ বৎসরের নিরন্তর সাধনা দিয়া তাজমহল গড়িয়া তুলিল তখন তাহার মাঝে কোন স্থূল উদ্দেশ্যের সন্ধান মিলিল না—তখনই নির্মিতি এক নিমেষে সৃষ্টির কোঠায় উত্তীর্ণ হইল।

তেমনই বলা যাইতে পারে তর্ক-বিদ্যার উদ্দেশ্য মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ করিয়া তোলা, ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুনিচয় সম্বন্ধে মানুষকে বিশেষ জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া, কিন্তু তাহারা সাহিত্য-পদবাচ্য নহে। সাহিত্য নহে এই কারণে যে, তাহাদের বেসাতি উদ্দেশ্যকে লইয়া। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহাদের সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল থাকেনা। পরিচয়ের আবরণ পার হইতে পারিলেই তাহাদের খড় মাটি বাহির হইয়া পড়ে। তাই উদ্দেশ্যই যাহার একমাত্র পরিণাম বলিয়া ধরা হইয়াছে এইরূপ বিদ্যা ক্ষণকালের মধ্যেই পুরাতন হইয়া পড়িতেছে। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে বিজ্ঞানের এই মহৎ আবিষ্কার আমাদের জানা হইয়া গিয়াছে। তাই যে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সৌর জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করা তাহা আজ বিজ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে ঊর্ধ্ব আকাশের যে বর্ণনা আছে, তাহার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়াই তাহা আজও রসিকজনচিত্তে নিত্য নূতন।

আরও একটি কারণে সাহিত্যের পশ্চাতে যে কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না তাহা প্রমাণিত হয়। সাহিত্য যদি শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে, নীতি প্রচার, মানবের মুক্তি সাধন ইত্যাদি যদি তাহার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহাকে কেহ খোলা মনে ও স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না। বিদ্যালয়ের অবাধ্য ছাত্রদের হস্তে টেক্সট্ বুকের যে সমাদর লাভ হয় সাহিত্যের কপালেও তখন তাহাই জুটে।

আর পৃথিবীর সমস্ত গাছেই যদি ফুল না ধরিয়া একেবারে ফল ধরিত, বাজে কথাকে জগৎ হইতে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়া দিয়া সমস্ত মানুষই যদি কাজের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে পৃথিবীর বাঁধাধরা কাজের কোন পরিবর্তন না ঘটিলেও জীবনটা নেহাৎই হাঁসফাঁস করিয়া মারা যাইবার উপক্রম হইত। এই জন্যই জীবনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর চাই, আর সে অবসরক্ষণকে ভরাইয়া তুলিবার জন্য আমরা যাহাকে আহ্বান করি তিনি নিশ্চয়ই কুল-পুরোহিত নহেন,—তিনি আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ। বন্ধুর সহিত অর্থহীন কলগুঞ্জনে আমরা সে অবসরকে মুখর করিয়া তুলি। সে কলগুঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য নাই। সাহিত্যও এইরূপ সাহিত্যিকের স্বগত প্রলাপ, তাহা নির্জনে উপভোগের সামগ্রী। তাই তাহা উদ্দেশ্যহীন

কলগীতিতে পরিপূর্ণ। এই কলগীতির যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিয়া থাকে তো আনন্দ দানই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ

সাহিত্যের আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের স্থান কতটুকু উহা লইয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বাদানুবাদের অন্ত নাই। এককালে সাহিত্য ছিল ধর্ম ও নীতিপ্রচারের একমাত্র বাহন। সাহিত্যকে সেকালে ধর্মের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইত। সাহিত্যদর্পণ-কার বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যকে চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির উপায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য হইতে কোনরূপ ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, আনন্দ রস নিঃষ্যন্দী রূপককে যাঁহারা ইতিহাস প্রভৃতির মত (সাংসারিক জ্ঞানের) বুৎপত্তিমাত্র মনে করেন সেই সব আস্বাদপরান্মুখ লোকদিগকে নমস্কার। কেহ কেহ মনে করেন সাহিত্য কেবলমাত্র বাস্তব সত্যকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করিয়া বাস্তবজগতের সহিত তাহার সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তোলে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এই অর্থে সাহিত্যকে জগৎ ও জীবনের অনুকৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার অন্য দলের মতে যে সাহিত্য উচ্চশিক্ষার বাহন নয়, যাহার মাঝে কোন সুস্পষ্ট নীতি অনুপস্থিত তাহা কোনমতেই সাহিত্যপদ বাচ্য হইতে পারেনা। সাহিত্য রসকে ব্যঞ্জিত করে সত্য এবং আস্বাদনের বাহিরে এই রসের কোন অস্তিত্ব নাই একথাও সত্য কিন্তু কেবলমাত্র আস্বাদেই ইহার শেষ হইতে পারেনা। কেবলমাত্র রসের ব্যঞ্জনাই নহে, নীতির ব্যঞ্জনাও সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাঁহাদের মতে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্যের কখনই উদ্দেশ্য হইতে পারেনা, কারণ মানুষের সৌন্দর্যবোধ একক অন্য নিরপেক্ষ একটি ধারণামাত্র নহে, তাহা অন্যান্য বোধের উপরও নির্ভরশীল। আর মানুষের অন্যান্য বোধশক্তি বা প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহার প্রতিও সাহিত্যকারের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। আদর্শকে বাদ দিয়া জীবনের পরিপূর্ণতা কখনই সম্ভবপর নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র এই শেষোক্ত মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলিয়াছিলেন যে সাহিত্য সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসক,

মঙ্গলের আদর্শ হইতে বিচ্যুত যে সাহিত্য তাহা কখনই প্রকৃত সাহিত্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমগ্র সাধনার মধ্য দিয়া সাহিত্যের এই আদর্শবাদকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যকে যাহারা নিছক অপ্রয়োজনের আনন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সাহিত্যকারেরা তাঁহাদের আখ্যা দিয়াছেন কলাকৈবল্যবাদী বলিয়া। তাঁহারা আর্টের জন্যই আর্ট এই নীতি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মতে যাহা প্রকৃত আর্ট তাহা কখনই উদ্দেশ্যমূলক হইতে পারেনা। পারে না তাহার কারণ মানুষের যে চিরন্তন হৃদয় বৃত্তি হইতে শিল্পবোধ ও সৌন্দর্যবোধের জন্ম তাহা পারিপার্শ্বিক বস্তুজগতের অধীন নহে, মানুষের সাহিত্য ও শিল্পবোধ একটি আদিম ও অবিনশ্বর প্রবৃত্তি। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষের মনে এই যে শৈল্পিক অনুভূতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহার উৎস একমাত্র মানবের রসপিপাসু মন, এই মন সংসার ধূলিজালের সমস্ত কিছু তথ্যভারকে অগ্রাহ্য করিয়া লঘুপক্ষ বলাকার মত রসের অমৃতালোকে উধাও হইবার মন্ত্র জানে। ইহাই আর্টের স্বধর্ম। যে মানুষ আর্টের এই একান্ত স্বধর্মটির কথা ভুলিয়া যান তিনিই আর্টের বিচারে সর্বদাই প্রয়োজন অপ্রয়োজনের জমা-খরচ টানিয়া আনেন। আর্টকে তাঁহারা পিনাল কোডের ধারা দিয়া বিচার করিতে বসেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতেই আর্টের ক্ষেত্রে এইরূপ আদর্শবাদী চুলচেরা বিচার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যিক মহলে একদল ব্যক্তি সাহিত্যের এই আদর্শ পতাকা উড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যেই এই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, আর্টের রূপ যাহাই হউক না কেন তাহার একমাত্র লক্ষ্য মানব সমাজের মুক্তি, মানব চিত্তের পরিশোধন।

দিগ্বিদিকব্যাপী আদর্শবাদীদের এই চীৎকারের মাঝে একদল ব্যক্তি প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। সমস্ত সমাজব্যাপী আদর্শবাদের এই ঢক্কানিনাদের মাঝখানে তাহারা ঘোষণা করিল সাহিত্যের বন্ধনহীন স্বাধীনতা। আর্টের জন্য আর্ট এই মতবাদটির মধ্যেই আধুনিক বাস্তববাদের বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। শিক্ষা ও সাহিত্যের আদর্শবাদী প্রেরণা একদা ফরাসীদেশের লক্ষ লক্ষ শোষিত মানুষকে ফরাসী বিপ্লবের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে অনুপ্রেরণা জোগাইয়া ছিল। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের শোচনীয় ব্যর্থতার

সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে সেই বলিষ্ঠ সুখী গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের সুখস্বপ্ন মিলাইয়া গেল। এক তীব্র হতাশ্বাসের ঝটিকা মানুষের এতদিনকার গড়িয়া তোলা আদর্শবাদকে দূরে ঠেলিয়া দিল। সাফল্যের পরিবর্তে আসিল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য।

যুগ ও জীবনের এই বিপর্যয়কারী ক্রান্তিকাল হইতেই সাহিত্যে আধুনিক বাস্তববাদের জন্ম। জীবনের উপর শুরু হইল বস্তুর প্রাধান্য। বলা বাহুল্য বস্তুবাদের অত্যধিক মোহে সাহিত্যিকের জীবনদৃষ্টি বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে আটকা পড়িল। জীবনের নগ্নতা, কদর্য-বর্বরতা, আসঙ্গ লিপ্সা ও জৈবিক কামনাকে লইয়া সাহিত্যের বেসাতি শুরু হইল। *

কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভুলিলে চলিবে না সাহিত্য জীবনের হুবহু অনুকৃতিমাত্র নহে। সাহিত্য জীবনের নির্মিতি। কেবলমাত্র সংসারের পুঞ্জ পুঞ্জ বাস্তব তথ্যকে বর্ণনা করিলেই তাহা সাহিত্যের কোঠায় উত্তীর্ণ হইতে পারেনা। জীবনের কদর্য অন্ধকার দিকটি সাহিত্যে উপস্থাপিত করিয়া গেলেই তাহা সৎসাহিত্যের পদবাচ্য হইতে পারেনা। সাহিত্যে বাস্তবতার যথার্থ প্রয়োজন আছে এবং বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া কখনই সৎ সাহিত্য রচিত হইতে পারেনা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভুলিয়া যাইলে চলিবে না যে,

> বস্তুর কারবারী ও বাস্তবরসের স্রষ্টা ঠিক এক নহে। বস্তু পুঞ্জ হইতে বাস্তব রস-নিষ্কাশন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পবোধসাপেক্ষ।
>
> — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরাজী সাহিত্যের চতুর্দশ শতকের কবি চসারের কাব্যে এই বাস্তববোধের যথার্থ উন্মেষ পরিলক্ষিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই নয় যে চসার তাঁহার 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্'-এ বর্ণিত বিভিন্ন কাহিনীর মধ্য দিয়া চতুর্দশ শতকের ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের চিত্রটি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, চসারের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র কারণ এই যে তাঁহার কাব্যে বাস্তব তথ্যের সহিত জীবনরসের, সাহিত্যিক সত্যের সহিত জীবনসত্যের এক অপূর্ব সমীকরণ ঘটিয়াছে। এইখানেই চসারের কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। বাংলা দেশের ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরামকে যথার্থ বাস্তববাদী কবি বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মুকুন্দরামের কাব্যে সর্বপ্রথম আদর্শ ও কল্পনার অস্পষ্ট কুহেলি রাজ্য হইতে বাস্তব আসিয়া ভীড় করিয়াছে। আমাদের

* 'আর্টের জন্যই আর্ট' প্রবন্ধে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

চারিপাশের অতি সুপরিচিত সমাজটা, দরিদ্র কুটিরবাসীর সাধারণ গৃহ কোণ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনার বাণীকে মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়াছেন। বস্তু জীবন ও বাস্তব জীবনকে মুকুন্দরাম যে দৃষ্টি লইয়া দেখিয়াছেন সে দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই, কোনরূপ ভাবপ্রবণতা নাই, কিন্তু বস্তুজীবনের নিছক ফটোগ্রাফই তাঁহার সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিলনা। উদজান ও অম্লজান এই উভয় মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যখন জলের উৎপত্তি হয়, তখন যেমন এই উভয় পদার্থই তাহার নিজ নিজ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া একটি সাধারণ ধর্মের মাঝে বিলীন হইয়া যায়, তেমনি মুকুন্দরামের কাব্যেও বস্তুধর্ম ও রসধর্ম একত্র মিশ্রিত হইয়া তাহা জীবনের চরম সত্যকে প্রকাশ করিয়াছে। এই চরমসত্যের মাঝে জীবনের বস্তুরূপ ও রসরূপ কেহ কাহাকেও ছাপাইয়া উঠিতে পারে নাই। মুকুন্দরামের কবি প্রতিভার এই বিভিন্ন ধারা অবশেষে সমন্বয়ের সমুদ্রের মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

আধুনিক কথাসহিত্যিকগণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এইরূপ। শরৎচন্দ্র জীবনশিল্পী, সংসারে যাহারা শুধু দিল পাইল না কিছুই, তাহাদের জীবনের মর্মন্তুদ চিত্র উদ্‌ঘাটনই শরৎসাহিত্যের মর্মবাণী। জীবনের এই মর্ম উদ্‌ঘাটনে তিনি কোনও নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হন নাই। অথচ বাস্তবের নগ্নতাকে তিনি তাঁহার সাহিত্যে কখনই প্রশ্রয় দেন নাই। এক কথায় বলা যাইতে পারে idealism ও realism সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের কোনরূপ বিশেষ গোঁড়ামি ছিলনা। সত্য ও শিব-সুন্দরে যে কোনরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে তাহা তাঁহার মনে আসে নাই।

এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—

> গোটা দুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়। Idealistic and Realistic······অথচ কি করে যে এ দুটোকে ভাগ করে দেখা যায় আমার অজ্ঞাত! যা কিছু ঘটে তার নিখুঁত ছবিটিকেও আমি যেমন সাহিত্যবস্তু বলিনে তেমনি যা ঘটেনা অথচ সমাজ-প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে ঘটলে ভাল হয়, কল্পনার মধ্য দিয়ে তার উচ্ছৃঙ্খল গতিতেও সাহিত্যের ঢের বেশী বিড়ম্বনা ঘটে।

শরৎ সাহিত্যে তাই এই তথাকথিত রিয়ালিজম ও আইডিয়ালিজম-এ

বিরোধ নাই। শরৎচন্দ্র সমাজ ও মানবজীবনের অতি উপেক্ষিত বেদনাদায়ক দিকটি তাঁহার সাহিত্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

নরনারীর অচেতন মনের গোপন কামনা বাসনা, যাহা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্বসম্মত এবং মানব জীবনে যাহা ঘটিবার কোনরূপ অসম্ভাব্যতা নাই, তাহাকেই সুস্পষ্ট রূপ দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জীবনের এই নিষিদ্ধ দিকটি বর্ণনা করিতে বসিয়া তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে কখনও কোথাও সংযম ও সুরুচির মাত্রাকে লঙ্ঘন করেন নাই। এবং এক অপরূপ শিল্পশ্রীতে তাঁহার রচনা রসমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য শরৎ সাহিত্যে পতিতা-জীবন ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেও তাহা পাঠকের মনে ঘৃণা কিংবা কামনার আগুন জাগায় না।

পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থার চাপে পড়িয়া যেসব হতভাগিনী নারীরা একদা এই ঘৃণ্য নিষ্ঠুর বৃত্তির কবলে আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হইয়াছে শরৎ সাহিত্যের পাঠক সেই সমস্ত হতভাগিনীদের উদ্দেশ্যে দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন না করিয়া পারে না। শরৎচন্দ্র আর্টের ক্ষেত্রে কোনরূপ আদর্শবাদী ভাবমোহের দ্বারা পরিচালিত হন না। কিন্তু এই সঙ্গে যাহা প্রকৃত আর্ট তাহা তাঁহার নিকট immoral বিবেচিত হয় নাই। বস্তুত realism-এর সহিত idealism-এর গগনচুম্বী প্রভেদ শরৎচন্দ্র খুঁজিয়া পান নাই।

সাহিত্যে বাস্তবতা প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের এই অংশটি পরবর্তীকালের আধুনিক লেখকেরা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথবা উপলব্ধি করিলেও তাঁহারা ইহাকে স্বীকার করেন নাই। বিশেষ করিয়া 'কল্লোল' যুগের সাহিত্যিকেরা ক্রান্তিকালের সংশয় ও ক্লান্তির ভিতর বাস্তব-বোধের অন্তরালে জীবনের প্রচ্ছন্ন রসরূপটির প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। পারেন নাই হয়ত এই কারণে যে, সে যুগটাই ছিল রূপান্তরের ঝঞ্ঝাবাত্যার যুগ—'বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংশয়ের ও ক্লান্তির যুগ'। তাই তাঁহাদের রচনার মধ্যে বাস্তববোধের নব মূল্যায়ন ঘটিয়াছিল। প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায় দুর্বার আসঙ্গ লিপ্সা, মুটে মজুর ও ইতরের জীবনের ঘৃণ্য দিকটি তাঁহাদের রচনার মধ্যে সাংবাদিক সতর্কতার সহিত হুবহু উপস্থাপিত হইল। অবশ্য 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সব লেখক সম্বন্ধে এই উক্তি নির্বিচারে প্রযোজ্য নহে।

সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের

'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রসাহিত্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছিলেন:—

> রবীন্দ্রসাহিত্য সার্বজনীন নহে। রবীন্দ্রনাথ দরিদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি দৈন্যের মধ্যে বিশ্বাসের ছবি আঁকিয়াছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সঙ্গীত গাহিয়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে সঙ্গীত জনসাধারণকে সমগ্র জাতিকে, স্পর্শ করিতে পারে নাই।

'সবুজপত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামক প্রবন্ধে তাঁহার সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের উত্তর পাশ কাটাইয়া সাধারণ ভাবে সাহিত্যে বাস্তবতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন যে, সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে জিনিষ খুঁজিয়া থাকি, তাহা হইতেছে রস বস্তু। সেই রসের নিশ্চয়ই একটি আধার আছে। কিন্তু সমসাময়িক বাস্তব-ঘটনাই কি সেই আধার? আসলে যাহা আমাদের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে, হৃদয়কে রসাপ্লুত করে, তাহাই যদি সাহিত্য হয়, তবে শুধুমাত্র সম-সাময়িক জীবনে তাহার আধার খুঁজিতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। কারণ যে ঘটনা আজ আমাদের কাছে রূঢ় বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে দুইদিন পরেই হয়ত তাহা নিতান্তই অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু,

> রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজ তাহা বাতিল হয় নাই। কিন্তু বস্তুর দর বাজার অনুসারে এবেলা-ওবেলা বদল হইতে থাকে।—রবীন্দ্রনাথ

তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সাহিত্যের মধ্যে বাস্তববাদ ও আদর্শবাদের মধ্যে কোন আপাতবিরোধ নাই। রসসৃষ্টি যখন সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন তাহার আধার প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা হইতে একদিকে যেমন কোন আপত্তি নাই তেমনই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত কবির কল্পনাজগৎকে উপেক্ষা না করিয়া তাহাকে সমমর্যাদায় ভূষিত করিলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং রস ও বস্তু এই উভয় জগতের সমীকরণের ফলেই মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি।

একথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হইবে যে, কবির নিজস্ব একটি আদর্শ থাকিবেই। রস সৃষ্টিকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সেই আদর্শের শিল্প-সঙ্গত পরিপুষ্টি সাধনই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে।

> বাহিরের হাটে বস্তুর দর কেবলই উঠা-নামা করিতেছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাস, নানা কালের

নানা ফ্যাসন। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাব্য হইবে। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে ধ্রুব আদর্শ আছে তাহারই 'পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্ত উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দুর আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়,. তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল-মাষ্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময়, সুতরাং অনির্বচনীয়। কবি জানেন, সেটা তাঁহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারও কাছে মিথ্যা নহে। যদি কাহারও কাছে তাহা মিথ্যা হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা—যে লোক চোখ বুঁজিয়া আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্যা এও তেমনি মিথ্যা। কাজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কবি নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, পান তিনি জানেন, বিশ্বের মধ্যেই সেই প্রমাণ আছে।

—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন

লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবির সুধাময় কাব্যকূজনে মুগ্ধ হইয়া রাজা বলিলেন—

"ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজ ভাণ্ডারে
সব দিতে পারি আনি।"

উত্তরে আনন্দজলভরা নয়নে কবি শুধু বলেন 'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে ওই ফুলমালাখানি।'

হীরামণি মাণিক্যের মালা নহে, এই বরণ মালাই যুগ-যুগান্ত ধরিয়া সকল কালের, সকল শ্রেণীর কবিরই কাব্য সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ম্লান-ছিন্ন পৌনপৌনিক দৈনন্দিন জীবনের 'তুচ্ছ লাভ-ক্ষতি টানাটানি' লইয়া কবির মন সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না, কবির আত্মা সমাহিতি লাভ করে প্রয়োজনীয় পরিসীমার ঊর্ধ্বে অপ্রয়োজনের ধ্যানলোকে। অসম্পূর্ণ বস্তুজগতের গণ্ডী পার হইয়া কবির মন আশ্রয় খুঁজিতে চায় সম্পূর্ণতার মায়ারাজ্যে। কবির এই লোকোত্তর দৃষ্টির সম্মুখে সাধারণ

মানুষের নিকট যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় তাহা তাহাকে কোন আনন্দই দিতে পারে না; তাঁহার কোন প্রয়োজনই মিটাইতে সক্ষম হয় না। সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে তাই কবিরা সংসার-উদাসীন কল্প-লোকের পথিক বলিয়া নিন্দিত হন।

কবি যে শুধু তাঁহার কবিকৃতির পুরস্কার স্বরূপ এই 'অপ্রয়োজন'-কে লইয়াই সন্তুষ্টি লাভ করেন তাহা নহে, তাঁহার কাব্য সাধনাও এই অপ্রয়োজনের জগৎকে লইয়া। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কাজের আর অন্ত নাই। প্রভাতে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের যে নিরন্তর কর্ম-প্রবাহ চলিতে থাকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত, তাহা এই প্রয়োজনকেই কেন্দ্র করিয়া। বিচিত্র উপায়ে, নানা মাধ্যমে এই প্রয়োজনকে চরিতার্থ করার উদ্দেশেই মানুষের সমস্ত কর্ম নিয়োজিত। ব্যবসায়, বিজ্ঞান, অর্থ-নীতি, বিভিন্ন লোকায়ত বিদ্যা সমস্তই মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছে ইহার ব্যতিক্রম। এই নিতান্ত ছকে বাঁধা আঁট-সাট জীবনটার মাঝে কবির আবির্ভাব মেঘদূতের বর্ষাঋতুর অবিশ্রান্ত ধারাপাতের শেষে আলোকোজ্জ্বল মহাসূর্যের ন্যায়। ধরণীর যে কোণটি এতদিন আলোছায়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, কোন্ অজানা আলোকে তাহা এক নিমেষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ধরণীর প্রান্ত হইতে নীলাভ্রের সর্বশুভ্র তীর এক লহমার মাঝে যেন বিশ্বচরাচরের অনাদি সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল। কবি তাঁহার বীণা লইয়া আবির্ভূত হইলেন। এতদিন যোদ্ধার অসিতে, স্থপতির খনিত্রে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে যে সুর বাজিয়াছিল তাহা প্রয়োজনের সুর। কিন্তু কবির অনিন্দ্য বীণার সুকুমার রাগিণীতে কবি হৃদয়ের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার বাণীটি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"অবসর
লব সব কাজে। যুদ্ধ অস্ত্র ধনুঃশর
ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ
রাখিনু চরণে তব—যত উচ্চ কাজ
সব ফিরে লও দেবী।"

"অকাজের কাজ যত
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত

আনন্দের আয়োজন। যে অরণ্যপথে
কর তুমি সঞ্চরণ বসন্তে শরতে
প্রত্যুষে অরুণোদয়ে, শ্লথ অঙ্গ হতে
তপ্ত নিদ্রালসখানি স্নিগ্ধ বায়ুস্রোতে
করি দিয়া বিসর্জন, সে বনবীথিকা
রাখিব নবীন করি।"

এই 'অকাজের কাজ যত' আলস্যের সহস্র সঞ্চয়-ই কবির উপজীব্য।

হৃদয় এবং অনুভূতিকে লইয়াই কবির কারবার। আর মানুষের জীবনে নিষ্প্রয়োজনের যদি কিছু অবকাশ কোথাও থাকিয়া থাকে তো এই হৃদয়। যাহা প্রয়োজনীয় তাহা বুদ্ধিগম্য, যাহা লোকায়ত তাহা কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু যাহা লোকাতীত তাহাকে লাভ করা যায় 'ন মেধয়া ন শ্রুতেন'। তাহাকে অনুভূতির জারকরসে সঞ্জীবিত করিয়া সমগ্র হৃদয় দিয়া আস্বাদন করিতে হয়।

সাহিত্য তাই অপ্রয়োজনের কারবারী। ভোগের দ্বারা এ বিপুলা পৃথিবী মানুষের নিকট ছোট হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে শুধু ভোগ ও সঞ্চয়ের অঙ্কমোহে অমৃত-মানব জড় সত্তায় পরিণত হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে শুধু প্রয়োজনকেই বড় করিয়া দেখা। ভোগকেই মোক্ষ বলিয়া জানা। তাই এই নিরন্তর দুর্বিষহ জীবন হইতে মানুষ পাইতে চায় মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়,

> সংসারের সকল বিভাগেই এই যে চাই চাইয়ের হাট বসে গেছে এরই আশেপাশে মানুষ একটা ফাঁক খোঁজে যেখানে তার মন বলে চাইনে, অর্থাৎ এমন একটা কিছু চাইনে যেটা লাগে সঞ্চয়ে। তাই দেখতে পাই প্রয়োজনের এত চাপের মধ্যেও মানুষ অপ্রয়োজনের উপাদান এত প্রভূত করে তুলেছে, অপ্রয়োজনের মূল্য তার কাছে এত বেশী। তার গৌরব সেখানে, ঐশ্বর্য সেখানে, যেখানে সে প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে।

তাই দেখি সৃষ্টির সে অনাদি অতীত কাল হইতে মানুষ যখন প্রয়োজনের জগৎ হইতে এতটুকু অবসর পাইয়াছে, তখনই সে ছুটিয়া গিয়াছে অপ্রয়োজনের রাজ্যে। প্রাচীন গুহাগাত্রে অসভ্য আদিম মানব সন্তান বিচিত্রবর্ণে লতাপাতা আঁকিয়া তাহাকে সুশোভিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার মূলেও

ছিল মানুষের এই অপ্রয়োজনের আনন্দ বিলাস। তাহার পর আরও সভ্য মানুষ মন্দির গাত্রগুলি খুদিয়া খুদিয়া বিচিত্র প্রস্তর মূর্তিগুলিকে অঙ্কিত করিয়াছে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে অসভ্য মানুষ যখন বর্বরের মত গিরি-গুহা কন্দরে জীবনযাপন করিত তখনও কোন এক জ্যোৎস্নালোকিত, তারকাশোভিত রূপসী রাত্রি তাহার বর্বর চক্ষুকে মায়াচ্ছন্ন না করিয়া পারে নাই। অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও সে নিতান্ত প্রয়োজনের জগৎটি হইতে বিদায় লইয়া নৃত্যের তালে তালে আপন চিত্তকে ভরিয়া তুলিয়াছে। অর্থহীন গীতি কলরোলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেকার আদিম অরণ্য প্রকৃতি আপনার বস্তু সীমাকে অতিক্রম করিয়া অলৌকিক রহস্য মণ্ডিত হইয়া বিশ্ববাসীর নিকট ধরা দিয়াছে। প্রয়োজনীয়তার জগৎ পার হইয়া অপ্রয়োজনের আনন্দালোকে যখন বস্তু উত্তরিত হইল তখনই হইল সার্থক শিল্পের সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়া বিষয়টি বুঝাইয়াছেন —ঘড়ায় করিয়া মানুষ যে জল আনে, এ জলে তার নিত্য প্রয়োজন। বস্তুর দৌরাত্ম্যে তাহাকে কাঁখে মাথায় করিয়া ঘড়া বইতেই হয়। প্রয়োজনের শাসনই যদি একমাত্র সত্য হইয়া উঠে তাহা হইলে ঘড়া হয় অনাত্মীয়। মানুষ তাই বিচিত্র বর্ণে ঘড়াকে শোভিত করিয়া তুলিল।

> মানুষ তাকে সুন্দর করে গড়ে তুলল। জল বহনের জন্য সৌন্দর্যের কোন অর্থই নেই কিন্তু এই শিল্পসৌন্দর্য প্রয়োজনের রূঢ়তার চারিদিকে ফাঁকা এনে দিল। যে ঘড়াকে দায়ে পড়ে মেনেছিলেম, নিলেম তাকে আপন করে।—রবীন্দ্রনাথ

তাই সর্বকালের সর্বযুগের 'বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার 'যে রস সে অহেতুক'।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে নিতান্ত অপ্রয়োজনই যদি সাহিত্যের একমাত্র সামগ্রী হয়, তাহা হইলে আমাদের বাস্তব জগতে সে সাহিত্যের স্থান কতটুকু ? অর্থাৎ বাস্তবতার সহিত আর্টের সম্পর্ক কি ? আর্ট কি মানুষের জীবনে একান্ত বাহুল্য ? সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও মঙ্গল সাধন কি সাহিত্যের লক্ষ্য, না তার কাজ কেবল মনকে এক রকম আনন্দ দেওয়া যার নাম সাহিত্যিক আনন্দ ?

সাহিত্য ও সাহিত্যের স্বরূপ লইয়া এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধতার অন্ত নাই। তাঁহাদের সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্কজালের

গভীরে প্রবেশ না করিয়াও এ প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে।

আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকদের নিকট সাহিত্য কেবল মাত্র অপ্রয়োজনীয় বিলাসরূপে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফললাভের সম্ভাবনা আবিষ্কার করিয়াছেন। মম্মটভট্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, সাহিত্য সাহিত্যিককে দিবে যশ ও অর্থ, সমাজের সাধন করিবে মঙ্গল, আর পাঠককে দিবে উপদেশ। সে উপদেশ কি রকম? না 'কান্তা সম্মিত' অর্থাৎ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সপ্রেম উপদেশের ন্যায়। সাহিত্য পাঠককে কিছু suggest করিবে একথা সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে নির্দেশনা অপেক্ষা অলক্ষ্য ইঙ্গিতই হইবে প্রধান। শাসন অপেক্ষা অনুশাসনই হইবে সুস্পষ্ট। তাঁহাদের মতে যাহা সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহার বাণী প্রচারই হইবে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সাহিত্যকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের বাহন বলিয়া অভিহিত করিলে কতগুলি প্রশ্ন মনের মাঝে অনুত্তরিত থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত বহু শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহা কোন জাগতিক প্রয়োজনকে বিধৃত করিতেছে না। এমনকি সামাজিক হিতসাধনও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল একথা বলা যায়না। হোমারের ইলিয়ড কিংবা কলিদাসের মেঘদূতের উদ্দেশ্য কোন জাগতিক প্রয়োজনের গণ্ডীতে বাধা ছিলনা। টেনিসন যাহাকে 'Idle tears' বা নিছক চোখের জল বলিয়াছেন মেঘদূত সেই নিছক চোখের জলেরই কাব্য। ইহা শুধু কর্মহীন অবকাশের সঙ্গী মাত্র।

আবার 'প্রয়োজনীয়তা' এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে শব্দটি আপেক্ষিক। আমার কাছে যাহা প্রয়োজন অপরের কাছে তাহা প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। ধনী ব্যবসায়ী গঙ্গেরীরাম বাটপাড়িয়ার নিকট যাহা প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথের মত কবির নিকট তাহা প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। সরস্বতীর একান্ত প্রসাদ লাভ করিয়াই কবি সুখী, ইহাই তাঁহার নিকট একমাত্র প্রয়োজনীয়।

"চারিদিকে সবে বাঁটিয়া দুনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া
আমি তব স্নেহ বচন শুনিয়া
পেয়েছি স্বরগ সুধা"।

সাধারণ মানুষের কাছে এই স্নেহবচনের কোনই মূল্য নাই। তাহা তাহাদের নিকট নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়ত এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক যে মানুষ কেবলমাত্র উদরপূর্তি করিয়াই বাঁচিতে পারেনা। প্রাণধারণের জন্য নিতান্ত স্থুল প্রয়োজনটা মিটাইয়া চলিলেই তাহার চলে না। কেবলমাত্র অন্নময় সত্তার আহ্বানে সাড়া দিলেই মানুষের চলেনা, তাহার অন্তরের প্রাণময় সত্তার প্রতি সে কখনও উদাসীন থাকিতে পারেনা। তাই সাহিত্যকে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনের সামগ্রী বলিলে ভুল বলা হইবে সাহিত্য অপ্রয়োজনের আনন্দ বটে কিন্তু এ 'অপ্রয়োজন'-ও মানুষের জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বিধাতার বুঝি ময়ূরের দেহটি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহার পেখমের এই বিচিত্র বর্ণ তাহার অঙ্গের এই বর্ণ বৈচিত্র্য নিতান্ত বুঝি অপ্রয়োজনীয় বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই অপ্রয়োজন আছে বলিয়াই জীবন এত মনোহর। আকাশের বিচিত্র বর্ণালী সমারোহ, অরণ্যের শ্যামল শোভা, সঙ্গীতের অপরূপ সুর মূর্ছনা, এগুলির কোন বৈষয়িক মূল্য হয়ত নাই। কিন্তু ইহারা মানুষের মনে অপরূপ আনন্দময় জগতের সন্ধান আনিয়া দেয়। জীবনের সব তুচ্ছতা, সব ক্লান্তি ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া মানুষ উর্ধ্ব অমৃতালোকে বিচরণ করে। সেই কবে কোন সুদূর অতীতে কোন এক আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে রামগিরি পর্বতের আকাশে একখণ্ড সঞ্চরণশীল ক্ষুদ্র মেঘ এক বিরহী প্রাণে বিষামৃত-মধুর অলৌকিক জীবনের স্বপ্নসাধকে জাগরিত করিয়াছিল—হাজার হাজার বছর পরেও রসপিপাসু মানবহৃদয়ে তাহা সেই একই স্বপ্ন জাগরিত করিয়া চলিয়াছে। সমস্ত কাজের অবসরে সংসারের কোলাহল হইতে মনকে একেবারে সরাইয়া আনিয়া বাতায়ন পার্শ্বে মেঘমেদুর আকাশের দিকে চাহিয়া মানুষ যখন সেই অমর বিরহগাথা পাঠে মনকে একান্ত ভাবে সন্নিবেশিত করে তখনই তাহার মনে জাগে অলৌকিক রসসংবেদন, লোকোত্তর আনন্দ—এ আনন্দ স্থুল প্রয়োজনের আনন্দ নয় বটে, কিন্তু জীবন হইতে ইহাকে বাদ দিলে সে জীবনের সহিত তপ্ত রিক্ত ও ক্লান্ত মরুপ্রান্তরের পার্থক্য কোথায়?

সাহিত্য স্বভাবের অন্তর্ভূত অথচ স্বভাবাতিরিক্ত

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

> বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত। তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষ রূপে আপনার করিয়া লই।

একথা সত্য বটে যে সাহিত্যের দেহ 'স্বভাব' অর্থাৎ, বহিঃপ্রকৃতির উপাদানে নির্মিত। পরিদৃশ্যমান জগতের মাটি-রূপ-রস ও গন্ধ লইয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি কিন্তু অপরদিকে তাহা স্বভাবাতিরিক্তও বটে। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে দুটি উপাদানই সমান কাজ করে। একটি বাহিরের জগৎ অপরটি কবির অন্তরের জগৎ। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যাইতে পারে,

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরস ধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে।

সংসার ধূলিজালের মধ্য হইতে কাব্য ও সাহিত্যের উপাদানকে কবি গ্রহণ করেন এবং অন্তর লোকের উদাত্ত সুরের মায়াজালে সে কথাকে পরিণত করেন সঙ্গীতে। ইহাই প্রজাপতি কবিদের ধর্ম। বস্তুজগৎকে তাঁহারা যে পথে পরিচালিত করেন জগৎ সে পথেই পরিচালিত হয়। কবির বাহিরের যে জীবন সেটা নিতান্তই অসম্পূর্ণ, তাহা স্বভাবানুগ বটে, বাস্তবও বটে কিন্তু তাহাতে শিল্পের সুষমা নাই। কবির অন্তরস্থিত জীবন দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাই কবিকে পরিচালিত করেন রস ও মায়ার অলৌকিক জগতের পথে। এই সাদা মাঠা নিতান্ত বাস্তব জীবনটা, পাখীর কূজন,

রাজপথে জনতার অবিশ্রাম যাওয়া আসা, সংসারের তুচ্ছতা, শ্রান্তি, ক্লান্তি এক স্বর্গীয় সুষমায় এপোলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। জীবন দেবতার কাছে কবি তাই প্রশ্ন করেন,

লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম, আমার কর্ম তোমার বিজন বাসে ?
বরষা-শরতে-বসন্তে-শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া আপন সিংহাসনে ?
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা পরেছ কি গলে
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ মম যৌবন বনে ?

কবির এই 'জীবন দেবতা' মায়ারাজ্যের সোনার কাঠি হাতে লইয়া হাজির হন। বাস্তবের রাজকন্যা এতদিন পরিচিত গৃহকোণটির পালঙ্কে ঘুমাইতেছিল। সে-সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার যুগ যুগান্তের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তারপর স্বর্গ নামিয়া আসিল মানুষের মাটির ঘরে। মানুষের হৃদয়ের সহিত অনন্ত সেতু রচিত হইল। তখন সুখ হাসি হইল আরও উজ্জ্বল, নয়নের জল হইল সুন্দর।

স্বভাবের সহিত স্বভাবাতিরিক্তের এই মধুর মিলনই সাহিত্য। বাচ্যার্থকে ছাড়াইয়া ব্যঞ্জনার্থই যেমন কাব্যের প্রাণ, তেমনি বস্তু সীমাকে ছাড়াইয়া (তাহাকে এড়াইয়া নহে মাড়াইয়া) বাস্তবাতীতকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের ধর্ম।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ একথা অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবি-প্রতিভা বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইতে পারে না। জাতীয় জীবনধারা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এসবের কোনটিকেই কবি অস্বীকার করিতে পারেন না।

বেদব্যাস কি তাঁহার অষ্টাদশ পর্ব মহাগ্রন্থের মধ্যে সমাজ ও বহিঃ-প্রকৃতিকে অস্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' বস্তুবিশ্বকে ছাড়াইয়া স্বর্গোদ্যানের সুখী দম্পতী আদম ও ইভের জীবন কাহিনীকে

বর্ণনা করিলেও, তিনি কি তাঁহার রচনা হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রচলিত দেশাচার ও সমাজ-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিতে পারিয়াছিলেন? কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের রচনা এই বস্তুপুঞ্জ বা স্বভাবকে ছাড়াইয়া কবি মানসের অমৃত রসায়নটিকেই বড় করিয়া তুলিয়াছে। রামায়ণ মহাভারতে আমরা ভারতবর্ষের বস্তুজীবনের একটা বিস্মৃত অধ্যায়ের পরিচয় পাই সত্য কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা বলিতে দ্বিধা নাই যে বস্তুজীবনের সহিত পরিচিত হইবার মানসেই আমরা রামায়ণ মহাভারত পড়ি না—তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই মনুসংহিতা পড়িতাম। রামায়ণ মহাভারতের ভিতরে কবিহৃদয়ের এক সার্থক রসাভিব্যক্তি অনবদ্য শ্লোক গাথায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সহৃদয়ের মানসলোকে এক চিরন্তন আনন্দস্রোত জাগাইয়া তুলিতেছে বলিয়াই তাহা আমাদের আদরের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথ জগতের উপর মনের কারখানার জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই মন কবির মন। তাহা নিরন্তর জগতের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া কবি সে জগৎকে নিত্য নবরূপে গড়িয়া তুলিতেছেন। এ সৃষ্টি চলিতেছে কবির সচেতন মনের অজ্ঞাতে। আপন অজান্তে কবি যে কখন এই বস্তু স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া বসিয়া আছেন তাহা কবি নিজেই জানেন না। বাল্মীকি যখন শরাহত ক্রৌঞ্চীর শোকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কবিতা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মুখে আমরা শুনিয়াছি 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া'। বাল্মীকির সচেতন মন নিতান্ত গদ্যময় ভাষায় ক্রৌঞ্চ বধূর মৃত্যুতে সমবেদনা জানাইতে পারিত। কিন্তু তাঁহার অবচেতন মন বস্তুর অতিরিক্ত শ্লোকগাথা উচ্চারণ করিল। ইহাতে বস্তুর সব কথাই আছে। কিন্তু সেই বাস্তবানুগ বাচ্যার্থেই ইহা থামিয়া থাকে নাই। জীবনের অন্তস্থলের এক সুগভীর মর্মবাণীকেও ইহা ব্যক্ত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ 'স্বপ্ন' কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে ধরা যাক্। দূরে বহুদূরে উজ্জয়িনীপুরে কবির প্রিয়ার সহিত স্বপ্নলোকে সাক্ষাতের দৃশ্যটি এক রোমাণ্টিক রূপকল্পনায় পরিবেশিত হইয়াছে। প্রিয়ার রূপবর্ণনায় কবি বাস্তবকে কোথাও অস্বীকার করেন নাই। ইতিহাসের সত্যের সহিত, বস্তুজগতের সত্যের বর্ণনায় কোথাও বিরোধ নাই। নীপতরু-শোভিত প্রিয়ার ভবনটিও যথাযথরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। কোন ঐতিহাসিকের হাতে পড়িলে দৃশ্য স্থান-কাল পাত্রটি ইতিহাসের নির্মম রথচক্রে পিষ্ট হইয়া সমগ্র ঘটনাটি ইতিহাসের

একটি গবেষণাধর্মী চিত্রণে পরিণত হইত। কিন্তু কবি মানস এই দৃশ্যটিকে মাধুরীর সাহায্যে বস্তু হইতে রস ও মায়ার রাজ্যে উত্তরিত করাইয়াছেন—

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে শুধালো শুধু, সকরুণ আঁখি ;
হে বন্ধু আছো তো ভালো ? মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু, কথা আর নাহি।

দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে কবির সহিত কবিপ্রিয়ার এই মিলনের অব্যক্ত পরিবেশটি এক অপরূপ রস-সুধায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে :—

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার
দীপ দ্বারপাশে
কখন নিবিয়া গেল তুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রা নদী তীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

বস্তুস্বভাবকে অতিক্রম করিয়া বাস্তবাতীত আদর্শ জগৎ কি ভাবে মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে এই কটি স্তবকই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কবির এই স্বপ্ন—এ স্বপ্নের ভিতর যেমন অবাস্তবতার অন্ধকার নাই তেমনি বস্তুজগতের অসম্পূর্ণতাও নাই। এখানে স্বপ্নই বাস্তব, বাস্তবই স্বপ্ন। এখানেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি ধরণীর মৃত্তিকা হইতে নেন রস আর আকাশ হইতে আলো। তাই শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য এই আলো ছায়ার নৃত্য। তাহার পা তুটি মাটিতে কিন্তু মন আছে উর্ধ্ব জগতের পানে।

আর্টের জন্যই আর্ট

সাহিত্যের উদ্দেশ্য-সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান কোনদিনই হইবে না। জীবনে সত্য শিব ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য এই মতবাদীদের সংখ্যা যেমন অগণিত তেমনই বাস্তব জগৎ সাহিত্যে রূপায়িত হইবে, তাহাতে কোন উদ্দেশ্য সাধিত হউক আর নাই হউক এই মতবাদীদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য

নহে। ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলা নিদারুণ নির্মমতার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দেশের সমাজ জীবনকে তাঁহার উপন্যাসে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার এই নির্মমতার বিরুদ্ধে একদল ফরাসী কবি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন মালার্মে। তিনি ফরাসী কাব্যে প্রতীকী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের মতে—it was made on behalf of an ideal world which was in their judgement more real than that of senses. কিন্তু সেই সঙ্গে ইংলণ্ডে আর একদল ভিন্ন মতাবলম্বী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইল। সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনে মঙ্গলময়ের প্রতিষ্ঠা এবং সাহিত্যিক মানবজীবনের কাহিনী হইতেই বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কল্পনার আলোকে অভিনবরূপে প্রকাশ করিবেন, এই মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের মতে আর্টের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারেনা। আর্ট নিজের জন্যই সৃষ্ট হইবে। কাজেই বস্তুজগতের সেই অংশই শুধু সাহিত্যে রূপায়িত হইবে যাহা জীবনকে মহৎ ভাবে উজ্জীবিত করিবে—সাহিত্যের এই আদর্শকে তাঁহারা অস্বীকার করিলেন। মানব জীবনের নগ্নতা, স্বার্থান্ধতা, বুভুক্ষা, কামনা ও আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি সব কিছুই যখন মানব জীবনের প্রকৃতি, তখন উহারাই বা যথাযথরূপে সাহিত্যে প্রতিফলিত হইবে না কেন? এক কথায় ঐ বিদ্রোহী দল সাহিত্যে এক নূতনতর বস্তুতন্ত্রের প্রবর্তন করিলেন। হুইসলার, সুইনবার্ণ, এবং অস্‌কার ওয়াইল্ড প্রমুখ ইংরাজ সাহিত্যিকগণ এই আন্দোলনের মুখপাত্র রূপে দেখা দিলেন।

এই আর্টের জন্যই আর্ট নীতি সাহিত্য ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। আর্টের অর্থ যাহাই ধরা হউক, জগতের কোন পদার্থ স্বয়ং-প্রয়োজন হইতে পারে কি! 'খাওয়ার জন্য খাওয়া,' 'ঘুমাইবার জন্য ঘুমান' প্রভৃতি কথার কোন অর্থ আছে কি? প্রত্যেক ক্রিয়াবস্তুর এবং কর্মগতি মাত্রেরই নিজের বাহিরে একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। মানুষ দেহের পুষ্টির জন্য খায় বা ঘুমায়, তেমনি আনন্দের জন্য সাহিত্য আস্বাদন করে। তাহার জীবনে এই আনন্দেরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কাজেই আর্টের অর্থ যাহাই করা হউক না, উহার নিজের মধ্যে কোন sake নাই। ম্যাথু আর্ণল্ড তাই বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—As if Art has a sake.

আর্টকে সৌন্দর্যসাধন বলিয়া ধরিলে, সৌন্দর্যও তো একটি স্বয়ং-প্রয়োজন বস্তু নহে। আনন্দবোধ বা ভাল মন্দলাগা লইয়াই সৌন্দর্যের মাপকাঠি। টলষ্টয় বিদ্রোহীদের উক্তিটিকে একটু পরিবর্তিত করিয়া বলিয়াছিলেন 'Art is for life's sake'. কিন্তু lifeও তো স্বয়ং-প্রয়োজনীয় পদার্থ নহে। বাস্তব জীবনে যাহা লাভ করা যায় না, তাহাকে পাওয়ার একটা বাসনা মানুষের মনে থাকিয়াই যায়। জীবনের সেই অপূর্ণ দিকটার আস্বাদন মানুষ সাহিত্য ও শিল্পকলার মাধ্যমে পাইতে চায়। সুতরাং সাহিত্যকে জীবনের আদর্শ হইতে উৎপাটিত করিলে উহার মূলোচ্ছেদ করা হয়। মানব জীবনকে এবং জীবনের লক্ষ্যকে খণ্ডভাবে দেখার ফল হইতে এই 'Art for art's sake' নীতির উদ্ভব হইয়াছে। সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে জীবনের লক্ষ্য কি? যাহা নিত্য, স্বয়ং লক্ষ্য বস্তু নহে, যাহা মানুষের জীবনের বা সমাজের বা ধর্মের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না তাহা কি করিয়া মানুষের কোন কর্মচেষ্টার লক্ষ্য হইবে? এই প্রকার খণ্ড দৃষ্টির ফলে সর্বত্র একটা আত্মবিস্মৃতির ভাব আসিয়া পড়ে। এই খণ্ড দৃষ্টিই জড়বুদ্ধির পোষকতা করে। তাই আর্ণল্ড, রাস্কিন প্রভৃতি মনীষীরা এই 'আর্টের জন্যই আর্ট' নীতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নূতন বস্তুতন্ত্রবাদীরা একটা কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আর্ট যখন জীবনের অনুগামী তখন জীবনের সব কিছুকেই—'কোষ্ঠ কাঠিন্যের যন্ত্রণা হইতে আসঙ্গলিপ্সা বৃত্তি অতৃপ্ত হওয়ার বেদনা সব কিছুই সাহিত্যে রূপায়িত হইবে।' মানুষের নিম্নতম বৃত্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া বাজার মাৎ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই এই ধরণের মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। যৌনবৃত্তি মানুষের দেহে একটি animal instinct বা পশুসাধারণ বৃত্তি। উহার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই যেমন একদিকে সভ্যতার উন্নতি ও সভ্য মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণ বিকাশের ভিত্তি, তেমনই অন্যদিকে মানুষের অধোগতির এবং পাশব-নিয়তির জন্যও উহাই সহজতম দ্বার। আধুনিক সাহিত্যের এই অভিনব আর্টের সমস্ত কারিকুরি কেবল মানুষের যৌন বৃত্তিটারই খোশামোদ করিয়া চলিয়াছে। যৌনবৃত্তির স্নায়ুমণ্ডলীকে কথার দ্বারা উত্তেজিত করিয়া এবং পাঠককে আত্মবিস্মৃত করিয়া তাহাকে আনন্দ দেওয়াই এই আর্টের উদ্দেশ্য। তবে মানুষের প্রকাশ্য কিংবা গুপ্ত সহানুভূতি হইতেই যে উহা প্রতিপত্তি লাভ করিয়া চলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাম মানুষের আদিবৃত্তি।

এই বৃত্তিকে সাহিত্য অস্বীকার করিতে পারে না। কামকলার চিত্র অঙ্কনও কিছু দোষের নয়। কিন্তু শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়াই যদি উহার উদ্দেশ্য হয় তবে তাহার চেয়ে নিন্দার আর অধিক কিছু হইতে পারে না। আবার জীবনের যাবতীয় ঘটনাকেই কি সাহিত্যে রূপায়িত করা চলে? জীবনের যে কাহিনী একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্যদীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিতে পারে, তাহাই তো সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। জীবন শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস্তব শিল্পের স্বাধীনতাকে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তিনি শিল্পের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মতে, 'আর্ট ফর আর্টস সেক্‌' কথাটি যদি সত্য হয়, তাহলে কিছুতেই তা immoral এবং অকল্যাণকর হতে পারে না। অকল্যাণকর এবং immoral হলে Art for art's sake কথাটিও কিছুতেই সত্য নয়; শত সহস্র লোক তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়। মানবজাতির মধ্যে যে বড় প্রাণ আছে, সে একে কোনমতেই গ্রহণ করে না।' জি. কে. চেস্টারটনের মতটিও এ প্রসঙ্গে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

> The principle of Art for art's sake is a very good principle if it means that there is a vital distinction between the earth and the tree that has its roots in the earth. But it is a very bad principle if it means that the tree would grow just as well with its roots in air.

কাজেই সৌন্দর্যসাধনই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, তাহার সহিত মঙ্গলের সম্বন্ধটি যুক্ত না হইলে সার্থক সাহিত্যের জন্মলাভ সম্ভব নয়।

সাহিত্যে আধুনিকতা

সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা বার বার 'আধুনিক' কথাটিকে ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। প্রতি যুগেই দেখি পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যকে প্রাচীনের কোঠায় ঠেলিয়া দিয়া সেই যুগের সাহিত্য আধুনিকতার দাবী লইয়া পাঠকের সামনে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাঠক স্বভাবতই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার মনে প্রশ্ন জাগে কোন তারিখ হইতে অপর কোন তারিখ পর্যন্ত সময়কে আধুনিকতার পর্যায়ে ফেলা যায়। আজ যাহা

নূতন বলিয়া মনে হইতেছে আগামী কালই তাহা পুরাতন হইয়া যাইবে। মানুষ ক্রমশই প্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। শুধু সাহিত্যে নয় তাহার চালচলন, বেশভূষা এবং সামাজিকতার মধ্যে এই প্রগতির চিহ্ন প্রতি মুহূর্তে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। যে সহমরণ প্রথা বা সাগরে সন্তান বিসর্জন এককালে আমরা পরম পবিত্র কার্য বলিয়া মনে করিতাম আজ তাহা আমাদের কাছে ঘৃণ্য বর্বরতার নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। আসল কথা হইতেছে মানুষের অগ্রগতির প্রচেষ্টা স্থির হইয়া বসিয়া নাই। এই সদা প্রবহমান অগ্রগমনের প্রচেষ্টার স্রোতে পুরাতন ভাসিয়া যাইতেছে, নূতনের জন্ম হইতেছে। এই স্রোত এত দ্রুত প্রবহমান যে, কোন চিহ্ন দ্বারা তাহাকে চিহ্নিত করা যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা 'সাহিত্যে আধুনিকতা'-র বিচার করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে এই বিশেষণটি সাহিত্যের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বিশেষণের দ্বারা এমন এক বস্তুকে খণ্ডিত করা হইতেছে যাহা নাকি কালস্রোতের মতই সতত গতিশীল। সাহিত্যে আধুনিক কাল কোন্‌টি? গতকাল যে সব বই প্রকাশিত হইয়াছে কেবলই মাত্র সেগুলিকেই কি আধুনিক বলিব, না দশ বৎসর অথবা বিশ বৎসর পূর্বের সাহিত্য কীর্তিকেও আধুনিকের তালিকাভুক্ত করিতে পারিব? ঠিক কোন সময়টি হইতে আধুনিক কালের সুরু? স্বভাবতঃই ইহার কোন উত্তর নাই। ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটির কথা। ঐ উপন্যাসে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত প্রশ্নটি একটি সমস্যার আকারে দেখা দিয়াছে। 'নীলদর্পণ' নাটকের সমস্যাটি আজ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও শত বৎসর পূর্বে রচিত এই দুইটি গ্রন্থ আমাদিগকে এখনও এমনভাবে আনন্দ দেয় কেন? ঐ যুগের অণুতম চিহ্নও তো এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আমরা দুই তিন হাজার বৎসর পূর্বে রচিত মহাকাব্যগুলির কথাও উল্লেখ করিতে পারি। অতি-প্রাকৃত এবং অলৌকিকের প্রভূত সমাবেশ সত্বেও এই সভ্যতাগর্বী যুগেও উহারা আমাদের মন হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই। কিন্তু কেন? কোন্ গুণে উহারা প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক প্রভৃতি যুগের সীমাকে উপেক্ষা করিয়া মানব হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সিংহাসন পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে?

মানুষের মনে কতকগুলি স্থায়ী ভাব আছে। বহির্জগতের ঘটনার বৈচিত্র্য অনুসারে এই ভাবগুলি উজ্জীবিত হয়। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে মাতৃক্রোড়ে শিশুকে দেখিয়া মানুষের যে আনন্দ হইত আজও তাহার কোন ব্যতিক্রম নাই। সেই বর্বর যুগেও প্রভাতকালীন জবাকুসুম সূর্যকে দেখিয়া মানুষ যেভাবে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত আজও তাহার কোন অন্যথা হইতে দেখি না। নরনারীর প্রেম পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুরাতন ঘটনা। কিন্তু এখনও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার গোপন প্রণয়-লীলা আমাদের কল্পনাকে একই ভাবে উজ্জীবিত করে। কাজেই 'আধুনিক' এই শব্দটি দিয়া সাহিত্যের কোন অংশকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ আজ যাহাকে আধুনিক বলিতেছি, কালই তো তাহা পুরাতনের কোঠায় চলিয়া যাইবে।

অবশ্য একথা সত্য যে, নদী যেমন চলিতে চলিতে বাঁক নেয় তেমনই সাহিত্যও বাধাধরা পথে চলে না। যেহেতু সাহিত্যের উপকরণ বস্তুজগৎ এবং মানব হৃদয় হইতে সংগৃহীত হয়, সেইজন্য যুগধর্ম ও সমাজ জীবনকে সে অস্বীকার করিতে পারে না। আর একথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, সমাজ জীবন বদ্ধ জলাশয়ের মত নহে—প্রতিনিয়তই চলমান। কাজেই তাহার মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্ন স্বাভাবিক নিয়মেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সাহিত্য এই পরিবর্তনকে বিধৃত করে। আবার প্রতিভাধর সাহিত্যিকের আবির্ভাবে গতানুগতিক সাহিত্যধারা অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্তনকে যুগসীমার মধ্যে হয়ত বা আবদ্ধ করিলেও করা যাইতে পারে—যেমন বিদ্যাসাগর যুগ, বঙ্কিম যুগ, রবীন্দ্র যুগ। কিন্তু এই যুগ আর ইতিহাসের যুগ এক নহে। এই যুগবিভাগের কোন সার্থকতাই থাকিত না যদি ঐ সময়ে রচিত সাহিত্যের মধ্যে শাশ্বত কোন আবেদন না থাকিত।

> আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকারে তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক। কিন্তু

একে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই।--রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। আর মন নিরাসক্ত না হইলে সাহিত্যের রস পুরাপুরি আস্বাদন করা যায় না। বিশেষ যুগে কোন বিশেষ সমস্যাকে লইয়া সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আলোড়ন স্বাভাবিক নিয়মেই এক সময়ে শান্ত হইয়া যায়। যে দৃষ্টি-ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানস এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন এবং যে বিশেষ ভঙ্গি ও রীতির দ্বারা তিনি উহাদিগকে তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকরা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা রবীন্দ্র প্রভাবের বাহিরে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে 'আধুনিক সাহিত্যিক' আখ্যায় ভূষিত করা হইল; কিন্তু সেই আধুনিকের দলও তো এখন প্রাচীনত্বের সীমায় গিয়া পৌছিয়াছেন। কাজেই সাহিত্যকে এই ভাবে খণ্ডদৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। সহৃদয় পাঠক নিরাসক্ত মন লইয়া সাহিত্য রস আস্বাদন করিলে দেখিতে পাইবেন যে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন তিনি এক আনন্দময় জগতে চলিয়া গিয়াছেন—সেই জগতে আধুনিকত্ব বা প্রাচীনত্ব বলিয়া কোন জিনিষ নাই। এই নিরাসক্ত মন বিজ্ঞান চর্চার পক্ষে যেমন অপরিহার্য সাহিত্যের বেলাতেও তেমনই অপরিহার্য। 'সায়েন্সেই বল আর আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।'—রবীন্দ্রনাথ

কল্পনা ও কাল্পনিকতা

'আজ কোন কাজ নয়। সব ফেলে দিয়ে
ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থগীত, এস তুমি প্রিয়ে
আজন্ম সাধনধন সুন্দরী আমার,
কবিতা কল্পনালতা।'

'মানসসুন্দরী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উপরিউক্ত ছত্রে তাঁহার আজন্ম সাধন ধন কবিকল্পনাকে নিজ অন্তরে আহ্বান করিয়াছেন। কবির নিকট কল্পনাই যে এক মাত্র সাধনার ধন, কল্পনাই যে কবিমানস গঠন ও পুষ্টিসাধনে

সাহায্য করে একথা যুগ যুগান্ত ধরিয়া সকল কবিই স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। এই অমিত কল্পনা শক্তির অধিকারী হইতে পারিলেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কালিদাস-ভবভূতি হইতে শেলী-কীট্‌স্ পর্যন্ত বিশ্বের বহুশ্রুত স্বনামধন্য কবিগণ যাঁহারা লোকোত্তর প্রতিভশালী বলিয়া যুগ যুগান্ত ধরিয়া বরণীয় হইয়া আসিতেছেন তাঁহারা সকলেই এই কল্পনা বা muse শক্তির অধিকারী ছিলেন। মধুসূদনও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে কল্পনা দেবীর বেদীমূলে নতজানু হইয়া বলিয়াছেন,

আর তুমিও আইস দেবী মধুকরী
কল্পনা। কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে রচ মধুচক্র। গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে কবি মানসের বিকাশের পক্ষে যে অমিত কল্পনা-শক্তি একান্ত অপরিহার্য সে কল্পনা বস্তুটি কি? উদ্ভট চিন্তা বিলাসই কি কল্পনা, না কল্পনার কোন ধরাবাঁধা সুনিয়ন্ত্রিত রূপ আছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে নিছক ভাব বিলাস ও বস্তুসম্পর্কে নিজের মনগড়া অবাস্তব ধারণাকে কখনই 'কল্পনা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

কবিরা যখন কোন বিষয়কে প্রকাশ করেন তখন সেই বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বহু পূর্ব হইতেই কবির মানসরাজ্যে নিহিত থাকে। কবি সেই অন্তরের বস্তুটিকেই বাহিরে প্রকাশ করেন। যেখানে কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কবির কোন পূর্বধারণা থাকে না, যাহা কবির অন্তর হইতে রস সংগ্রহ করে না, তাহা প্রকৃত কল্পনা নহে—সমালোচকেরা তাঁহার নাম দিয়াছেন কাল্পনিকতা।

কল্পনা যুক্তির দ্বারা সুনির্দিষ্ট, সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সত্যের দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু কাল্পনিকতার মাঝে সত্যের কোন বন্ধন নাই, সঙ্গতির কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। এককথায় বলিতে গেলে কল্পনার মাঝে কোন অসঙ্গতি নাই। কিন্তু কাল্পনিকতার মাঝে অসঙ্গতিরই উচ্ছল প্রকাশ। Probable impossibilities হইল কল্পনা আর Improbable possibilities হইল কাল্পনিকতা।

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উনবিংশ শতকের এই মহাকাব্যে কল্পনার যে প্রকাশ

হইয়াছে তাহা সুনিয়ন্ত্রিত। বাল্মীকি যে কাঠামোটি তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন, মধুসূদন সেই কাঠামোটিতেই কল্পনার মৃণ্ময় মূর্তি গঠন করিয়াছেন। এই কল্পনার জন্ম কবির মনোভূমি হইতে। কবি প্রভূত বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠার বলে তাঁহার এই কাব্যটি রচনা করিয়াছেন। বহুস্থানেই তাঁহাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব সত্যের সহিত তাঁহার কল্পনার মাধুর্যের কোন অসঙ্গতি নাই। কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন তাহা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। অন্ত কোন বিপর্যয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে ঘটে নাই। কিন্তু পরবর্তী যুগের ভাবপ্রবণ কবিগণের রচনায় কল্পনার এ জাতীয় বলিষ্ঠতা আর চোখে পড়ে না। উনবিংশ শতকের গোড়া হইতে যখন দেশব্যাপী গীতি-কবিতা লিখিবার একটি প্রবণতা দেখা দিয়াছিল তখন অধিকাংশ কবি তাঁহাদের কাব্যে কল্পনা ও কাল্পনিকতা এই উভয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্যটি নিরূপণ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের কাব্য অবাস্তব ভাববিলাসে পরিপূর্ণ ছিল। একথা ভুলিলে চলিবে না আকাশকুসুম কোন কল্পনা নহে, ইহা এক ধরণের কাল্পনিকতা। কিন্তু আকাশের আলো ধরণীর বুকে আসিয়া পড়িয়াছে, কোন কবি যদি কল্পনা শক্তি বলে সেই প্রভাতী সূর্যের বিচ্ছুরণকে বিশ্বসমুদ্রের ঊর্মিমালার উপর নটরাজের চঞ্চলপদের নৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন তাহা হইলে কল্পনাবলে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হইয়া উঠিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্কট তাঁহাদের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস হইতে বিষয় গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে কল্পনার রঙে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। ইতিহাসকে তাঁহারা পটভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উপর কল্পনাপটে রসের তুলি বুলাইয়া তাহাকে সাহিত্যে পরিণত করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য ইতিহাসকে বহুলাংশে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু স্কটের উপন্যাসে আমরা ইতিহাস-সমুদ্রের একটা অস্পষ্ট কল্লোলধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাই না। কিন্তু স্কটের কল্পনা এতই সুসঙ্গত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁহার প্রতিটি উপন্যাস অবাস্তবতা ও কাল্পনিকতার স্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া এক অপরূপ রসসৌকর্যে মণ্ডিতহইয়া উঠিয়াছে।

অথচ এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করিয়া অনেক যাত্রা নাটক বাঙ্গলা ভাষায় রচিত হইয়াছে কিন্তু সুসংহত কল্পনাশক্তির পরিপূর্ণ প্রয়োগ সে-গুলিতে না হওয়ায় তাহারা অতি নাটকীয় কাল্পনিকতায় পরিণত হইয়াছে।

কল্পনা ও কাল্পনিকতা উভয়েই বাস্তব সত্য নহে। উভয়ের মধ্যেই সত্যের ভাগ আছে কিন্তু যাহা কল্পনা তাহার মধ্যে এই ভাগটি ধরা পড়ে না, তাহাকেই সত্য বলিয়া বোধ হয়। কাল্পনিকতার মধ্যে কিন্তু এই ভাগটি অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই অমিত কল্পনা শক্তির বলে কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টি করেন। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিক এক ধরণের অত্যুগ্র-বাস্তববাদী লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, ইঁহারা রচনার মধ্যে কল্পনাকে স্বীকার করেন না। যাহা দেখেন তাহাকেই হুবহু বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলেন। আর এক ধরণের লেখক আছেন যাঁহারা তাঁহাদের অসাধারণ কল্পনা শক্তির বলে বাস্তব জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহাদের কল্পনাশক্তি এতই প্রখর যে তাঁহাদের অগোচরে যেখানে যে ঘটনা নিয়ত ঘটিয়া চলিতেছে তাঁহাদের কল্পনাপটে তখনই তাহার প্রতিফলন পড়িতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্য প্রতিভাধরদের একজন। নিজে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়া ও আজন্ম চরম প্রাচুর্যের মধ্যে কাটাইয়াও তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া অতি তুচ্ছতম সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন এই কল্পনা শক্তির জন্যই। তাঁহার কল্পনা যেমন স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে ধাইয়াছে, আবার তেমনই 'কিনু গোয়ালার গলি'র নগ্ন কদর্যতাকে এক লহমায় উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃত কল্পনা বলিতে তাই নভোচারী অবাস্তব রাজ্যগামী কল্পনার কথা বুঝায় না। কল্পনার লঘুপক্ষ বলাকা ঝিলমের স্রোতের উপরও যেমন উড়ে, তাহা আবার দরিদ্র কুটিরবাসীর উঠানেও বসিয়া বিশ্রাম লইতে জানে। ইহাই প্রকৃত কল্পনাশক্তির বৈশিষ্ট্য।

চিত্র ও সঙ্গীত

পৃথিবীর সকল দেশেরই প্রাচীন সাহিত্য ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত। মানব হৃদয় জগৎ ও জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ভাবাবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠে এবং ছন্দোবদ্ধ বাণীতে আত্মপ্রকাশ করে। ভাবাবেগে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিলে বাল্মীকি মুনির অন্তর হইতে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ছন্দোবদ্ধ বাণী নিঃসরিত হইয়াছিল। ভাবপ্রবণ হৃদয়ে এই প্রক্রিয়া এখনও চলিতেছে।

কবি তাঁহার হৃদয়ের 'অলৌকিক আনন্দের ভার' সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চান এবং এই ধূলিধূসরিত ধরণীর দুঃখ-বেদনা ও মালিন্যকে দূর করিয়া দিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তুলিতে চাহেন। আকাশ পটে 'পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি'-কে ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি চাহেন,

> সুখ হাসি আরো হবে উজ্জ্বল,
> সুন্দর হবে নয়নের জল,
> স্নেহ সুধামাখা বাসগৃহতল
> আরো আপনার হবে।
> প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
> আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
> আরেকটু স্নেহ শিশুমুখে' পরে
> শিশিরের মত রবে।

জগৎ ও জীবনকে লইয়াই সাহিত্যের কারবার। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে জগৎ ও জীবন তাহাদের বাস্তব-সর্বস্ব রূপ লইয়া কবির কাব্যে প্রকাশিত হয় না। ভাবুকচিত্তে বাহিরের জগৎ আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।

> লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে। বাহিরের বিশ্ব ইহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাদে, নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে। ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার।—রবীন্দ্রনাথ

এই জগতের কথা প্রকাশ করাই কবির কাজ। কিন্তু কবি যদি নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধাভাবে তাহা প্রকাশ করিতে যান তবে তাহা হৃদয়গ্রাহী হইবে না। কারণ,

> অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার

জন্ম সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে ছুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সঙ্গীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই।...এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোন মতে বলিবার জো নাই এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীত সঞ্চার করিয়া দেয়। অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।—রবীন্দ্রনাথ

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, নৃত্য, অভিনয়, চিত্র এবং সঙ্গীত—ইহাদের লইয়াই শিল্পকলা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে সাহিত্যই সমস্ত শিল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সাহিত্য শিল্পকলার সমস্ত বিভাগকে আত্মসাৎ করিয়া স্বকীয় মহিমায় নিজেকে বিকশিত করিয়াছে। সমস্ত বিভাগকে নিজের দেহের মধ্যে অঙ্গীভূত করিলেও চিত্র ও সঙ্গীত তাহার প্রাণ। তুলিকা দ্বারা শিল্পী যে মনোরম চিত্র সৃষ্টি করেন সাহিত্যিক বাক্যের দ্বারা চিত্রের সেই বর্ণাঢ্য মূর্তিকে সাহিত্যে প্রকাশ করেন। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'-কে রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলারূপে অভিহিত করির'ছেন। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' কথার বন্ধনে সার্থক চিত্রকলার নিদর্শন। তেমনই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বা 'আরণ্যক' শ্রেষ্ঠ চিত্রের সমকক্ষতা দাবী করিবার স্পর্ধা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্যে অপূর্ব চিত্র নৈপুণ্যের প্রভূত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সঙ্গীতের অনির্বচনীয় সুষমাও সাহিত্যে ধরা পড়ে। কালিদাসের 'মেঘদূত', জয়:দেবের 'গীতগোবিন্দ', বৈষ্ণব পদাবলী-সমূহ, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যগুলি সঙ্গীতের মতই উপভোগ্য। এইগুলি পাঠ করিতে করিতে আমরা সঙ্গীতের মায়ালোকে পৌছিয়া যাই।

অবশ্য বলাই বাহুল্য সাহিত্যে সঙ্গীত এবং চিত্র এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং মানব জীবন হইতে উপকরণ লইয়াই রূপলাভ করে। যে সঙ্গীতে সুরেরই প্রাধান্য, কথাবস্তু যেখানে অনুপস্থিত তাহা সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত নহে। কবির

হৃদয়ে যে আবেগ সঙ্গীতের মাধুর্যে প্রকাশিত হইতে চায় সেই আবেগ সৃষ্টির মূলে পরিচিত জগতের একটি সমুজ্জ্বল চিত্র থাকে। বাল্মীকি মুনির অন্তরে যে আবেগ 'সমাসন্ন আষাঢ়ে' মহানদ ব্রহ্মপুত্রের মত ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিতান্ত বায়বীয় ছিল না। ব্যাধের শরে নিহত ক্রৌঞ্চীর দুঃখে আর্ত ক্রৌঞ্চের বেদনার দৃশ্যটি মুনির চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। অতএব শুধুমাত্র চিত্র অথবা শুধুমাত্র সঙ্গীত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই দুইয়ের সমবায়ে সার্থক সাহিত্যের জন্ম। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্র ও সঙ্গীত আঙ্কিক মাত্রায় সাহিত্যে সমভাবে বিদ্যমান থাকিবে এমন কোন কথা নাই। কোন সাহিত্যিকের রচনায় চিত্র মুখ্য হইয়া উঠে, সঙ্গীতাংশ থাকে নিতান্তই গৌণ। কোন কোন সাহিত্যিকের রচনায় ইহার বিপরীত দেখা যায়। সাধারণতঃ কাব্যে সঙ্গীতাংশ, নাটক ও কথাসাহিত্যে চিত্রাংশের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে চিত্র ও সঙ্গীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হইলেও তাহারাই সাহিত্যের সব কিছু নয়। সাহিত্যিক বস্তু জগৎ এবং হৃদয়জগৎ হইতে বিভিন্ন প্রকারের উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তাহা প্রধানতঃ চিত্র ও সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত বস্তু শুধু চিত্র বা সঙ্গীতের আস্বাদনই আনিয়া দেয় না পরন্তু ইহাদের অতিরিক্ত এক পরম রসমাধুর্যে পাঠক চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দেয়। এই অতিরিক্ত বস্তুটি কবির সৃজনীকল্পনা হইতে উদ্ভূত।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রকেও সঙ্গীত-মূলক ও চিত্রমূলক এই দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

> শব্দের দুইটি অংশ— ধ্বনি (Sound) ও অর্থ (Sense)। 'ধ্বনি' হইতেছে 'সঙ্কেত', 'অর্থ' হইতেছে 'সঙ্কেতিত'। শব্দের সঙ্কেত-রূপ যে ধ্বনি, তাহার আশ্রয়ে শব্দালঙ্কার, আবার শব্দের সঙ্কেতিত রূপ যে অর্থ, তাহার আশ্রয়ে হয় অর্থালঙ্কার। শব্দ যেখানে সঙ্কেত-সঙ্কেতিত সম্পর্ক ছাড়াই কেবল ধ্বনিরূপ বা Sound value দ্বারা অর্থকে ধ্বনিত বা আভাসিত করিতে পারে, সেখানে খাঁটি শব্দালঙ্কার। ইহাতেই কাব্যের সঙ্গীত ধর্ম পরিস্ফুট।.........শব্দালঙ্কারের আর একটি ভেদ আছে, তাহা ধ্বনি চাতুর্য মাত্র, তাহা কদাচ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে না। ইহাতে কাব্যের চিত্র ধর্ম পরিস্ফুট।......একের কারবার শব্দ-

জগৎ ও সঙ্গীত লইয়া, অপরের কারবার দৃশ্য-জগৎ ও চিত্র লইয়া।'
—ডাঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্ত।

বহিঃ প্রকৃতি এবং মানব চরিত্র এই দুইকে লইয়াই সাহিত্যের কারবার এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই দুই বস্তু মানুষের অন্তরে অহরহ বিচিত্র আকারে ধরা পড়িতেছে এবং সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত। মানব হৃদয়ের আনন্দ-সৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই-যে মানসসঙ্গীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিঃশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিণী বাজাইতেছে সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন

শিল্পরসিক রাজার সামনে একটি নগ্ন নারীচিত্র রাখা হইল। চিত্রটির পানে তাকাইয়াই রাজা বলিয়া উঠিলেন, 'অশ্লীল'। চিত্রকর বলিলেন, 'মহারাজ! উহা অশ্লীল নয়।' রাজা বলিলেন, 'অশ্লীল তবে কি'? 'দেখাইতেছি' -এই বলিয়া চিত্রকর চিত্রটি লইয়া বাহিরে গেলেন এবং তুলি দ্বারা নগ্ন নারী মূর্তির দুই পায়ে দুইটি মোজা পরাইয়া দিলেন। তারপর চিত্রটি যখন রাজার সামনে আনা হইল রাজা এক লহমার জন্যে চিত্রটির পানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া চোখ ঢাকিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'হটাও হটাও, এ অতি জঘন্য।'

নগ্ন নারীদেহের মধ্যে যে একটি অনাবৃত সুষমা ছিল, সমগ্র তনুলতাখানি ঘিরিয়া যে একটি সারল্যের আবরণ ছিল পরবর্তী চিত্রে তা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়াছে। পায়ে দুইটি মোজা পরাইয়া দেওয়ার ফলে দেহের নগ্নতা এত প্রকট হইল, নারীদেহের যে একটি স্বতন্ত্র লাবণ্য আছে তাহাকে উপেক্ষা

করিয়া তাহার স্থূল নগ্নতার দিকে দর্শককে এমনভাবে আকৃষ্ট করা হইল, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য দর্শকের আদি রিপুকে জাগ্রত করিয়া দেওয়া। ফলে দর্শকের মনে গভীর লজ্জার উদ্রেক হইল এবং তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকিল একটি জুগুপ্সার ভাব। পাঠক-মনে যে সাহিত্য এই ভাব জাগ্রত করিয়া দেয় তাহাই অশ্লীল। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতেও, 'নির্জনে একাকী বসিয়া পাঠ করিলেও যে সাহিত্য পাঠকের মনে লজ্জা ও ঘৃণার ভাব জাগ্রত করে তাহাই অশ্লীল।'

প্রশ্ন উঠিতে পারে লজ্জা ও ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হইলেও তাহার সঙ্গে যে মনে একটি আনন্দের ভাব আসে তাহা তো অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই আনন্দ কাহারও কাম্য হইতে পারে না। সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য রস সৃষ্টি করা, যাহা আমাদের মনকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সাহিত্যে-সৃষ্ট রসের সঙ্গে সত্য, সৌন্দর্য ও মঙ্গলময়তার সম্পর্কটি অপরিহার্য। অর্থাৎ সাহিত্যের আনন্দ মনে যদি উন্নত ভাবের সৃষ্টি না করে, মনকে যদি এক অলৌকিক মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া দিতে না পারে তবে তাহাকে সৎ সাহিত্য বলা যাইতে পারেনা। মনে আনন্দ যে-কোন উপায়ে সৃষ্টি করা যাইতে পারে। অজানাকে জানিবার আগ্রহ মানুষের অপরিসীম। এই আগ্রহ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সে দুর্গম পথে অভিযাত্রীরূপে বাহির হইয়া পড়ে। এই অভিযানের আনন্দ অপরিসীম। রাত্রির গভীর অন্ধকারে দস্যুতাও একশ্রেণীর অভিযান। তাহাতেও একশ্রেণীর ব্যক্তি আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাকে কি অভিযানের আনন্দ বলা যাইতে পারে ?

মানুষের মধ্যে পশুত্ব রহিয়াছে। ষড়রিপুকে যিনি সুসংহত রাখিতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ মানব আর উহাদের তাড়নায় যে আত্মসমর্পণ করে তাহাকেই আমরা পশু বলি। রিপুর তাড়নাকে সংযত রাখিতে পারে বলিয়াই মানুষ বিশুদ্ধ 'animal' নয়, 'rational animal'। যে পারেনা সে বিশুদ্ধ 'জন্তু'। সাহিত্য মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে, তাহাকে উন্নত, মহৎ করিয়া তোলে। কিন্তু যে সাহিত্য শুধুমাত্র তাহার animal instinct-গুলিকে (পশুসুলভ বৃত্তি) জাগ্রত করিয়া তাহার মনে পশুসুলভ উত্তেজনা আনিয়া দেয় এবং ইহাকেই আনন্দ বলিয়া প্রচার করিতে চায় তাহাই হইতেছে যথার্থ অশ্লীল সাহিত্য।

সাহিত্যে অশ্লীলতা বলিতে আমরা যে সাহিত্যকে বুঝিয়া থাকি তাহা গল্প-উপন্যাস, নাটক ও কবিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডাক্তারী, যৌনবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থে নরনারীর যৌনকর্ম সবিস্তারে বর্ণিত হয়। উহাদিগকে আমরা অশ্লীল বলিনা। অভিধানে 'প্রচুর অশ্লীল শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকে, কেহই সেগুলিকে বাদ দিয়া দিতে বলেনা। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে অর্থাৎ মানুষকে আনন্দ দান করিবার জন্য যে সাহিত্য রচিত হয় শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি তৎসম্পর্কেই জড়িত। আর অশ্লীল বলিতে আমরা এক কথায় আদি রসাত্মক রচনাকেই বুঝিয়া থাকি। অথচ নামেই প্রকাশ আদিরস মানব মনের প্রথম রস। সাহিত্যে এই রস শ্রেষ্ঠ রসের পর্যায়ে পড়ে। তাবৎ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে এই রসেরই ছড়াছড়ি।

কিন্তু শুধু আদি-রসাত্মক ব্যাপারই কি অশ্লীল? যাহা আমাদের রুচিবোধকে গভীরভাবে পীড়া দেয় তাহা কি অশ্লীল নয়? কোন বাঙ্গালী মেয়েকে যদি দেখি যে সে প্যান্টুলন ও হাওয়াই সার্ট পরিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে রাস্তা দিয়া চলিয়াছে তখন কি আমাদের রুচিবোধে তীব্র আঘাত লাগে না? ইহাও তো অশ্লীল।

এই অশ্লীলতার প্রশ্নটির সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশটির কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের সমাজে প্রকাশ্যে চুম্বন অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ইউরোপীয় সমাজে যত্রতত্র প্রকাশ্যে চুম্বন কাহারও মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত করে না বা ইহাকে কেহ নিন্দনীয় বলিয়াও মনে করে না। তেমনই প্রত্যেক দেশের রুচি ও সংস্কারবোধ যুগে যুগে বদলায়। ভিক্টোরিয়ার যুগে ইংরাজ রমণীরা যে ভাবে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া পোষাক পরিচ্ছদ পরিতেন সেই তুলনায় বর্তমান যুগের ইংরাজ মেয়েকে অর্ধনগ্ন বলিলেও চলে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের সংস্কার ও রুচিবোধের সঙ্গে আজিকার বাঙ্গালী সমাজের আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে।

সাহিত্যে অশ্লীলতা বলিতে আমরা নরনারীর যৌন কামনার বা ক্রিয়ার চটকদার বর্ণনাকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই অশ্লীলতা অনেক সময় ভাষার দোষে বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়া উঠে। অসার্থক সাহিত্যিকের হাতে যাহা যৌন বিকার-রূপে পাঠকের কাছে প্রতিভাত হয় সার্থক সাহিত্যিক তাহাকেই রসোত্তীর্ণ করিয়া তোলেন। আর অশ্লীলতা (obscenity) এবং অভব্যতা (vulgarity) যে এক জিনিষ নয় তাহাও মনে রাখিতে হইবে।

ভাষা প্রয়োগের তারতম্যে খুব শ্লীল জিনিষও অভব্য হইয়া ওঠে। 'নীলদর্পণ'-এর তোরাপের মুখে যে কথাগুলি সহজ ও স্বাভাবিক মনে হয়, নবীনমাধব সেগুলি উচ্চারণ করিলে অত্যন্ত অভব্য মনে হইত।

সংস্কৃত সাহিত্যে নারীদেহ বর্ণনায় বিশেষ বাড়াবাড়ি দেখা যায়। যৌন মিলনের কথাও সংস্কৃত কবিরা বিনা দ্বিধায় বলিয়া গিয়াছেন। অনেক উন্নাসিক ইহাতে অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, সংস্কৃত কবিরা নরনারীর কামবৃত্তিকে ক্ষুধা তৃষ্ণার মতই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেন এবং এজন্যই নির্দ্বিধায় সাহিত্যে এই বৃত্তিকে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু উহা যাহাতে রসোত্তীর্ণ হইয়া সবিশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়, সেদিকে তাঁহারা বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে 'কাম' এই স্থায়ী ভাবের 'রস' হইতেছে আদি রস।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ যোগ্য। সংস্কৃত কবিরা প্রেম ও কামের কোন পার্থক্য করেন নাই। আর তাঁহাদের সময়ে স্ত্রীলোক পাঠিকা ছিলেন না। পুরুষ পাঠককে উপলক্ষ করিয়াই তাঁহারা কাব্য রচনা করিতেন। মানব মনের স্বাভাবিক বৃত্তিকে রূপদানের মধ্যে কোন প্রকার সঙ্কোচ থাকিতে পারে একথা তাঁহারা মানিতেন না।

> "What is natural can not be vicious, what every one knows, surely everyone may express; and that mind which is only safe in ignorance, or which is only defended by decorum, possesses but a very feeble defence and impotent sincerity. —সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা Horace Hayman Wilson.

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা নরনারীর যৌন কামনার কথা যথেষ্টই চিত্রিত করিয়া থাকেন। তবে সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে তাঁহাদের প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়া সবিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সংস্কৃত কবিরা যাহা সোজাসুজি বর্ণনা করিতেন আজিকার সাহিত্যিকরা তাহাই ইঙ্গিতের আবরণে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

> রসের উপলব্ধিতে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের মধ্যে পার্থক্য বেশী নেই, কেবল ব্যঞ্জনা পদ্ধতি বিভিন্ন। কবি যা প্রকাশ করতে চান, তার প্রকৃত রূপ বদলায়নি, রূপক বদলেছে। সে কালের

স্থুল ও স্পষ্ট অলঙ্কার এখন সূক্ষ্ম সংবৃত হয়েছে।—রাজ শেখর বসু কিন্তু তাহাতে আবেদন বরং আরো তীব্র হইয়া উঠে।

Euphemisms emphasize as much as they conceal; it sounds no more indelicate to say openly that a man lays with a woman than it does to say he had relations with her, besides being a more accurate phrase.

—Lord David Cecil

কোন কোন লেখক আছেন, যাঁহারা সজ্ঞানে তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রয়োগ করেন না। কোন একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় তাঁহাদের মনে ভাবাবেগ এত তীব্র হইয়া উঠে যে বর্ণনার খাতিরেই তাঁহারা তথাকথিত অশ্লীলতার প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। যেমন ইংরাজী সাহিত্যে ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং এবং কবি ডন। তেমনই এক শ্রেণীর হাস্যরসিক সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা রসসৃষ্টির খাতিরে অশ্লীলতার আশ্রয় নেন। তাঁহাদের সাহিত্য হইতে এই সকল উপাদান বাদ দিলে কিছুই থাকিবে না। 'ট্রিষ্ট্রাম স্যাণ্ডি'র লেখক স্টার্ণ এই পর্যায়ে পড়েন। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যকে কোনক্রমেই অশ্লীল বলা চলিতে পারে না। কারণ ইঁহারা রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের রচয়িতা।

একদল সাহিত্যিক মনে করেন যে, জীবন রূপায়ণই যখন সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য তখন ইহার কোনদিকই বাদ দেওয়া চলেনা। কাজেই তাঁহারা মনস্তত্ত্বের সূত্র ধরিয়া বিবাহের প্রথম রাত্রির অভিজ্ঞতা হইতে আত্মরতি পর্যন্ত সব কিছুই নির্লজ্জ সরলতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইংরাজ ঔপন্যাসিক জেমস্ জয়েস, ডি. এইচ লরেন্স, ফরাসী ঔপন্যাসিক জাঁ পল সার্ত্র্ এই দলে পড়েন। ইহাতেও ক্ষতি নাই যদি তাহাতে আমরা জীবনের সম্যক রূপ লাভ করি। দেহ অপবিত্র জিনিষ নয়। বৈষ্ণবকবি প্রিয়তমকে যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করিতে চাহেন তাহা দেহ। কিন্তু এই দেহের সঙ্গে দেহাতীতকে উপলব্ধি করিতে পারি বলিয়াই তাহা আমাদিগকে শ্লীলতা অশ্লীলতার সীমার ঊর্ধ্বে অলৌকিক রসলোকে লইয়া যায়। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলে রোমাঁ তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'Body's Rapture'-এ যৌনমিলনের সুদীর্ঘ চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, দেহের উল্লাস মানব মনের শ্রেষ্ঠ উল্লাস। তান্ত্রিকরাও বলিয়া থাকেন যে ভগবান প্রাপ্তির

আনন্দের সঙ্গে যদি কোন কিছুর তুলনা দিতে হয় তবে তাহা একমাত্র যৌন-মিলনের আনন্দ। কাজেই রসোত্তীর্ণ হইয়া পাঠক মনে যদি সুষমামণ্ডিত আনন্দের উদয় হয় তবে কোন কিছুই অশ্লীল হইতে পারে না।

সাহিত্যে সত্য ও সুন্দর

রসসৃষ্টিই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ রসের সঙ্গে সত্য, মঙ্গলময়তা এবং সৌন্দর্য জড়িত থাকা চাই। বস্তুজগৎ এবং মানব হৃদয় তাহাদের বহু উপকরণ ও ভাবনা লইয়া সাহিত্যিকের চিত্রপটে প্রতিফলিত হয় এবং একটি স্বতন্ত্র জগতের সৃষ্টি করে। সাহিত্যিক সে জগৎকে রসমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করেন। ফলে বস্তুজগতের যে সব সামগ্রী এমনিতে কদর্য বলিয়া প্রতিভাত হয় সাহিত্যিকের জগতে তাহারা কদর্যচ্যুত হইয়া এক অপরূপ সুষমা লাভ করে। অবশ্য অত্যধিক পরিমাণ বাস্তবতার মোহে কোন কোন সাহিত্যিক শুধু বস্তুর কদর্য দিকটাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শিল্পীকে আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী বলিয়া জানি। তিনি যদি তাঁহার এই ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া শুধুমাত্র বস্তুর কদর্য দিকটার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখেন তবে শিল্পীর মর্যাদা তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না।

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে সৌন্দর্যকে অনুভব করিবার শক্তি পাঠকেরও থাকা চাই। যে ব্যক্তির হৃদয়ে সৌন্দর্যানুভূতি নাই তাহার কাছে সৌন্দর্যের আবেদন ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া এই সৌন্দর্যানুভূতি একটি আয়াসলভ্য জিনিষ নহে। ইহা মানুষের অন্তরের সহজাত বৃত্তি। মানবের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই আদিম বর্বর যুগেও মানুষ সুন্দরের কাছে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে। তাই গুহায় বসবাসকারী মানুষও গুহার গাত্রে অপটু হস্তে সুন্দরকে বন্দী করিতে চাহিয়াছে, প্রভাত সূর্যের পানে তাকাইয়া সে বিস্মিত হইয়াছে। এই সৌন্দর্যানুভূতি বা সৌন্দর্যবোধ আপাত দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও আসলে মানব জীবনে তাহার পরম সার্থকতা রহিয়াছে। মানুষ তাহার সৃষ্টিকর্তার মতই লীলাময়।

সৃষ্টিকর্তা আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা

ভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে।...মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।—রবীন্দ্রনাথ

আপন সৃষ্টির মধ্যে নিজের রসবিচিত্র পরিচয় পায় বলিয়া মানুষের কাছে তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়।

যে সত্যকে আমরা 'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর, তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে-কোনো জিনিষ আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকে সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর। মানুষ আপনার এই প্রিয়ের ক্ষেত্রকে, অর্থাৎ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে। তার বাধাহীন বিচিত্র বৃহৎ লীলার জগৎ সাহিত্য। সত্যের এই যে সুন্দর রূপ সাহিত্য তাহারই প্রকাশ।

—রবীন্দ্রনাথ

সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদের বোধ শক্তি জাগ্রত হওয়া দরকার। এই সৌন্দর্যবোধ কি করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবা মাত্রই চোখে ধরা পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে একদিকে সুন্দর ও আর একদিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তারপরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে। তখন যে জিনিষ আমাদের মনকে টানে, সেটা হয়ত চোখ মেলিবামাত্রই দৃষ্টিতে পড়িবার যোগ্য বলিয়া মনে না হইতেও পারে। আরম্ভের সহিত শেষের, প্রধানের সহিত অপ্রধানের, এক অংশের সহিত অন্য অংশের গূঢ়তর সামঞ্জস্য দেখিয়া যেখানে আমরা আনন্দ পাই, সেখানে আমরা চোখ-ভুলানো সৌন্দর্যের দাসখত তেমন করিয়া আর মানি না। তারপরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়।...মঙ্গলের মধ্যেও একটা দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালো-মন্দের একটা অপেক্ষা রাখে। ...আমাদের সৌন্দর্য বোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর

ও অসুখকর, জীবনের মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর, এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়। তখন কি হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুঁচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য। মানবের সমস্ত সাহিত্য, সংগীত, ললিতকলা জানিয়া এবং না জানিয়া এই দিকেই চলিতেছে।—রবীন্দ্রনাথ

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা বস্তুজগতের রূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি তখন সুন্দর ও অসুন্দর এই দুইটি রূপ আমাদের মনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু যখন আমরা এই কথা উপলব্ধি করিতে পারি যে, এই বস্তুজগতের সব কিছুর মধ্যেই লীলাময়ের প্রকাশ ঘটিতেছে তখন এই প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। কোন জিনিষকে খণ্ডভাবে না দেখিয়া সব কিছুর মধ্যেই যখন গূঢ়তর সামঞ্জস্যটি আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসে তখনই আমরা সৌন্দর্যের যথার্থ স্বরূপ বুঝিতে পারি। সমস্ত বিশ্বচরাচর এক অখণ্ড সত্তায় বিধৃত, এই অখণ্ড উপলব্ধির ফলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্য ও সুন্দরে কোন পার্থক্য নাই। যে অখণ্ড সত্তার কথা বলা হইল তিনি পরম সত্য। লীলাময় সুন্দর একথাও আমরা জানি, কাজেই সত্যে ও সুন্দরে প্রভেদটি আপনা হতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবকে এবং প্রকৃতিকে এক অখণ্ড সত্তারূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। পৃথিবী একদিন আদি জননী সিন্ধুর গর্ভে বিলীন ছিল। মানব ও প্রকৃতি পৃথিবীর সন্তান। আদি জননীর গর্ভে যখন পৃথিবীরূপী কন্যা ভ্রূণাকারে দেখা দিলেন তখন সেই ভ্রূণের মধ্যে মানব ও প্রকৃতি সুপ্তাবস্থায় ছিল। তারপর কন্যা পৃথিবীর জন্ম হইল, বহুযুগ কাটিয়া গেল, মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ক্রমে মানুষে মানুষেও বিচ্ছেদ দেখা দিল। কবি এই বিচ্ছেদের বেদনায় কাতর। পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজ ও প্রকৃতি-জগৎ একদিন যে ভাবে অঙ্গে অঙ্গ জড়াইয়া ছিল কবি সেই অবস্থায় আবার ফিরিয়া যাইতে চাহেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি। মানুষকে ও বস্তুজগৎকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখিলে সুন্দর ও অসুন্দর এই দুইটি দিকই আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু

যদি রবীন্দ্রনাথের মত সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তখন সমগ্র মানব-সমাজ ও বস্তুজগৎ এক অখণ্ড সত্তায় আমাদের কাছে সত্যের উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠে। নিজেকে যেমন আমি অসুন্দর মনে করিনা তেমনই যে অখণ্ড সত্তায় আমি বিধৃত তাহাকেও অসুন্দর মনে করিতে পারিনা। এই ভাবে সত্য ও সুন্দর এক হইয়া যায়।

সুন্দরের পূজারী ইংরাজ কবি কীটস্ সত্যের এই সৌন্দর্যমূর্তিকে রূপ দিতে গিয়া বলিয়াছেন,

Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know

প্রাচীন গ্রীসের একটি মৃৎপাত্র দেখিয়া কবির মনে সৌন্দর্যলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাত্রটির গাত্রে অঙ্কিত কতগুলি চিত্র জীবন্তরূপে কবির মানসপটে তাহাদের মূর্তি প্রতিফলিত করিতেছে। কবি ভাবিলেন যে, বহুযুগ পরেও এই সকল চিত্র মানবমনে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করিবে। কাজেই এই সুন্দর চিত্রগুলি কবিমনে এক অবিনশ্বর সত্যের সন্ধান আনিয়া দিল। কবি উপলব্ধি করিলেন যে, সৌন্দর্যের মধ্যেই সত্যের অমৃতরূপ নিহিত রহিয়াছে। প্রেমোন্মত্ত প্রেমিক প্রেমিকাকে ব্যাকুল বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতে চায়, স্মিতমুখে প্রেমিকা পলায়নপর হয়। এই ঘটনা পৃথিবীতে প্রতিদিন অজস্রটি ঘটিতেছে। কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনে এই ঘটনা যখন ঘটিতে দেখি তখন আমাদের মনে ইহা বিশেষ কোন সাড়া জাগাইতে পারেনা। কিন্তু গ্রীসদেশীয় মৃন্ময় পাত্রে অঙ্কিত এই চিত্রটি আমাদের মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি করে কিন্তু কেন? সৃষ্টি করে এইজন্য যে, প্রেমিকার পশ্চাদ্ধাবনরত প্রেমিকের ঐ নৈর্ব্যক্তিক রূপটি আমাদের মনের অনুরূপ ভাবকে জাগ্রত করিয়া দেয়। চিরকাল ধরিয়া তাহাই হইবে। এইজন্যই যাহা সুন্দর তাহা সত্য এবং যাহা সত্য তাহা সুন্দর।

সাহিত্যে অনুবাদ

সাহিত্যে অনুবাদের স্থান অতি উচ্চে। বিশ্ব-মানবের সমগ্র চিন্তাধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে হইলে একমাত্র অনুবাদ সাহিত্যের মারফতই তাহা হইতে পারে। সেই হিসাবে অনুবাদকে বিশ্ব-মানব-মনের গবাক্ষ বলা যাইতে

পারে। শুধু সমসাময়িক চিন্তাধারার সঙ্গেই নয় পরন্তু অনুবাদ কালের সীমা অতিক্রম করিয়া, স্থানের পরিধি লঙ্ঘন করিয়া, ভাব বিনিময়ের পরিবহন-কর্ম সাধন করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া থাকে। নিজেকে বিস্তার করিবার ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আর কিছু হইতে পারে না। ইহার যে কি অপরিসীম মূল্য তা নির্ণয় করা অসম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজী সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সাহিত্য যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ হইল, এই সাহিত্যের সুপরিপুষ্ট অনুবাদ বিভাগ। বিশেষ সাহিত্য-প্রতিভা না থাকিলে ইংরাজীতে কাহাকে অনুবাদে হাত দিতে দেওয়া হয় না। বহু সক্ষম ইংরাজ সাহিত্যিক, যাঁহারা মৌলিক সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেও খ্যাতি অর্জন করিতে পারিতেন তাঁহারা অনুবাদকে সাহিত্যকর্ম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেইজন্য এত কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন যাহার ফলে ইংরাজী সাহিত্য আজ মর্যাদার এই দুর্লভ আসনে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সমস্ত ভাষা, তা সে স্ক্যাণ্ডিনেভীয়ানই হোক, আর চীনাই হোক, তাঁহাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় সেই সব দেশসমূহের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে হইয়াছে। ইহাঁদের এই সাধনার ফল শুধু ইংরাজরাই নয় পরন্তু সমগ্র বিশ্ববাসী ভোগ করিতেছে।

সার্থক অনুবাদের মৌলিক গুণ প্রধানতঃ দুইটি—বিশ্বস্ততা এবং সৌন্দর্য। বিশ্বস্ততা বলিতে মূল রচনার কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংক্ষেপণ না করিয়া নিষ্ঠা সহকারে অনুবাদ করাকেই বুঝায়। সার্থক মৌলিক রচনা বিষয়বস্তুকে ছাড়াইয়া স্বতন্ত্র আবেদন আনিয়া দেয়, অনুবাদে যদি তাহা ধরা পড়ে তবেই সেই অনুবাদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত অনুবাদ বলা চলে। বিশ্বস্ততা ও সৌন্দর্য অনুবাদের এই দুই মৌলিক গুণের একত্র সমাবেশ কদাচিৎ হইয়া থাকে। এইপ্রসঙ্গে অনুবাদ সম্পর্কে বিখ্যাত ফরাসী প্রবাদ বাক্যটি স্মরণীয়—"Translation like women is either beautiful or faithful, rarely both,' এই দুই গুণের সংমিশ্রণ অনুবাদে হইয়াছে এমন একটি সর্বজনপঠিত গ্রন্থ হইতেছে, এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড কৃত ওমর খৈয়ামের রোবাইয়েতের অনুবাদ। অনেক কাব্য-রসিক মনে করেন রস ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া এই অনুবাদ মূলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকৃত শেলীর

কয়েকটি কবিতার অনুবাদ এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকটি বিদেশী কবিতার অনুবাদ সম্পর্কেও এই কথা বলা চলে। অনুবাদক যে ক্ষেত্রে সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী সে ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

অনুবাদ যদি ততটা সৌন্দর্যমণ্ডিত না হয়' তবে যতটা ক্ষোভের কারণ হয় বিশ্বস্ততার অভাব ঘটিলে তাহার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী হয়। অনুবাদে অবিশ্বস্ততার কুফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। যে সকল পাঠকের মূল রচনা পড়িবার সুযোগ হয় না অথচ ইংরাজী মারফতও মূল রচনার অনুবাদ পড়িবার সামর্থ্য নাই তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষায় যে অনুবাদ পড়িবেন তাহা যদি অন্তত বিশ্বস্ত অনুবাদ না হয় (সৌন্দর্যমণ্ডিত নাই বা হইল) তবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তাঁহাদের কি ধারণা হইবে? শিশুকে ভুল অঙ্ক শিখাইবার মতই এটা মারাত্মক নয় কি?

ইংরাজী গ্রন্থ খুলিলেই দেখা যায় কিরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় মূল গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, গোড়াতেই ভূমিকাতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া থাকে। গ্রন্থের উপর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না সংক্ষিপ্ত অনুবাদ তাহাও লেখা থাকে। ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (স্কুলের ছেলেদের জন্যে ছাড়া) একরূপ নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থের মধ্যে কোন প্রকার আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে অথবা এমন কোন শব্দ থাকলে যাহা নাকি ইংরাজীতে অনুবাদ করা যায় না, সেই সকল শব্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ফুটনোটে দেওয়া থাকে। ইংরাজী অনুবাদকরা কি অপরিসীম পরিশ্রম, ধৈর্য, নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না।

সাহিত্যে প্রধানতঃ এই কয়টি কারণে অনুবাদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—(ক) সাহিত্যের শৈশবকালে (খ) কোন সময়ে সাহিত্যে যদি মৌলিক রচনার অভাব হয় (গ) কোন বিশেষ মতবাদ প্রচারের সহায়ক হিসাবে (ঘ) নিজের দেশের সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে নিজের দেশের সাহিত্যকে মিলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন বোধ হইতে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগের বেলায় প্রথম তিনটি কারণ সার্থকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সম্পর্কে সামান্য একটু আলোচনা করিতেছি।

(ক) বাঙ্গলা সাহিত্যর জন্ম লগ্ন নির্ধারণ করিতে হইলে আজ হইতে প্রায় এক হাজার বছর পিছাইয়া যাইতে হইবে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কালকে বাঙ্গলা সাহিত্যের শৈশবকাল বলা যাইতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে ভাষা প্রাকৃতের খোলস ত্যাগ করিয়া স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে যে দুইখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ রহিয়াছে তাহারা হইতেছে অনুবাদ গ্রন্থ। একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, অপরখানি মালাধর বসু-কৃত ভাগবতের অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণবিজয়। এই দুইখানি গ্রন্থই পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত।

(খ) ষোড়শ শতাব্দীকে বাঙ্গলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মে প্লাবিত হইয়া সারা বাঙ্গলাদেশে তখন বৈষ্ণব সাহিত্যের জোয়ার আসিল, জন্ম হইল শুধু বাঙ্গলার নয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি-কাব্যের। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই প্লাবন আর রহিলনা। স্বাভাবিক ধর্মেই আসিল ভাঁটা। মৌলিক রচনার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইল। তখন আরেকবার আসিল অনুবাদের হিড়িক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত কালকে বাঙ্গলা সাহিত্যের বন্ধ্যাকাল বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণব কবিতা ও জীবনী সাহিত্য এবং মঙ্গল কাব্যের একঘেয়েমিতে বাঙ্গালী তখন তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবি গান, শ্যামাসঙ্গীত এবং এবম্প্রকার ভক্তিমূলক সঙ্গীত কোনক্রমে সাহিত্যের আসরকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙ্গলা দেশে বৃটিশ শাসন আস্তে আস্তে কায়েম হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেশ শাসন করিতে গিয়া এদেশের ভাষা শিখিবার প্রয়োজন ইংরাজের দেখা দিল এবং সেই প্রয়োজনবোধ হইতেই বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তন হইল। গদ্যে নানাবিধ গ্রন্থ অনূদিত হইতে আরম্ভ হইল। তন্মধ্যে বাইবেলই প্রধান এবং প্রথম বাঙ্গলা গদ্যে অনূদিত গ্রন্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়া হইতে মাইকেল মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কালকে বাঙ্গলা গদ্যের শৈশবকাল তথা আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভের যুগ বলা যাইতে পারে। ঐ ষাট বৎসর কালের মধ্যে বেশ কয়েকশত গ্রন্থ বাঙ্গলা গদ্যে অনূদিত হইয়াছে। অবশ্য ঐ সময় গদ্যে যথেষ্ট মৌলিক রচনারও সৃষ্টি হইয়াছে তবে অনুবাদই প্রধান স্থান অধিকার করে।

১৮৬০ সাল হইতে ১৮৬৫ সালের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বাঙ্গলা কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যে নূতন ভাব ও ভঙ্গি প্রবর্তিত হওয়ায় বাঙ্গলা সাহিত্যে নবযুগের সঞ্চার হইল। সার্থক মৌলিক রচনা-সম্ভারে বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ফলে অনুবাদ একেবারেই লোপ পাইয়া গেল। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ আশী বছর ধরিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে কখনও মৌলিক রচনার অভাব হয় নাই। ফলে ঐ সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যে কোন অনুবাদ হয় নাই বলিলেই চলে।

(গ) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভকাল হইতেই বিশেষ এক রাজনৈতিক মতবাদ বাঙ্গলাদেশকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। ঐ মতবাদের সমর্থকরা প্রচুর বিদেশী গ্রন্থ বাঙ্গলায় অনুবাদ করেন। তাঁহাদের মতবাদের পরিপূরক হইতে পারে এমন যে কোন গ্রন্থ—তাহা গল্প, উপন্যাস, রাজনৈতিক পুস্তক, রাজনৈতিক বক্তৃতা যাহাই হোক না কেন তাঁহারা নির্বিশেষে অনুবাদ করিতে লাগিলেন। ঐ মতবাদ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন না তুলিয়াও এইকথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারাও বাঙ্গলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বাঙ্গলায় সম্প্রতি যে সকল অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বস্ত অনুবাদ নয়। 'অ্যানা কারেনিনা', 'ওয়ার এণ্ড পিস', 'ব্রাদার কারামাজফ', 'ক্রাইম এণ্ড পানিসমেণ্ট', 'জঁা ক্রিস্তফ', 'লে মিজেরাবল' প্রভৃতি বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাদির উপর অতি বেপরোয়াভাবে কাঁচি চালান হইয়াছে। হাজার বা তাহার চেয়েও অনেক বেশী পৃষ্ঠার এক একখানা বইকে দেড়শ বা দু'শ পৃষ্ঠায় শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সারানুবাদ, মর্মানুবাদ বা সারসঙ্কলন এই ধরণের কথাও যদি লিখিয়া দেওয়া হইত তবুও না হয় কথা ছিল। কিন্তু সোজা অনুবাদ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে মূল গ্রন্থের সঙ্গে অপরিচিত পাঠক স্বভাবতই মনে করেন যে, মূল গ্রন্থখানিই বুঝি এইরকম। অনুবাদও হইয়াছে এমন যাহাতে নাকি মূল গল্পটিও ধরা পড়ে নাই। একেতো আমরা অনুবাদের অনুবাদ করি, অর্থাৎ ফরাসী, রুশ, জার্মাণ প্রভৃতি সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করি, তারপরেও যদি এরূপ পল্লবগ্রাহিতার পরিচয় দেই তবে অনুবাদের উপর লোকের শ্রদ্ধা আসিবে কোথা হইতে?

টলষ্টয়ের মত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের গ্রন্থাদির প্রতিটি ছত্র, প্রতিটি শব্দ যেখানে মুক্তার ন্যায় ভাস্বর সেখানে কাঁচি চালাইবার অধিকার আমাদের অনুবাদকদের কে দিল? অবশ্য অনেক সময় আমাদের পাঠকদের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাধ্য হইয়াই কিছুটা বর্জন করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়াই হাজার পৃষ্ঠার বইকে দেড়শ পৃষ্ঠায় নিয়া আসা হইল অথচ বলা হইল না ইহা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না সার-সঙ্কলন ইহা কখনও বরদাস্ত করা যায় না।

আমাদের সাহিত্যে সাহিত্যিক-সুষমামণ্ডিত সার্থক অনুবাদও কিছু কিছু হইয়াছে। যেমন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের দুইজনের অনূদিত গ্রন্থসমূহকে সার্থক অনুবাদের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালাচারী, ক্যাম্বেল জনসনের গ্রন্থাদির অনুবাদ, সিগনেট প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত ডি. এইচ. লরেন্স, জেমস জীনস্, রেমার্ক, জিম করবেটের গ্রন্থাদির অনুবাদ, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পিরানদেল্লোর গল্প, অচিন্ত্যকুমার সেনের আধুনিক সোভিয়েট গল্পের অনুবাদকে সার্থক অনুবাদের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে।

আজকাল অনুবাদের হিড়িকে দেখা যাইতেছে কপিরাইটবিহীন একই পুস্তক তিনচারজন অনুবাদক একই সঙ্গে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ পুস্তক মোটামুটি বিক্রী হয় বলিয়া প্রকাশকরাও কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া তাহা ছাপিয়া যাইতেছেন। ইহাতে এক দিকে যেমন আমাদের সাহিত্যে মৌলিক রচনার প্রকাশ ক্রমশঃই ক্ষীণতর হইতেছে অন্যদিকে তেমনই পাঠকরাও বঞ্চিত হইতেছেন। বঞ্চিত হইতেছেন বলিতেছি এইজন্যে যে, অনুবাদকরা একই গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

আমাদের পাঠকদের বিদেশী সাহিত্যের প্রতি যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে তাহা যেন বাণিজ্যিক বুদ্ধির মারপ্যাঁচে নষ্ট করিয়া দেওয়া না হয়। বিশ্বস্ত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হইলে শুধু যে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা নয় মৌলিক রচনার ব্যাপারে আমাদের সাহিত্যিকরা আরও সতর্কতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। নিজের দেশের সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যকে মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হইতে জন্ম নিবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের।

প্রকাশভঙ্গি, বাণীভঙ্গি বা সাহিত্যে রীতি

প্রকাশের মধ্যেই সাহিত্যের প্রাণবস্তুটি নিহিত রহিয়াছে। অন্তরের যে গভীর প্রেরণায় সাহিত্যিক নিজেকে প্রকাশ করেন, তাহাকে লইয়াই সাহিত্য। কিন্তু কি ভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করিবেন? সাহিত্যিকের মন, বস্তুজগৎ এবং প্রকাশকৌশল এই তিন বস্তুর মিলনে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সাহিত্যিক বহির্বিশ্বের বস্তুরাশিকে আপন মনের মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্মতৃপ্তি, আত্মবিস্তার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা—সাহিত্যিক এই তিন তাগিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকাশ করিলেই তো আর সাহিত্য হইল না। কি করিয়া প্রকাশ করিলে তাহা সহৃদয়জনের হৃদয়গ্রাহ্য হইবে তাহাই প্রধান কথা। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের আদিগুরু ভরত মুনির মতবাদটি আহরণ যোগ্য। তিনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

যথা বীজাদ্ ভবেদ্‌বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ ॥

বৃক্ষ যেমন বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, ফুল-ফলের উদ্ভব যেমন বৃক্ষ হইতে হয় তেমনই কাব্যের উৎপত্তি হয় রসবীজ হইতে। আর কাব্যের ফুল-ফল অর্থাৎ ভাব, অলঙ্কার প্রভৃতি এই রসেরই স্ফূর্তি। 'সাহিত্য-দর্পণ'-কার আচার্য বিশ্বনাথও বলিয়াছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। অর্থাৎ রসাশ্রিত বাক্যই কাব্য। কিন্তু বাক্যকে কি করিয়া রসাশ্রিত করা যাইবে?

কাব্যে ও নাট্যে যে রস পাঠক ও দর্শক অনুভব করে তাহার সহিত বাহ্য ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলি স্থায়িভাব (রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম—অর্থাৎ কামের ভাব, হাসির ভাব, দুঃখের ভাব, রাগের ভাব, ইত্যাদি) বা instinctive dominant emotion প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাব্য বা নাট্যের দ্বারা যে বিশেষ একটি চেতনোদ্ভব বা aesthetic attitude ঘটে, তাহারই অনুপ্রেরণায়

আমাদের অন্তরস্থ কোন স্থায়িভাব যখন উদ্রিক্ত হয় তখন আমরা যে রসসম্ভোগ করি তাহা বাহ্য বস্তুর সহিত জড়িত নহে এবং পরাপেক্ষী নহে।—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অর্থাৎ,

রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদ-রূপ একটি ব্যাপার। প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়। কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে "সকল সহৃদয় হৃদয় সংবাদী" অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন।

—অতুল গুপ্ত

ক্রৌঞ্চের বেদনায় বাল্মীকির হৃদয়ে যে করুণার বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার মূলে—

একথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হত, তবে ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হত না। কারণ, কেবল দুঃখ-সন্তপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।......সহচরী-বিয়োগ--কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন নিজের চিত্ত-বৃত্তির আস্বাদন স্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তির নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে।—অতুল গুপ্ত।

Our sweetest songs are those
That tell of our saddest thought—Shelley.

কিন্তু এখানে our মানে বিশ্বমানবের।—

দুঃখের অভিজ্ঞতায় আমাদের চেতনা আলোড়িত হয়ে ওঠে। দুঃখের কটুস্বাদে দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকলেও তা উপাদেয়। দুঃখের অনুভূতি সহজ আরামবোধের চেয়ে প্রবলতর। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামচন্দ্রের নির্বাসন, মন্থরার উল্লাস, দশরথের মৃত্যু, এর মধ্যে ভালো কিছু নেই। সহজ ভাষায় যাকে আমরা সুন্দর বলি

এ ঘটনা তার সমশ্রেণীর নয় একথা মানতেই হবে। তবু এই
ঘটনা নিয়ে কত কাব্য নাটক ছবি গান পাঁচালি বহুকাল থেকে
চলে আসছে, ভিড় জমেছে কত, আনন্দ পাচ্ছে সবাই। এতেই আছে
বেগবান অভিজ্ঞতায় ব্যক্তিপুরুষের প্রবল আত্মানুভূতি—রবীন্দ্রনাথ

শুধু করুণ ভাবই নয়, মনের অন্যান্য স্থায়ী ভাবগুলিকেও যখন কবি তাঁহার প্রতিভার বলে সহৃদয় মনে সঞ্চারিত করিয়া দেন তখনই তাহা রসে পরিণত হয় এবং তাহাই সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতম উপায়। " 'সহিত' শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে-ভাবে, ভাষায়-ভাষায়, গ্রন্থে-গ্রন্থে মিলন, তাহা নহে। মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অন্তরঙ্গ যোগ সাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে"—রবীন্দ্রনাথ।

এই 'অন্তরঙ্গ যোগ-সাধন' তখনই সম্ভব যখন সাহিত্যিক ও পাঠকের হৃদয় এক অনির্বচনীয় রসস্রোত দ্বারা সংযুক্ত হয়।

অপর একজন সংস্কৃত আলঙ্কারিক (আচার্য ভামহ) বলিয়াছেন, 'শব্দার্থৌ-সহিতৌ কাব্যম'—অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সার্থক মিলনের ফলেই কাব্য সৃষ্টি হয় তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইহার বিশদ আলোচনা করেন নাই। সেই কাজ করিয়াছেন তাঁহার পরবর্তী আলঙ্কারিক কুন্তক। কুন্তকের মতে এই জগতের সৃষ্টিলীলা বুঝিতে হইলে শুধু দার্শনিকসুলভ তত্ত্বালোচনা করিলে চলিবে না। সৃষ্টির অন্তরালে একটি সত্তা আছে। তিনি সৃষ্টির অর্থাৎ রূপের মধ্য দিয়া নিয়ত প্রকাশমান। তাঁহাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ভাবের একটি তাত্ত্বিক রূপ আবিষ্কার করিবার চেষ্টার কোন সার্থকতা নাই। অথচ দেখা যায় সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ ত্রিভুবনের ভাব সকলকে শুধু তত্ত্বরূপে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ ভাব যে-রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে এবং যাহার সহিত সে আত্মিকযোগে যুক্ত হইয়া আছে তাহাকে বাদ দিয়া ভাবকে তত্ত্বরূপে বিবেচনার চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টারই নামান্তর। রক্তজবার সকল রূপকে বাদ দিয়া যদি তাহাকে রক্ত মাত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয় তবে, কি তাহার রূপের পরিচয় আমরা পাইব? রক্তজবাকে দেখিবামাত্র আমাদের মনে যে ভাবটি জাগ্রত হইয়া উঠে তাহাকে শুধুমাত্র রক্তরূপে দেখিলে কি তাহার সম্যক প্রকাশ হয়। কুন্তক ভাবকে বলিয়াছেন অর্থ এবং রূপকে বলিয়াছেন

শব্দ। বীজের ভিতরে বৃক্ষের প্রকাশ যেমন সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে তেমনই অর্থ ও শব্দও আমাদের চিৎশক্তির ভিতরে লীন হইয়া রহিয়াছে। এই চিৎশক্তিই নিজেকে অর্থ ও শব্দের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ করে। যে শক্তি নিজেকে বুদ্ধিবৃত্তির ভিতরে অর্থরূপে প্রকাশিত করে তাহারই বহিঃ-প্রকাশ হয় শব্দে। এই কথা ভুলিয়া যাঁহারা শুধু তত্ত্বরূপে ভাবসমূহকে প্রকাশ করেন তাঁহাদের কাছে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্য ধরা পড়ে না। ভাবের সহিত রূপকে এক করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে কোন দিন তাহা পড়িবেও না। একমাত্র সাহিত্যেই তা সম্ভব। ভাব সর্বদা প্রকাশাশ্রয়ী, রূপকে আশ্রয় করিয়া সে প্রকাশিত হইতে চায়। কাজেই ভাবরূপী অর্থের সহিত রূপরূপী শব্দের মিলনেই সৃষ্টির অন্তর্নিহিত বাণী বা সত্য ধরা পড়ে এবং তখনই হয় সার্থক সাহিত্য। যে শব্দ এবং অর্থের দ্বারা কাব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হয় তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের মিলনেই সৎসাহিত্য গড়িয়া উঠে না। তাহা হইলে কোন্ বৈশিষ্ট্যে এই শব্দ ও অর্থের মিলনে রসের উজ্জীবন হয়? যে অর্থ একটি স্পন্দনের দ্বারা রসগ্রাহী চিত্তে এক অলৌকিক আনন্দানুভূতির জন্ম দেয় তাহাই সাহিত্য। কিন্তু তাহাই বা কি ভাবে সম্ভব? জগতের প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই একটি রসমূর্তি রহিয়াছে কিন্তু তাহা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে বস্তুর স্বধর্মের সহিত। সাধারণ লোকের কাছে বস্তুর স্বধর্মটিই স্পষ্ট হইয়া উঠে কিন্তু শিল্পীর চক্ষে ধরা পড়ে বস্তুর ঐ রসমূর্তিটি অর্থাৎ রসমূর্তির অর্থটি। কাব্যের ক্ষেত্রে জগৎ বা জীবনের কোন বিশেষ পদার্থ বা ঘটনার যে একটি রসময় বিশিষ্ট প্রকাশ তাহাই তাহার অর্থ।

কাব্যের ভিতরে অর্থেরও যেমন ঐরূপ একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে শব্দেরও তেমনি একটি বিশিষ্টতা রহিয়াছে। কাব্যের ভিতরকার এই শব্দ বা বাচকের লক্ষণ কি? কুন্তক বলিয়াছেন, 'কবিবিবক্ষিত-বিশেষাভিধা নক্ষমত্বমেব বাচকত্বলক্ষণম্'। পদার্থ সমূহের যে রসময় বিশেষ অর্থটি কবির অন্তরে একটি বিশেষ ক্ষণে ধরা পড়ে তাহা একটি আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়া কবির মনে একটি বিশেষ বাণীরূপ গ্রহণ করে; রসানুভূতি হইতে লব্ধ কবিহৃদয়ের এই বিশেষ বাণী যাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে তাহাই কাব্যের ভিতরে শব্দ বা বাচক। প্রত্যেক কাব্য সৃষ্টির পিছনেই তাই থাকে কবিহৃদয়ের

একটি বিশেষ বাণী ; তথাকথিত বাস্তববাদী রচনার ক্ষেত্রেও এ সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। কোন পদার্থই তাহার যথাস্থিত স্বধর্মে কখনও কাব্যের সামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না ; সে তাহার 'স্পন্দন সুন্দর'-রূপে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়াই কবিহৃদয়ের একটি বাণীমূর্তি লাভ করে। প্রতিভাবান্ ব্যক্তি যখন কোনও পদার্থ অবলোকন করেন তখন তাহা তৎকালোচিত একটি বিশেষ পরিস্পন্দনের দ্বারা পরিস্ফুরন্ত রূপেই আত্মপ্রকাশ করে ; এই বিশেষ পরিস্পন্দনের দ্বারা তাহার স্বভাব যখন সমাচ্ছাদিত হইয়া উঠে তখনই একটি রসময়ী বাণীরূপে তাহা কবির চিত্তে অবতরণ করে ; কবিচিত্তের এই রসময়ী বিশেষ বাণী যখন আবার সেই জাতীয় বাণীকে সুষ্ঠুরূপে এবং অতি সুকুমাররূপে প্রকাশ করিতে পারে এমন শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় তখনই তাহা যথার্থ সাহিত্য হয় এবং তখনই তাহা আমাদের একটা অলৌকিক চেতনচমৎকারিতার কারণ হয়।—ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

সাহিত্যের নির্মাণ কৌশলের, অর্থাৎ প্রকাশ ভঙ্গির বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা হইয়াছে। কারণ প্রকাশ ভঙ্গিমার মধ্যেই সাহিত্যের প্রাণধর্মটি বৃন্তহীন পুষ্পের ন্যায় আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে। পদ্যকে যেমন ছন্দ ও অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হয়, গদ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও দেখি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের রচনাশৈলী ও বাণীভঙ্গির পার্থক্য, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের প্রকাশ ভঙ্গিমার বিভিন্নতা যেমন মুহূর্তেই আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠে, ঠিক তেমনই শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনার প্রভেদটি বুঝিতে আমাদের অতি সামান্যই বিলম্ব ঘটে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বৈলক্ষণ সূচিত হয় সাহিত্যে তাহারই নাম রীতি, এই রীতির দ্বারাই লেখককে আমরা চিনিতে পারি। 'Style is the man' এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কুন্তকাচার্য এই রীতি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। আচার্য বামন বলিয়াছেন—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' অর্থাৎ রীতিই কাব্যের আত্মা। এই রীতির বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা।' —অর্থাৎ 'বিশিষ্ট ভঙ্গিই রীতি, রসসৃষ্টিকারী অন্যান্য গুণ ইহার সহিত একাত্ম।' বামন বাক্যে অবয়ব সংস্থানের অর্থাৎ পদবিন্যাসের প্রণালীর মধ্যে কবির

প্রকাশধর্মের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তিনি বিদর্ভ, গৌড় বা পাঞ্চাল প্রভৃতি বিশেষ অঞ্চলের রীতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহাতে 'রীতি'-র ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। 'বক্রোক্তি-জীবিত'-কার আচার্য কুন্তক এই রীতিবাদকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শুধুমাত্র অবয়ব সংস্থানের মধ্যে রীতির পরিচয় নিহিত নয়। ইহা কবির সহজাত সংস্কার, অর্জিত জ্ঞান। ইহাকেই কবির স্বভাব আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই রীতি কবির স্বধর্মকে ফুটাইয়া তোলে। কারণ রীতিই হইতেছে কাব্যের প্রাণ স্পন্দন (= জীবিত)।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, নীরব কবিত্ব বা আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস—সাহিত্যে ইহাদের কোনটিরই স্থান নাই। তিনি বলেন,—

> ভাব মনুষ্য সাধারণের, কিন্তু তাহাকে বিশেষ মূর্তিতে সর্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় রচনাই লেখকের কীর্তি।

এই রচনারীতি বা style তখনই সার্থক হয়, যখন লেখক পাঠকের মনে বিষয়ানুরূপ ভাব সঞ্চার করিয়া দিতে সক্ষম হন। বিখ্যাত ইংরাজ প্রবন্ধকার লুকাসের মতে,

> Style is a means by which a human being gains contact with others ; it is personality clothed in words, character embodied in speech.

এই স্টাইল সম্পূর্ণ ভাবে লেখকের বিশেষ মানসিক গঠন প্রণালীর উপর নির্ভর করে। ইহা হয়ত কতকগুলি শব্দসমষ্টির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় কিন্তু যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি লেখককে ঐ সকল শব্দ চয়ন করিতে প্রেরণা দেয়, তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। সুবিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক হাডসন তাই বলিয়াছেন :—

> Style is fundamentally a personal quality—all the factors which combine in the making of a man will subtly play their parts in giving to his style its well-defined individuality of form and colour. All the phases of his outer and inner experience will register themselves in it.

বহির্জগতের বিভিন্ন ঘটনা আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রত্যেক লোকের মনে, তাহারা ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। এই ভাব প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। লেখকদের বেলাতেও এই একই কথা প্রযোজ্য। লেখকের রচনা তখনই সার্থকতা লাভ করে, যখন তিনি দৃষ্ট বস্তু তাঁহার মনে যে ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছে, পাঠকের মনেও অনুরূপ ভাব জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হন। শব্দ অর্থ উপমা রূপক প্রতীক ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতির প্রয়োগ এই ভাবপ্রকাশের কাজকে সুঠাম করে কিন্তু বিশিষ্ট পদরচনারীতি রসসৃষ্টি করিতে সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। এই রীতির মধ্য দিয়াই লেখকের ব্যক্তিসত্তার স্পন্দন অনুভূত হয়। কাজেই কাব্যের প্রাণ এই রীতির উপর নির্ভরশীল ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একই রকম ভাষা ও অলঙ্কার প্রযোজ্য হইয়াও বিশিষ্ট রীতির গুণে সাহিত্যের আবেদন বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

সমাজ, জীবন ও সাহিত্য

জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো একদা বলিয়াছিলেন 'Art is imitation of life' শিল্প জীবনেরই অনুকৃতি। এই সাহিত্য বা শিল্প জীবনের হুবহু অনুকৃতি কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও, জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক যে অঙ্গাঙ্গী এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধতা নাই। সাহিত্য জীবনেরই রসশিল্প। জীবনকে বাদ দিয়া আর যাহারই অস্তিত্ব থাকুক না কেন, সৎ সাহিত্যের যে কোনরূপ অস্তিত্ব নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য।

আর মানুষের এই জীবনও সমাজ নিরপেক্ষ নহে। রাষ্ট্রনীতি মানুষকে আখ্যা দিয়াছে মানুষ সামাজিক প্রাণী। দল বাঁধিয়া বাস করার প্রবৃত্তি তাহার আদি ও অকৃত্রিম। সৃষ্টির আদিযুগ হইতেই মানুষ তাহার দলবদ্ধ যৌথ জীবনকে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। সভ্যতার যত ক্রমবিবর্তন হইয়াছে, মানুষের এই দলবদ্ধ জীবন ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল সমাজ জীবনে। সমষ্টির উন্নতির জন্য ব্যষ্টিগত, সকল স্বার্থই মানুষ সমর্পণ করিয়াছে সমাজ দেবতার চরণে। সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্যই সমাজের শুভাশুভের

কষ্টিপাথরে মানুষের সকল সাহিত্য, শিল্প ও দর্শনের মূল্য বিচার করা হইয়াছে। তাই সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জীবন ও সমাজকে লইয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের চারিপাশের পরিচিত সামাজিক গণ্ডীটার মাঝে যে মানুষগুলি কলকোলাহলে দিকদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, যাহাদের সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসির দোলায় জীবনস্রোত শত তরঙ্গভঙ্গে নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সাহিত্য তাহাকেই প্রকাশ করিয়াছে নব নব রূপে। রস ও কাব্যের জগৎ যে, অলৌকিক মায়ার জগৎ একথা সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক জগৎ বস্তুজীবনকে বাদ দিয়া গড়িয়া উঠে নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও সমাজ জীবন হইতে কবি তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাহাতে 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই সাহিত্যকে যুগ যুগ ধরিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে সমাজের 'দর্পণ'। সাহিত্যকার গর্বের সহিত বলিতে পারেন—

"যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।"

আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারত হইতে সুরু করিয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের হোমার দান্তে মিলটন সকলের সাহিত্যেই তাঁহাদের সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার বাণীটি মূর্ত হইয়াছে।

কিন্তু সাহিত্যে সর্বজনীনতাই হইল তাহার বড় কথা। দেশে দেশে কালে কালে সমাজ ও জীবন ধারায় কত প্রভেদ। রামায়ণ মহাভারতের যুগে যেরূপ সমাজ ছিল, আজ আর সেরূপ সমাজ নাই। আবার ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সহিত আমাদের জীবনাদর্শের কত পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্য, এই আপাত-বিরোধের অন্তরালেও সকল কালের সকল শ্রেণীর সৎ সাহিত্যের মধ্যে এক আপাত সাযুজ্য বর্তমান। সাহিত্যের বিষয় অনন্ত মানব হৃদয় ও মানবের চরিত্র।

মানুষের বহিরঙ্গ প্রবৃত্তি, তাহার আচার ব্যবহার দেশ কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তাহার হৃদয় সে তো সকল মানবেরই এক। এখানে ব্যক্তিমানব বিশ্বমানবের পর্যায়ে উত্তীর্ণ। তাই দেখি মেঘদূত পড়িয়া ভারতবাসী যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছে, ঠিক সেইরূপ আনন্দই লাভ করিয়াছে ইউরোপীয় পাঠক। ইহাই সাহিত্যের সর্বজনীনতা। একটি বিশেষ সমাজের পটভূমিকায় কতগুলি বিশেষ জীবনকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা যদি রসোত্তীর্ণ হয় তবে তাহার আবেদন সর্বজনীন হইতে বাধ্য। পরিচিত

জগৎ ও জীবনকে ছাড়াইয়া সাহিত্য সুদূর মায়া রাজ্যের সন্ধান আনিয়া দেয়। সীমা, অসীমের মাঝে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। বিশেষ মুহূর্ত, বিশেষ কাল, বিশেষ সামাজিক গণ্ডিকে ছাড়াইয়া সৎ সাহিত্যের মাঝে সকল কালের সকল যুগের চিরন্তন মানব হৃদয়ের কাহিনী প্রতিভাত হইয়া উঠে। যে অন্ধ বিশ্বাস সেনাপতি ওথেলোকে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ডেসডিমোনাকে পরিণামে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে, তাহাতে আমাদের অন্তরাত্মা হাহাকার করিয়া উঠে কেন? কারণ ওথেলোর এই অমূলক অসূয়ার মধ্যে আমরা সর্বমানবের হৃদয়ের একটি দিককে প্রতিফলিত হইতে দেখি। তাই ডসডিমোনার জন্য আমরা যেমন অশ্রু বিসর্জন করি, তেমনই ওথেলোর অস্থিরচিত্ততা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিয়া পারেনা। অ্যানা কারেনিনা তাঁহার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছিল কিন্তু যে হৃদয় বৃত্তির সংঘাত তাহাকে পাপের পথে টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা বিশ্বমানবের হৃদয় বৃত্তিরই একটি দিক মাত্র। ঋষি টলস্টয় যে স্নেহময় দৃষ্টি এবং বুকভরা সহানুভূতি দিয়া এই হতভাগিনী নারীকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাষাণ কঠিন হৃদয়কেও স্পর্শ করে তাই অ্যানা যখন আত্মহত্যা করে তখন আমাদের সমস্ত হৃদয় গুমরাইয়া কাঁদিয়া উঠে। এই ভাবে আমরা যুগে যুগে দেখিতে পাই, তাহাই সার্থক সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে যাহা মানব জীবনের শাশ্বত অনুভূতিগুলিকে রূপায়িত করিতে পারিয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজের কোনঃ সঙ্কীর্ণ দিক রূপায়িত হইলেও যদি তাহা মানবজীবনের কোন চিরন্তন বৃত্তিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে তবে তাহা সার্থক সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। ইংরাজ সাহিত্যিক টমাস হার্ডিকে Regional সাহিত্যিক বলা হইয়া থাকে। আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে রাঢ়ভূমির একটি দিকের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তবুও এই দুই দিকপাল সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইঁহাদের সাহিত্যিক পটভূমি সঙ্কীর্ণ হইলেও দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ নয়। উদার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত তাঁহাদের রচিত চরিত্রগুলিকে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের পরিচিত ও পরমাত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে।

বস্তুতঃ এই সমাজ ও জীবনকে লইয়াই সাহিত্যের কারবার। তবে বলাই বাহুল্য, এই সমাজের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপার সাহিত্যে রূপায়িত হইবে না। তবে একদিকে যেমন সাহিত্যিক নিজের বিশেষ অনুভূতির দ্বারা এই সমাজ ও

জীবনকে আপনার করিয়া লইয়া 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' বলে সাধারণের করিয়া দিবেন, অপরদিকে এই সমাজের চিত্রও তাঁহার রচনায় যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত হওয়া চাই। একথা সত্য যে মহৎ সাহিত্য দেশ ও কালের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সর্বমানবের আকাঙ্ক্ষিত ধনে পরিণত হয় কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজও শাশ্বত হইয়া উঠে। টলষ্টয়ের রচিত সাহিত্য যে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ একথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু রাশিয়ার কৃষক ও ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং তাহাদের সমাজ তাঁহার সাহিত্যে আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত হইয়াছে। ঠিক তেমনই দেখিতে পাই শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের সাহিত্যে বাঙ্গালী সমাজ ও জীবন ফটোগ্রাফ সুলভ নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে কিন্তু তবুও তাহাদের সর্বজনীন আবেদনটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই। পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের লোক তাহাদের আপন আপন হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক, বিভিন্ন প্রকার সমাজ পদ্ধতি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে বাস করে। কিন্তু তবুও হৃদয়বৃত্তি ও অনুভূতির দিক দিয়া তাহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। সেইজন্যই দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রীতি বাঙ্গালী বা ভারতবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, তাঁহার উদার কল্পনায় সমগ্র বিশ্বমানব এক সূত্রে গাঁথা পড়িয়াছে। তেমনই পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী লইয়াও সমগ্র মানবজাতি এক আশ্চর্য প্রেম-মহিমায় উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই 'পথের পাঁচালী'র অপু তাহার চরম দারিদ্র্যপূর্ণ পরিবেশ লইয়াও ধনাঢ্য আমেরিকাবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছে। গোর্কির 'মা', পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' সম্পূর্ণ বিদেশী সমাজ ও জীবনের পটভূমিকায় রচিত হইলেও তাহা ক্ষণকালের মধ্যেই বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়কে জয় না করিয়া পারে না।

কিন্তু সমাজের সহিত সাহিত্যের যে সম্পর্ক তাহার সীমারেখা সতর্কতার সহিত নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে সমাজের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক যেন হরপার্বতীর ন্যায়। সমাজকে বাদ দিয়া যেমন সাহিত্য রচিত হইতে পারেনা তেমনই সাহিত্যের রসধর্মকে চাপা দিয়া উহার মধ্যে কেবল সমাজকে প্রধান করিয়া তুলিলে তাহা প্রচারধর্মী সাহিত্যে পরিণত হয়। বস্তুর রসরূপ অপেক্ষা তাহার বহিরঙ্গটাই তখন সাহিত্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠে। সাহিত্যকার তখন স্রষ্টা না হইয়া প্রত্যক্ষ সমাজনেতার আসন গ্রহণ করেন।

অবশ্য সমাজকে প্রভাবিত করিবার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ভূমিকা অসামান্য। গোর্কির 'মাদার' রাশিয়ার নিপীড়িত সমাজ জীবনে এক সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের সুখ স্বপ্নে সকলকে উজ্জীবিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' শুধু পরাধীন ভারতবর্ষের উৎপীড়িত সমাজ জীবনের কেন্দ্র বিন্দুটিকেই প্রতিভাত করে নাই, তাহা এক নূতনতর বলিষ্ঠ জীবনের দিকে পাঠককে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। তাই আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র সহস্র সহস্র স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হৃদয়ের মর্মমূলে অমোঘ প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে, 'পথের দাবী' বিপ্লবের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়াছে।

শুধু ইহাই নহে, যুগ যুগ ধরিয়া জনশিক্ষার বাহন হিসাবেও সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। একথা সত্য যে কোন কিছু 'শিক্ষা' দানকে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিলে সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু সকল সৎ সাহিত্যেরই একটি অপ্রত্যক্ষ suggestive ক্ষমতা আছে। বিশেষ করিয়া লোকসাহিত্যগুলি যুগ যুগান্ত ধরিয়া অনাবিল আনন্দদানের মধ্য দিয়া সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। জারিগান, সারিগান, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির মাঝেও আমরা দেখিতে পাইব, সাহিত্য কি ভাবে জীবনকে আশ্রয় করিয়া সমাজকে লোক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

সাহিত্যের মধ্য দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া জীবনের সহিত জীবনের গভীর সংযোগ গড়িয়া উঠিয়াছে। কালে কালে, বস্তুতে বস্তুতে, দেশে দেশে, কত প্রভেদ, কিন্তু যে অনন্ত মানব জীবন লইয়া সাহিত্যের কারবার তাহা যুগান্তরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নিত্য অমরত্ব লাভ করিয়া আসিতেছে। এই অনন্ত জীবনের সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক আছে বলিয়াই তাহা নিত্য নব এবং চিরন্তন।

সাহিত্য ও যুগধর্ম

সাহিত্যের সামগ্রী এই বস্তুজগৎ ও মানুষের মন। বস্তুজগৎ শিল্পীর মনে যে রূপে ফুটিয়া উঠে, যে অনুভূতি জাগায় সাহিত্যিক তাহাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রেরণাতে যে সৃষ্টি করেন তাহাই সাহিত্য। সাহিত্যিক বস্তুজগৎ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া তাহাকে

এক ভিন্নতর রূপে কিন্তু সর্বজনবেদ্যরূপে প্রকাশ করেন। এই বস্তুজগৎ সাহিত্যিকের সীমার মধ্যের যে জগৎ তাহাই—অর্থাৎ সাহিত্যিক যে সমাজে বাস করেন, যে যুগের মানুষ তিনি তাহারই প্রতিফলন তাঁহার রচনায় হয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ এই পৃথিবী হইতে রূপরস আহরণ করে। কিন্তু মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে একক হইতে পারে না। তাই তাহার দেখার পিছনে বসিয়া তাহার যুগ অলক্ষ্যে কাজ করিয়া চলে। কারণ কবি বা সাহিত্যিক যে সমাজের আওতায় বাড়িয়া উঠেন তাহার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, তাহার সংস্কার সমস্তই তাঁহার মনে ছায়াপাত করে। কাজেই মানুষের মন যুগের প্রভাব এড়াইতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম হয় না। তাহা হইলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয় যে সাহিত্য চিরন্তন হয় কি করিয়া? এক যুগের সহিত অপর যুগের যে পার্থক্য তাহা অতিক্রম করিয়াও পাঠকের মন আনন্দ রস আহরণ করে কি প্রকারে? আদিম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সভ্যতার অগ্রগতির যে ইতিহাস তাহার মধ্যে এক চিরন্তন মানবিক সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। এই যে চিরন্তন সুর তাহাই সাহিত্যকে যুগের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। তাহা হইলে সাহিত্যিক কেবলমাত্র তো সেই কয়টি স্থায়ীভাব লইয়াই তাহার শিল্পকৃতির-পরিধি টানিতে পারেন। কিন্তু শিল্পী বা সাহিত্যিক যুগকে এড়াইয়া তাহাও করিতে পারেন না। কারণ মানুষ সামাজিক প্রাণী। কাজেই যে সমাজে, যে বিশেষ যুগে শিল্পী বা সাহিত্যিক বাস করেন তাহার প্রহরা এড়াইয়া তিনি কেবলমাত্র কল্পলোকে উধাও হইতে পারেন না। ব্যক্তিকোটি হইতে মুক্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক রূপে সর্বজনীন আবেদন সঞ্চার না করিলে সাহিত্য সাহিত্য হিসাবে চিরস্থায়ী মূল্য লাভ করিতে পারে না। তাহা কাল্পনিকতায় পর্যবসিত হয়।

বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়। সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে সাহিত্যিকের মনে স্বভাবতই সেই সমস্যাগুলির আলোড়নের ফলে বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সাহিত্যিক তাহারও রূপদান করেন। কিন্তু যে শক্তিশালী সাহিত্যিকের মন বিশেষ কালের বন্ধন হইতে মুক্ত তাহাকে উদার বিশ্বে কালজয়ী মূর্তিতে প্রকাশিত করিতে না পারে তিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক নহেন। মহাকাব্যগুলি বিশেষ যুগের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও আজও তাহা পৃথিবীর মানুষকে আনন্দ দিতেছে তাহার কারণ কি? যদি মহাকাব্যগুলির ভিতর আমরা সেইযুগের

ছায়া না দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে তাহা আমাদের এতদূর তৃপ্তি দিতে পারিত কিনা সন্দেহ। অনেকে যুগের কলকোলাহল হইতে দূরে গিয়া অতীত যুগের কাহিনীকে সাহিত্যে রূপায়িত করেন। কিন্তু তাঁহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে কি যুগের প্রহরা সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারেন? তাঁহারা হয়ত বর্তমানকে এড়াইলেন কিন্তু রচনায় যদি অতীত যুগকে তাহার সম্পূর্ণতা লইয়া ফুটাইয়া তুলিতে না পারেন তাহা হইলে তাহা আমাদের মনে কোনই আনন্দের সঞ্চার করিতে পারিবে কি? মাইকেল যখন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে মানবিকতার জয় ঘোষণা করিলেন তখন তিনি কিন্তু সেই মহাকাব্যের যুগ হইতে বাহিরে আসিয়া তাহা ঘোষণা করেন নাই, ভিতর হইতেই করিয়াছিলেন। অনেক সাহিত্যিক যুগধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া আপন মনের অনুভূতিকেই রূপদানের চেষ্টা করেন। ভবভূতির মত তাঁহারাও মনে করেন যে বর্তমানে তাঁহাদের সৃষ্টির যোগ্যমূল্য পাঠক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও উত্তর কালে হয়ত তাহাদের অনুভূতি মূল্য পাইবে। কিন্তু সাহিত্য তথা মানবের অনুভূতি বাঁচিয়া থাকে মানুষের মানসপটেই। কাজেই যুগের সহিত যদি কোন মিলই না থাকে তবে সেই সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বাঙ্গলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ অথবা জীবনানন্দ দাশ যুগের কলকোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আত্মগত ভাবে সাহিত্য রচনাতে কাল কাটাইয়াছেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে যুগের যে হতাশা তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বর্তমান যুগের এক দিশাহারা মনেরই রূপায়ণ করিয়াছেন, যুগ হইতে তাঁহারা দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন নাই। যুগ আপনার ছায়া তাঁহাদের রচনায় ফেলিয়াছে।

তাহা হইলে যুগোত্তীর্ণ রচনা আমরা কাহাকে বলিব এবং যুগের রচনাই বা কাহাকে বলিব? যে রচনা কেবলমাত্র সাময়িক ঘটনা লইয়াই রচিত হয় এবং নির্দিষ্ট কালের পরে তাহার আর কোন আবেদনই মানুষের মনে সাড়া জাগাইতে পারে না তাহা কেবলমাত্র যুগের প্রয়োজনের তাগিদে রচনা মাত্র। তাহা কখনই সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব' তাই সাহিত্য পদবাচ্য হইতে কোনদিনই পারিল না। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে রচিত হয় নাই যদিও গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রচুর লেখা হইয়াছে। তাহার কারণ আর কিছুই নয়

সেই যুগের যে সমস্যা তাহা দুর্ভিক্ষ হইতে আরও বিরাট আরও ব্যাপক—তাহা আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষের সমস্যা। তাহা হইতেছে যুদ্ধের ফলে মানুষের মনে ভবিষ্যতের সম্পর্কে হতাশা এবং এক নিঃসীম অসহায়তা বোধ। এই সত্যটি উপলব্ধি না করিয়া শুধুমাত্র দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে ফুটাইয়া তুলিবার ফলে দুর্ভিক্ষের অবসানের সহিত সেই রচনার আবেদনও অন্তর্হিত হইয়াছে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সুদীর্ঘ একশত বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাহা প্রাণ পাইয়াছে। ফরাসী বিপ্লবের দীর্ঘকাল পরে Dickens এর হাতে তাহা সাহিত্যরূপ পাইয়াছে। তাহা হইলে বর্তমানের যে ঘটনা তাহাই কেবলমাত্র যুগের ঘটনা নয়। আলোড়ন শান্ত হইয়া আসিলে যখন তাহার সমস্ত রূপ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে তখনই সম্ভব হয় তাহা লইয়া সাহিত্য রচনা করা। কারণ ঘটনা কালে লেখক নিজে প্রভাবিত না হইয়া নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সমস্ত কিছুকে দেখিয়া তাহাকে রূপায়িত করিতে পারেন না। যদি পারেন তাহা হইলে তাহা সাহিত্য হইতে পারে। 'নীলদর্পণ' নাটকের নাট্যকার নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। তাঁহার শিল্পীমনের সমস্ত আবেগ দিয়া তিনি প্রতিটি চরিত্রকে যথাযথ রূপদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা আজও পাঠকের মনে আনন্দের তরঙ্গলহরী জাগাইতে সক্ষম। যে সাহিত্য আপন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মানবের এবং বিশ্বজগতের চিরন্তন সুরকে বিধৃত করিয়া তাহাকে মূর্ত করিয়া তোলে তাহাই সাহিত্য। সে যুগের প্রহরা এড়াইয়া যাইতে চায় না, কিন্তু যুগের বেষ্টন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সুদূরের দিকে, অনাগতের দিকে আপন ইশারা মেলিয়া রাখে।

সাহিত্য ও প্রচার

সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হওয়া উচিত কি না এই লইয়া সমালোচক মহলে বাদানুবাদের আজ আর অন্ত নাই। অনেক সমালোচকের মতে সাহিত্যের কাজ মানুষের মনে আনন্দের সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব জীবনে বহু দুঃখ সংঘাত, ব্যথা বেদনায় মানুষ প্রতিনিয়তই জর্জরিত হয়। এই ব্যথা বেদনার জগতের অন্তরালে যে আনন্দময় জগৎ বিদ্যমান মানুষ সাহিত্যের মধ্য দিয়াই তাহার নাগাল পায়, তাহাকে আপনার বলিয়া জানিতে পারে। আর সেইজন্যই মানুষ

আপন আনন্দময় সত্তার প্রকাশের তাগিদে সাহিত্য সৃষ্টি করে। সাহিত্যের আনন্দ সৃষ্টিকে অনেকে খেলার আনন্দের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে অপ্রয়োজনের আনন্দের সৃষ্টি বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। সাহিত্য মানুষের মনের গহনে শুধু সাড়াই জাগায় না মানুষের সহিত মানুষকে একাত্ম করিয়া দিতে সাহিত্যই সবচেয়ে শক্তিশালী বাহন। মানুষ তাহার মনের ভাবকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিতে চায়। অন্যের হৃদয়ের সহিত একাত্ম হইবার কামনাতে মানুষ সাহিত্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ শিল্পী তাঁহার মনের অনুভূতিকে বাঙ্‌ময় রূপ দান করিয়া বিশ্বের দরবারে প্রচার করেন। সাহিত্যের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে প্রচারের উপাদান। অনুভূতি প্রকাশের, চিন্তাধারা প্রকাশের এই যে শক্তিশালী বাহন তাহা উদ্দেশ্যবিহীন হইবে কি না তাহা লইয়া সমালোচক মহলে দ্বিমত থাকিলেও বলিতে পারা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যে নিশ্চয় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা রস সঞ্চারেরই হউক অথবা অন্য কিছুরই হউক।

আজিকার পৃথিবীতে সাহিত্য প্রচারের বাহন হইবে কি না তাহা লইয়া দ্বিমত দেখা দিলেও সাহিত্যে প্রচারধর্মিতার যে অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহারা সাহিত্যকে প্রচারের জন্য ব্যবহার করিতে চাহেন তাঁহাদের মতে আজিকার পৃথিবীর জীবন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে প্রতিনিয়তই জটিল হইয়া উঠিতেছে। এই জটিলতা হইতে মুক্তি পাইবার মানসে মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। মানুষ তাহার ব্যবহারিক জীবন হইতেই সাহিত্যের সামগ্রী সঞ্চয় করে। অতএব সে যে আজিকার এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের বাহিরে গিয়া নিছক সাহিত্যের আনন্দের জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করিবে, কল্পনা বা আদর্শবাদের দিক দিয়া একথাকে জানিয়া লইলেও বাস্তবে তাহা সম্ভব হয় না। তাহা হইলেও প্রশ্ন জাগে তবে কি তারস্বরে মতবাদের প্রচার করাই সাহিত্যের ধর্ম। সাহিত্যের মধ্যে প্রচারের উপাদান নিশ্চয় নিহিত আছে। কারণ আপন মনের ভাব ভাবনাকে অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে চায় বলিয়াই তাহাকে সাহিত্যের আঙ্গিকে প্রচার করে। কিন্তু আঙ্গিক সাহিত্য হওয়া চাই। অর্থাৎ প্রচারের বস্তু প্রায়শই হয় সাময়িক। এই সাময়িকের উপর ভিত্তি করিয়া যাহা রচিত হয় তাহার আবেদন কিন্তু সমস্যার নিরসনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। সাহিত্যের মধ্যে চিরন্তন বস্তু থাকে বলিয়াই সাহিত্য কালের প্রহরা এড়াইয়া যুগ হইতে যুগান্তরের পারে মানুষের

আনন্দের পশরা বহিয়া আনে এবং যে রচনা কিছু প্রচার করিয়াও সেই চিরন্তনী বাণীকে বহন করে তাহাই সাহিত্যের সংজ্ঞা লাভ করে। 'Uncle Tom's Cabin' দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারমূলক রচনা। সাহিত্যের শক্তি আমরা এই উপন্যাসের প্রতি নজর দিলেই উপলব্ধি করিতে পারি। দাস প্রথা আজ আমেরিকার বুক হইতে অপসারিত হইয়াছে কিন্তু 'Uncle Tom's Cabin'এর যে মানবিকতার সুর তাহা তাহাকে চিরকাল সাহিত্যের অমর আসনে বসাইয়া রাখিবে। গোর্কির 'Mother' জার আমলের রাশিয়ার অত্যাচার-অবিচার-প্রপীড়িত অবস্থার বর্ণনা এবং তাহা হইতে মুক্তির পথনির্দ্দেশ। কিন্তু তাহা যুগ যুগ ধরিয়া মানুষকে আনন্দ দান করিতেছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কোন কিছুর প্রচার করিতেছে বলিয়া কোন রচনাকেই পুরাপুরি ভাবে বাতিল করা যায় না। এবং কোন কিছু প্রচার করিতেছে বলিয়া কোন রচনাকেই নিঃসঙ্কোচে নিন্দাও করা যায় না।

সাহিত্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—ইহা বাস্তব ঘটনা। অনেকে মনে করেন যে, সাহিত্যে রাজনীতির কোন স্থান নাই কিন্তু আজিকার দুনিয়ার মানুষের সামনে শোষণের যে চেহারা বাস্তবরূপে নিয়ত বিরাজমান তাহা হইতে শিল্পী সাহিত্যিকের দল দূরে সরিয়া থাকিতে পারেন না। তাই আজ তাঁহাদের রচনায় আমরা রাজনীতির কোলাহলের ছায়ার অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাই। এই রাজনীতি যেখানে কেবল মাত্র দলীয় মতবাদ প্রচারের জন্য সাহিত্যকে ব্যবহার করিতে চায় নিঃসন্দেহে সাহিত্য সেখানে গড়িয়া উঠে না। তাহার সহিত বিশ্বমানবের মনের কোন সাযুজ্যতা আসিতে পারে না। কিন্তু যদি দলীয় মতবাদের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাহাতে চিরন্তন মানবিকতার সুর ধ্বনিত হয় তাহা হইলে তাহা নির্দিষ্ট মতবাদকে প্রচার করিলেও সাহিত্যধর্ম লাভ করে। রাশিয়ার বিপ্লবের পর প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে তথায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রাক্‌বিপ্লব যুগের ঐতিহ্যকে স্বভাবতই রক্ষা করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ যখন বিপ্লবের ঘূর্ণি থামিয়া গিয়া স্থিতি আসিয়াছে তখন সেখানে আমরা পস্তারনাকের 'ডাঃ ঝিভাগো'র মত গ্রন্থের জন্মলাভ দেখিতে পাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রগতিপন্থী সাহিত্য রচনার প্রথম ঝোঁকের সৃষ্টির কতগুলি কালের বিচারে টিকিয়া থাকিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু আজ যখন সেই

বন্যার প্রথম ঝোঁক শান্ত হইয়াছে তখন আমরা এমন সব শিল্পকৃতি দেখিতেছি যাহা হয়ত কালের কষ্টিপাথরে টিকিয়া থাকিতে পারিবে।

প্রচারধর্মিতা থাকিলেই সাহিত্য হইবেনা এবং না থাকিলেই সাহিত্য হইবে এই স্থূল ভেদরেখা টানিবার সময় দেখিতে হইবে কোন রচনা রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। কোন রচনায় শাশ্বত বাণী মূর্তি পাইয়াছে। রসোত্তীর্ণ শাশ্বত বাণী মূর্তিকেই আমরা সাহিত্য বলিব তাহা যা কিছুই প্রচার করুকনা কেন। অবশ্য আজিকার যুগে বসিয়া আজিকার সাহিত্যের শাশ্বত মূল্য নির্ধারণ করা সহজ নয় এবং উচিতও নয়। ইহার সুষ্ঠু বিচার করিতে পারে আগামী যুগ। অনাগত কালে এইসব রচনার প্রচার মূল্য এবং সাহিত্যিক মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারিত হইতে পারে তাহার পূর্বে নয়।

জাতীয় সাহিত্য

জাতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞাটি একটু ব্যাপক। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগীয় সংজ্ঞার সহিত আমরা পরিচিত। আমরা ধর্মীয় সাহিত্য কাহাকে বলে তাহা জানি। রোমাণ্টিক ও ক্লাসিক বা এপিক সাহিত্যের সংজ্ঞাও আমরা অবগত আছি। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য কথাটির অর্থ কি?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, জাতীয় সাহিত্য হইল সেই সাহিত্য যাহার মাঝে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনীটি মূর্ত হইয়া উঠে। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সাহিত্য মাত্রই তো সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনী। প্রকৃত সাহিত্য তো সমাজ নিরপেক্ষ হইতে পারে না। তাহাতে যুগ ও জীবনের কিছু না কিছু স্বাক্ষর থাকিবেই। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রায় সকল সহিত্যকৃতিকেই জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে হয়। এই জন্যই জাতীয় সাহিত্যের সংজ্ঞাটি স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে জাতীয় সাহিত্য হইল সেই সাহিত্য যাহা সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনীটিকে মূর্ত করিয়া সমগ্র জাতিকে যুগে যুগে নব নব অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত করিয়া তোলে। সাধারণ সাহিত্যের সহিত জাতীয় সাহিত্যের এইখানেই পার্থক্য। এ যুগের সাহিত্য বহুলাংশে লেখকের "Idle tears"। তাহা কবির স্বগত প্রলাপ, একান্তভাবে আপনার সামগ্রী তাহাতে

বাস্তব তথ্য ও তত্ত্বের হয়ত সার্থক সংমিশ্রণ আছে। কিন্তু তাহা যুগ যুগ ধরিয়া জাতির চিত্তে অনুপ্রেরণার মশাল শিখা জ্বালাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার মধ্যে জাতির জীবনের প্রাণস্পন্দনটি ধ্বনিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য তো,এইরূপ ব্যক্তিগত শিল্পবিলাস নহে। তাহা হইলে মেঘদূতকেও জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যাইত। সমকালীন অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টিকে জাতীয় সাহিত্যের কোঠায় ফেলা যাইত। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের কদাচিৎ সৃষ্টি হয় এবং অনন্তকাল ধরিয়া তাহার প্রভাব চলিতে থাকে।

বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতকে এইরূপ জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায়।—ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই খৃষ্টের জন্মেরও বহুবৎসর পূর্বে এই মহান্ গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে এবং অনতিকালের মধ্যেই হিমাচল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই গ্রন্থের আবেদন সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেশের ও জাতির সমগ্র হৃদয় মন্থন করিয়া আনিয়া তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, এই দুইটি গ্রন্থের মাঝে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে মহাকবি হোমারের ইলিয়ড এবং ওডিসির কাহিনীকে জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই মহাকাব্য দুইটির মাঝে শুধু প্রাচীন গ্রীক জাতির জীবনের কেন্দ্র বিন্দুটিই ধরা পড়ে নাই, তাহা আজও সকলের নিকট সমান শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া আসিতেছে। জাতীয় সাহিত্য বিশেষ কোন এক জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করিলেও তাহা দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্ব সাহিত্যে পরিণত হয়।

জাতীয় সাহিত্যকে যদি হিমবাহের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত গুণবত্তাটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। হিমবাহ যেমন পর্বতের গাত্র হইতে নামিয়া শতধারায় বিচিত্র পথে প্রবাহিত হইয়া চলে, জাতীয় সাহিত্যের হিমবাহকে তেমনই যুগে যুগে বহু ভগীরথ বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত করান। পর্বতের বন্ধুর পথে সকলের হয়ত হিমবাহের ধারাকে স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য হয় না তাই তাহার ধারা বহিয়া চলে জনপদ প্রান্তরের মধ্য দিয়া। তখন সাধারণ মানুষ স্নান ও পানের জন্য সেই জলে আপনার কলস পূর্ণ করিতে পারে। কেহ বা অলস গোধূলি-বেলায় তাহার তরঙ্গের উপর অস্তাচলগামী সূর্যের বিচ্ছুরণ মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে। জাতীয় সাহিত্যও ঠিক এমনই। বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন। যুগ-যুগান্ত ধরিয়া কত কবি কত শিল্পী সেই অমৃতময় রামায়ণী কথাকেই সহজ, সরল রসে, বিচিত্র রীতিতে সাধারণের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। এই

সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ সমাজ জীবনের এক অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্য মানুষের জীবনের এক নব মূল্যায়ন ঘটায়। তাহাকে হীনতার পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে। যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই সে জাতির বড়ই দুর্ভাগ্য। ঐতিহ্যের দিক হইতে সে দেউলিয়া। চরম সঙ্কটে সে জাতি আপন অন্তরের মধ্যে মুক্তিমন্ত্রের সন্ধান পায়না, চাতকের মত তাহাকে বিদেশের ধার করা ঐতিহ্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়।

ভারতবাসীর জাতীয় সাহিত্য ছিল বলিয়াই সে জীবনের সর্ব খর্বতারে দহন করিতে পারিয়াছে। যুগ ও জীবনের চরম বিপর্যয়ের মাঝে সে আত্মার মাভৈঃ মন্ত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে।

মারাঠা বীর শিবাজী হইতে একালের নেতাজী পর্যন্ত সকলই ছোটবেলা হইতেই রামায়ণ মহাভারতের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহাভারতের ও গীতার বাণী ভারতের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত বীর সৈনিকদলকে জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য করিতে অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছে।

যে জাতির জাতীয় সাহিত্য এখনও রচিত হয় নাই, সেই জাতিকে অতন্দ্র দৃষ্টি লইয়া জাতীয় সাহিত্যের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। জীবনের নিরলস সাধনা ও আকুতির আন্তরিকতা হইতেই জাতীয় সাহিত্য জন্মলাভ করিবে।

বিশ্বসাহিত্য

বিশ্বসাহিত্যের সংজ্ঞা কিভাবে নিরূপিত হইবে? সাহিত্য ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। সমগ্র বিশ্বের জন্য সর্বজনবোধগম্য কোন ভাষার সৃষ্টি আজ পর্যন্ত হয় নাই। কাজেই বিশ্বসাহিত্যের প্রকাশ কি ভাবে হয় তাহা দেখিতে হইবে। বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদের সঙ্কলন করিলেই কি তাহা বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা লাভ করিবে। আমরা জানি এইভাবে বিশ্বসাহিত্যকে সংজ্ঞায়িত করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে, বিশ্বসাহিত্য বস্তুটি কি? কথায় কথায় আমরা বলিয়া থাকি অমুকের অমুক বইখানি বিশ্বসাহিত্যে আসন পাইবার যোগ্য। এই উক্তি আমাদের মনে বোধ হয় এই ধারণাই জাগাইয়া তোলে যে পৃথিবীর অপরাপর ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের

সঙ্গে উক্ত গ্রন্থখানি একাসনে বসিতে পারে। ইহা তো হইল তুলনামূলক আলোচনার কথা। এই তুলনা করিবার প্রবৃত্তি অধিকাংশ সময়েই গুণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পর্কে সচেতন মনোবৃত্তি হইতে জন্মলাভ করে না। হিন্দী সাহিত্যে কেহ একটি ভাল কবিতা লিখিলেই ঐ ভাষার সমালোচকগণ সচরাচর বলিয়া থাকেন ইহার চেয়ে ভালো কবিতা রবীন্দ্রনাথও লিখিতে পারেন নাই। এই ধরণের তুলনামূলক সমালোচনা মনের হীনতাবোধ হইতেই জন্মলাভ করে। ইহার সঙ্গে প্রান্তিক মনোবৃত্তির সম্পর্কটিও জড়িত থাকে। কিন্তু যখন দুইটি ভাষায় রচিত সাহিত্য সমান উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে তখন সমালোচনা হয় রসের দিক হইতে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা রুশ ও ফরাসী ভাষায় রচিত উপন্যাসের কথা উল্লেখ করিতে পারে। ভিক্টর হুগো বড় না টলষ্টয় বড়, তুর্গেনিভ বড় না মোপাসঁা বড়—এই বড়ত্বের দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার মনোবৃত্তির দ্বারা ঐ সকল জীবনশিল্পীদের সমালোচনা করা হয় না। জীবন ও জগৎকে তাঁহারা কিভাবে দেখিয়াছেন, কিভাবে তাঁহাদের দেখা তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে রূপলাভ করিয়াছে তাহাই হয় সমালোচনার মুখ্য বিষয়। কাজেই এই কথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, যে-কোন ভাষায় রচিত গ্রন্থ যখন ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া, ভাষার বন্ধনকে এড়াইয়া সর্বমানবের হৃদয়ে আনন্দের ধ্বনি জাগাইয়া তুলিতে পারে তখন তাহাকেই আমরা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বলিয়া অভিহিত করি। ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেটের মধ্যে যে অস্থিরচিত্ততা ও indecision আমরা লক্ষ্য করি, ওথেলোর যে অমূলক অসূয়া পরিনামে তাহার জীবনে ভয়াবহ পরিণতিকে টানিয়া আনে, কিং লিয়রের অর্ধোন্মাদ প্রলাপ যে নিদারুণ মর্মযাতনাকে ফুটাইয়া তোলে তাহা বিশ্বমানবের মনের মর্মমূলে নাড়া দেয়। 'গুড্ আর্থ'-এর দরিদ্র চীনা চাষীর সুখী হইবার আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীর তাবৎ মানবসমাজের সুখী হইবার আকাঙ্ক্ষারই প্রতিরূপ মাত্র।

আসলে শুধু ভাষা নয় সমাজ ও জীবন যাত্রা প্রণালীর বিভিন্নতা লইয়া ও মনের বিভিন্ন বৃত্তির দিক দিয়া মানুষ এক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। পুত্রহীনা নিগ্রোমাতার ক্রন্দনের সঙ্গে সভ্যতাভিমানী সমব্যথাতুরা ইংরাজ জননীর ক্রন্দনের কোন পার্থক্য নাই। কারণ, অন্তরের বৃত্তির দিক দিয়া আমরা এক।

> আমাদের অন্তকরণে যত কিছু বৃত্তি আছে সে কেবল সকলের সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্ম। এই যোগের দ্বারাই আমরা সত্য হই, সত্যকে পাই। নহিলে আমি আছি বা কিছু আছে, ইহার অর্থ থাকে না।

> জগতে সত্যের সঙ্গে এই যে যোগ ইহা তিন প্রকারের। বুদ্ধির যোগ, প্রয়োজনের যোগ, আর আনন্দের যোগ।........ এই আনন্দের যে যোগ ব্যাপারখানা কী। না, পরকে আপনার করিয়া জানা, আপনাকে পরের করিয়া জানা। যখন তেমন করিয়া জানি তখন কোন প্রশ্ন থাকে না। এ কথা আমরা কখনো জিজ্ঞাসা করি না যে, আমি আমাকে কেন ভালোবাসি। আমার আপন অনুভূতিতেই যে আনন্দ সেই আমার অনুভূতিকে অন্যের মধ্যে যখন পাই তখন এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না যে, তাহাকে আমার কেন ভালো লাগিতেছে।
>
> --রবীন্দ্রনাথ

এই অনুভূতির খবর আমরা কিসের মাধ্যমে পাই! সমগ্র শিল্পকলাই এই অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার একমাত্র বাহন। এই শিল্পকলার মধ্যে সাহিত্য নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বাহন। যে সাহিত্য এই অনুভূতির কথা বহন করে তাহাই বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। পৃথিবীর মহাকাব্যগুলি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কারণ, মানুষের ধর্মাধর্ম, নীতিবোধ, প্রেম, ভালোবাসার আদর্শ সব কিছুই ইহাদের মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। অথচ আকৃতি প্রকৃতির দিক দিয়া মহাকাব্যগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চ নীতিবোধ যে পৃথিবীর সর্বত্রই এক তাহার প্রমাণ পাই ঈশপ রচিত গল্পগুলির মধ্য দিয়া। এই গল্পগুলি পৃথিবীর সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত। এই সঙ্গে আমরা 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'কথাসরিৎসাগর'-এর গল্পগুলির কথা উল্লেখ করিতে পারি। সাহিত্যগুণ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই বলিয়াই নীতিকথা সম্বলিত হইলেও ইহাদের আবেদন কোনদিনই লোপ পাইবে না।

বিশ্বসাহিত্য কথাটী সম্প্রতি আমরা একটু বেশী করিয়াই শুনিতে পাই। ইহার সঙ্গত কারণ আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব আজ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন দেশের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা প্রণালীর সঙ্গে আমরা দ্রুত পরিচিত হইতেছি। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে পরিচয়ের মাত্রা আমাদের ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। এই পরিচয় রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা উপায়ে ঘনীভূত হইতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ঘনীভূত হইতেছে সাহিত্যের মাধ্যমে। অনুবাদ সাহিত্য এই পরিচয়ের মূল বাহন। ইংরাজী সাহিত্য উৎকৃষ্ট অনুবাদের দ্বারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রুশ ভাষায় প্রত্যহ পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের অজস্র গ্রন্থ অনূদিত হইতেছে। ফলে ঐ সকল ভাষা-

ভাষী লোকেরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ লাভ করিতেছে। ভাষার প্রাচীরের আড়ালে মনের যে অনুভূতিগুলি লুকায়িত রহিয়াছে অনুবাদ সেই প্রাচীরকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে আমাদের মনের পরিচয় করাইয়া দেয়। আজ আমরা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের আস্বাদ লাভ করিতেছি কিন্তু যতক্ষণ না মাতৃভাষার মারফতে তাহা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বসাহিত্যের যথার্থ আস্বাদন আমরা লাভ করিতে পারিব না। ঠিক তেমনই আমাদের মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থাদি যতদিন অন্যান্য ভাষায় অনূদিত না হইবে ততদিন শ্রেষ্ঠ রচনা থাকিলেও আমাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারিবে না। বিশ্বমানবের হৃদয়ের ভাব বিনিময়ের বাহনই হইতেছে বিশ্বসাহিত্য।

'আমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মই এই। সে আপনার আবেগকে বাহিরের জগতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে চায়। সে নিজের মধ্যে পুরা নহে।'—রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যের নানা বিভাগ

কবিতার কথা

ছন্দোবদ্ধ পদকেই কবিতা বলা হইয়া থাকে। ভাষাকে ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ করিলে তাহা কবিতার রূপ লাভ করে। 'ভাষা' বলিতে আমরা অর্থযুক্ত সেই পদ সমষ্টিকেই বুঝি, যাহা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের বক্তব্য রূপ লাভ করে। ভাষার প্রয়োজন এইখানেই নিঃশেষ হইয়া যায়। 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ'—অর্থাৎ ভাষা সীমাবদ্ধ অর্থের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে যখন ছন্দ যুক্ত হয় তখন তাহা প্রয়োজনের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়াইয়া আমাদের মনে অপ্রয়োজনের আনন্দ আনিয়া দেয়। ভাষা ও ছন্দের মিলিত রূপই হইতেছে কবিতা। ছন্দই কবিতার বিশেষ শক্তি। কেমন করিয়া মানুষ এই ছন্দ প্রয়োগ শিখিল তাহা বলা শক্ত কিন্তু সুপ্রাচীনকাল হইতেই এই ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। আদি কবি বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ এই ছন্দ উৎসারিত হইয়াছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি সবই ছন্দোবদ্ধপদে রচিত।

আদিমতম জাতিরা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। ছন্দোময় মন্ত্রে তাহারা অলৌকিক শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ছন্দের মধ্য দিয়া যে একটি সুর বিনির্গত হয় তাহার মধুময় আবেশ মানুষের মনে এক মুগ্ধ মায়াময় প্রভাবের সৃষ্টি করে। ফলে ছন্দ মানুষকে অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া আনন্দের রাজ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

গদ্যে রচিত সাহিত্যের সৃষ্টি খুব বেশীদিনের কথা নয়। অথচ পৃথিবীর প্রথম সাহিত্য ছন্দের বন্ধনে ধরা দিয়াছিল।

> পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনই সর্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দ-তরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল।—রবীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর প্রথম কাব্য সৃষ্টির করুণ কাহিনীটির মধ্যেই কবিতার জন্মকথাটি নিহিত রহিয়াছে। ব্যাধের শরাহত ক্রৌঞ্চীর দুঃখে বিগলিত মুনি বাল্মীকির মুখ-দিয়া অকস্মাৎ ছন্দোবদ্ধ শ্লোক বাহির হইয়া আসিল। এই যে অলৌকিক বস্তু মুনি লাভ করিলেন তাহা দিয়া তিনি কি করিবেন? এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। ক্রৌঞ্চীর দুঃখে বিগলিত মুনির মনে যে তীব্র বেদনাবোধ জাগ্রত

হইল তাহা তাঁহার চিত্তকে ভাবাবিষ্ট করিয়া তুলিল। এই বেদনা-সন্তপ্ত চিত্তের আত্মপ্রকাশের আনন্দ-বেদনা মুনির মনে এক অলৌকিক আনন্দ-ধ্বনি জাগাইয়া তুলিল। এই আনন্দ-ধ্বনি কবি-চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। কবিমনের এই আনন্দ-বেদনাকে প্রকাশ না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাইলেন না।

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তা'র বক্ষে বেদনা অপার,
তা'র নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

এই অলৌকিক বেদনার প্রকাশই কবিতা। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং মানব জীবন তাহাদের বিচিত্র রূপ রস গন্ধ লইয়া কবিচিত্তে অহরহ প্রতিফলিত হইতেছে। কবি আপনার মনের মাধুরী মিশাইয়া উহাদিগকে এক স্বতন্ত্র জগতে পরিণত করিতেছেন। কবির হৃদয়রসে জারিত এই জগৎই তাঁহার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করে। চিত্রকর যেমন দুই একটি রেখার বন্ধনে এক পরম সত্যকে বিধৃত করেন, সঙ্গীতজ্ঞ যেমন সুরের মায়ায় অসীম ও অরূপকে প্রকাশ করিতে চাহেন, কবিও তেমনই তাঁহার হৃদয়ে যে জগৎ মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া রূপ লাভ করিয়াছে তাহাকে চিত্র ও সঙ্গীতের সংযোজনায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। জগৎ ও জীবনকে লইয়াই সাহিত্যের কারবার। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, জগৎ ও জীবন তাহাদের বাস্তব-সর্বস্বরূপ লইয়া কবির কাব্যে প্রকাশিত হয় না। ভাবুকচিত্তে বাহিরের জগৎ আরেকটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে।

> লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে। বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙ্গে, নানা ছাঁদে, নানা রকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে। ভাবুকের মনের এই জগৎটি বহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশী আপনার।—রবীন্দ্রনাথ

এই জগতের কথা প্রকাশ করাই কবির কাজ। কিন্তু কবি যদি নিতান্ত সোজাসুজি, সাদাসিধা ভাবে তাহা প্রকাশ করিতে যান তবে তাহা হৃদয়গ্রাহী হইবে না।

> অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী সাহিত্যের অনির্বচনীয়তাটিও

সেই রূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়না। ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে,চিত্র এবং সঙ্গীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি আঁকার সীমা নাই। ·········এ ছাড়া ছন্দে, শব্দে, বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীত সঞ্চার করিয়া দেয়। অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।—রবীন্দ্রনাথ

অবশ্য বলাই বাহুল্য কাব্যে সঙ্গীত এবং চিত্র এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং মানব জীবন হইতে উপকরণ লইয়া রূপ লাভ করে। যে সঙ্গীতে সুরেরই প্রাধান্য, কথাবস্তু যেখানে অনুপস্থিত সেখানে সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। কবির হৃদয়ে যে আবেগ সঙ্গীতের মাধুর্যে প্রকাশিত হইতে চায় সেই আবেগ সৃষ্টির মূলে পরিচিত জগতের একটি সমুজ্জল চিত্র থাকে। অবশ্য চিত্র ও সঙ্গীত কাব্যের প্রধান উপকরণ হইলেও তাহারা কাব্যের সব কিছু নয়। কবি বস্তুজগৎ এবং হৃদয়-জগৎ হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং তাহা প্রধানতঃ চিত্র ও সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশিত বস্তু শুধু চিত্র বা সঙ্গীতের আস্বাদনই আনিয়া দেয়না পরন্তু ইহাদের অতিরিক্ত এক পরম রসমাধুর্যে পাঠক-চিত্তকে আপ্লুত করিয়া দেয়। এই অতিরিক্ত বস্তুটি কবির সৃজনী কল্পনা হইতে উদ্ভুত।

এই সৃজনী কল্পনাটি কি? উচ্চ কল্পনাশক্তির অধিকারী না হইলে কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব। তেমনই এই কল্পনাশক্তির কোন ব্যাখ্যা দেওয়াও সম্ভব নয়। কবিরা যখন কোন বিষয়কে প্রকাশ করেন তখন সেই বিষয়টি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বহু পূর্ব হইতেই কবির মানস-রাজ্যে নিহিত থাকে। কবি সেই অন্তরের বস্তুটিকেই বাহিরে প্রকাশ করেন। যেখানে কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কবির কোন পূর্ব ধারণা থাকেনা, যাহা

কবির অন্তর হইতে রস সংগ্রহ করে না তাহা প্রকৃত কল্পনা নহে—তাহাকে কাল্পনিকতা বলা যাইতে পারে। কল্পনা যুক্তির দ্বারা সুনির্দিষ্ট, সংযমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সত্যের দ্বারা প্রভাবিত। কল্পনার মাঝে কোন অসঙ্গতি নাই—Probable impossibilities হইল কল্পনা আর improbable possibilities হইল কাল্পনিকতা। এই কল্পনার বলেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবি তাঁহার বিশিষ্ট ধারণাকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন।

> আমরা যাহা দেখি নাই, তাহা তাঁহার অনুগ্রহে বুঝিতে পারি ····· যাহার রঙ দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিলনা, তিনি তাহাকে রঙ দেখিবার সামর্থ্য দিয়া অনুগৃহীত করেন। —মোহিতলাল মজুমদার

কবি তাঁহার উচ্চ কল্পনার বলে কাছের ও দূরের, নিত্য ও অনিত্যের রূপ ও অরূপের, তথ্য ও সত্যের, সসীম ও অসীমের, বাস্তব ও আদর্শের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এমনভাবে তাহা প্রকাশ করেন যাহাতে পাঠকের মনেও অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়। ইহাই কবিদের, 'Beautiful and beauty-makiug power.'

কবিরা মনের ভাবকে কবিতায় যখন প্রকাশ করেন তখন তাহাকে নানা অলঙ্কারেই সজ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুনির্দিষ্ট যতি-বিভাগ এবং মিল থাকিলেই কবিতা হয় না। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সমুচিত প্রয়োগে কবিতা মনোহারী রূপ লাভ করিয়া থাকে।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, অলঙ্কার যুক্ত ছন্দোবদ্ধ পদসমষ্টি যখন কবিপ্রতিভার মায়াবলে বিষয়বস্তুর সীমা লঙ্ঘন করিয়া এক অতিরিক্ত আস্বাদ আমাদের মনে আনিয়া দেয় এবং আমাদের মনকে এক অলৌকিক আনন্দের রাজ্যে লইয়া যায় তখন তাহাকেই আমরা কবিতা নামে অভিহিত করিতে পারি। বিশিষ্ট কাব্য সমালোচক অধ্যাপক Abercrombie তাঁহার 'The Idea of Great Poetry' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন :

> I will call it compendiously 'Incantation'; the power of using words so as to produce in us a sort of enchantment; and by that I mean a power not merely to charm and delight, but to kindle our minds

into unusual vitality, exquisitely aware both of things and of the connections of things.

বৈচিত্র্য অনুসারে কবিতাকে নানা ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। তবে প্রধানতঃ কবিতার দুইটি বিভাগ—গীতিকবিতা (Subjective Poetry) এবং বস্তুনিষ্ঠ কবিতা (Objective Poetry). কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, চিন্তা যে কাব্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয় তাহাকে আমরা গীতিকবিতা বলিতে পারি। আবার যখন বস্তুজগৎকে কবি যথাযথরূপে প্রকাশ করেন তখন আমরা তাহাকে বস্তুনিষ্ঠ কবিতা নামে অভিহিত করিতে পারি। গীতিকবিতাকে ভক্তিমূলক, প্রেমমূলক, প্রকৃতিবিষয়ক এবং বস্তুনিষ্ঠ কবিতাকে মহাকাব্য, গাথাকাব্য, রূপককাব্য, ব্যঙ্গকবিতা প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

মহাকাব্য

প্রাচ্যের 'মহাকাব্য' আর পাশ্চাত্যের 'এপিক' প্রায় সমার্থ-বোধক শব্দ। যদিও রূপশিল্প এবং গঠন-কারুকার্যের দিক দিয়া মহাকাব্য ও এপিকের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তবুও অন্তরঙ্গ স্বরূপলক্ষণ বিচার করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন গুরুতর ব্যবধান পরিলক্ষিত হইবে না। ভারতীয় মহাকাব্য ও পাশ্চত্যের এপিক বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে মানুষের গল্প শুনিবার আদিম প্রবৃত্তি হইতেই এপিকের জন্ম হইয়াছে। মহাকাব্যের আকৃতি সুবিশাল, ইহাতে মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অজস্র কাহিনীর সমাবেশ করা হয়। ইহাদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকের যথেষ্ট সমাবেশ করা হইলেও ইহাদের মধ্যে চিত্রিত চরিত্রগুলির সঙ্গে মানব জীবনের গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এই চরিত্রগুলির সমুন্নতি বিস্ময়কর এবং ইহাদের কবি কল্পনার সুবিশাল বিস্তার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ (objective) কবিতার অন্তর্গত কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে Sublimity-র (উদাত্ততা) অভাব নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা মহাকাব্যের গঠন প্রণালী সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মহাকাব্যকে কমপক্ষে আটটি সর্গে বিভক্ত হইতে হইবে; শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত এই তিনটি রসের যে কোন

একটি তাহার প্রধান রস হইবে এবং অন্যান্য রস তাহারই অঙ্গ হইবে। ইতিহাসাশ্রিত বা কোন বিখ্যাত ঘটনা অবলম্বন করিয়া মহাকাব্য গড়িয়া উঠিবে। ইহার নায়ক হইবেন উন্নত চরিত্র দেবস্বভাববিশিষ্ট কোন মহাবীর। ইহাতে ন্যায় ও সত্যের জয় ঘোষিত হইবে এবং পরিণামে পাষণ্ডরা পরাভূত হইবে।

মহাকাব্যে সর্বদাই ঘটনার প্রাধান্য বিদ্যমান। রামায়ণ মহাভারতে ঘটনার অবধি নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে যেখানে যত উপাখ্যান প্রচলিত ছিল মহাভারতে একটি মূল কাহিনীর চারিধারে তাহাদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণে যদিও মূল কাহিনীরই প্রাধান্য তথাপি ইহাতে খণ্ড ঘটনার যথেষ্ট সমাবেশ আছে। পাশ্চাত্য 'এপিক' কথাটি 'ইপস্' শব্দটি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। 'ইপস' শব্দটির অর্থ 'গল্প'। অর্থাৎ এক মহা গাম্ভীর্যময় পরিবেশের মধ্যে যে 'ইপস্' বলা হয় তাহা 'এপিক'।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহাকাব্যগুলিতে দুরারোহী কবিকল্পনার বিস্তার দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। অতলস্পর্শী মহাসমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, কোটী কোটী যোজন ব্যাপী ব্রহ্মাণ্ড—ইহারা মহাকাব্যের কবির কল্পনার বিচরণ ক্ষেত্র। এপিকে ভাবধারার যেমন বৈচিত্র্য থাকে তেমনই তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় সুনির্বাচিত শব্দসম্পদ। এবং এই শব্দসম্পদের বিন্যাস প্রণালীটিও থাকে সুদৃঢ়। দেবতা ও শয়তানের চরিত্রচিত্রণ, প্রকৃতি বর্ণন, যুদ্ধ বর্ণন প্রভৃতি সব কিছুই মহকাব্যের অঙ্গীভূত হয়। মূল ঘটনার আশে পাশে থাকে প্রচুর উপঘটনা। কিন্তু তবুও কবি ভাবধারা, শব্দসম্পদ ও শব্দবিন্যাস এই তিনটি দিকের প্রতি নজর রাখিয়া সুবিশাল ঘটনার স্তূপকে এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেন যাহা আজিও আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যুগধর্ম ও তৎপ্রভাবিত সমাজের প্রভাব মহাকাব্যগুলির উপর প্রভূত পরিমাণে কার্যকরী হয়। এই জন্যই যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যগুলিরও পরিবর্তন হইয়াছে। এই পরিবর্তনের দিক দিয়া বিচার করিয়া মহাকাব্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রাচীন যুগে যে মহাকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে—Primitive Epic বা Authentic Epic. এই গুলিকে Epic of Growthও বলা হয়। এই মহাকাব্যগুলি যদিও কোন কবির নামে প্রচারিত তবুও অসংখ্য অখ্যাতনামা কবিকুলের উদ্যম প্রয়াস ইহাদের সঙ্গে

জড়িত। ঐ সকল কবিদের লেখা কাহিনী মূল কাহিনীর চারিপাশে শাখা প্রশাখার মত বিস্তার লাভ করিয়াছে। রামায়ণের গল্পটি বিভিন্ন আকারে ভারতবর্ষ এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি তাঁহার অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে এই প্রচলিত কাহিনীগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক সুসমঞ্জস শিল্পশোভা দান করিয়াছেন। এই 'Epic of growth'-কে 'সঙ্কলিত মহাকাব্য' বলা যাইতে পারে। অনেকে এই গুলিকে 'জাত মহাকাব্য' নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে হিমালয় পর্বত যেমন ভারত ভূমিতে আপনিই জাত হইয়াছে বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ব্যাসের 'মহাভারত' তেমনই ভারত ভূমির দান। হোমারের 'অডিসি' এবং 'ইলিয়ড্' এই জাত মহাকাব্যের দৃষ্টান্ত।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের দুইটি—বাল্মীকির 'রামায়ণ' ও ব্যাসের 'মহাভারত' ও পাশ্চাত্যের দুইটি—হোমারের 'অডিসি' ও 'ইলিয়াড্', পৃথিবীতে এই চারিটিই 'Epic of Growth'-এর দৃষ্টান্ত। এই শ্রেণীর মহাকাব্যগুলিতে সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা ও অনুভূতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, ইহলৌকিক আদর্শ প্রভৃতি এক অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তায় বিধৃত হয়। যদিও এইগুলিতে একটা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার কথা—The totality of the beliefs of a people—প্রতিবিম্বিত হয় তথাপি এইগুলির মধ্যে একটি সর্বাত্মক বিশ্বজনীন আবেদন থাকে।

অপেক্ষাকৃত নবীন অর্থাৎ অর্বাচীন মহাকাব্যকে 'Literary Epic' বা 'Imitative Epic' বা 'Epic of Art' নামে অভিহিত করা হয়। এই গুলিতে কাহিনীর বিস্তার ততটা সুবিশাল নয়, মূল কাহিনীর চতুষ্পার্শ্বে উপঘটনা বিশেষ থাকে না। কিন্তু ইহাদের ঘটনাবস্তু সুসংবদ্ধ, চরিত্র চিত্রণ মহিমাময়, মননশীলতা ও কল্পনার প্রাখর্যে ইহারা উজ্জ্বল। সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার চেয়েও সমসাময়িক যুগ-প্রভাবিত কবির ব্যক্তি মানসের পরিচয়ই এইগুলিতে সমধিক প্রকাশিত হয়: It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary culture on lines already laid down. মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট', ভার্জিলের 'ঈনিদ্', ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভারড্' এই Imitative Epic'—এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর মহাকাব্যকে 'অনুকৃত মহাকাব্য' বলা হয়। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মহাকাব্যের রচয়িতা। 'মেঘনাদ বধ'

কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত 'অনুকৃত মহাকাব্যের' শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মধুসূদনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রভৃতি কবিরা মহাকাব্য রচনার প্রয়াস করেন।

প্রাচীন মহাকাব্যগুলির মধ্যে পাপ ও পুণ্য এমন অকৃত্রিম নিরাভরণ সরলতার মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যাহা অর্বাচীন মহাকাব্যগুলির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। অর্বাচীন মহাকাব্যগুলিতে প্রভূত শিল্প চাতুর্য দেখা গেলেও প্রাচীন মহাকাব্যগুলির স্পষ্টতা ও উদাত্ততা তাহাতে অনুপস্থিত:

> এই যুগের শিল্পী কারুকার্যময় তাজমহল গড়িতে পারে, কিন্তু পিরামিড-রচনার যুগ বুঝি অতীত হইয়া গিয়াছে।—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

আধুনিক যুগে সমাজ জীবনের জটিলতা, অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকে অবিশ্বাস, যুক্তিনিষ্ঠ মন, উৎকট ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ প্রভৃতি সব কিছু মিলিয়া প্রাচীন মহাকাব্যের ধারাকে অব্যাহত থাকিতে দেয় নাই।

> ইহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিল, ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ

শুধু প্রাচীন মহাকাব্যই বা বলি কেন অর্বাচীন মহাকাব্যও আর রচিত হইতেছে না। বর্তমান কর্মব্যস্ত যুগ কোন প্রকার দীর্ঘকাব্য রচনার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। আধুনিক যুগকে মুখ্যতঃ ছোট গল্প ও গীতি কবিতার যুগ বলা যাইতে পারে। তাই এ যুগে মহাকাব্য রচিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

গীতিকবিতা

'গীতিকবিতা' কথাটির অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরাজী সাহিত্যে গীতিকবিতাকে বলা হয় Lyric. সঙ্গীতমূলক এই কবিতাগুলি বীণাযন্ত্রের (Lyre) সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে Lyric বা গীতিকবিতা। কিন্তু আধুনিক কাব্যে গীতিকবিতার যে রূপটি দেখা যায় তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে বসাইলে ভুল করা হইবে। ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতিকবিতার পার্থক্যটি বিশেষ সুপরিস্ফুট। আধুনিক গীতিকবিতার মধ্যে সঙ্গীতধর্মিতা থাকিলেও ইহা নিছক সঙ্গীত নহে। কারণ শব্দচয়ন ব্যাপারে সঙ্গীত রচয়িতার হাত

পা বাঁধা। সুরের প্রয়োজনে তাঁহাকে শব্দ নির্বাচন করিতে হয়। যে সকল শব্দ সুরাত্মক এবং অতি সহজে উচ্চার্য সঙ্গীতরচয়িতা সেইগুলিকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া সঙ্গীতে ভাবের বৈচিত্র্য থাকে না। একটি সঙ্গীতে একাধিক ভাবকল্পনা অসম্ভব। অপর দিকে গীতিকবিতায় ভাবের বৈচিত্র্য থাকায় কোন বাধা নাই এবং তাহাতে শব্দচয়ন ব্যাপারে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে।

এই গীতিকবিতা বস্তুটি কি? গীতিকবিতা মন্ময় (subjective) কবিতার অন্তর্গত। ইহাতে সাধারণতঃ কোন কাহিনী থাকে না। বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্যলীলা কবির মনে যে আবেগের সৃষ্টি করে এবং অচেতন অনুভূতির উচ্ছ্বাস যখন কবি সঙ্গীত-মুখর-ছন্দে রূপায়িত করেন তখনই জন্ম হয় গীতিকবিতার। 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই' গীতি-কাব্য। গীতিকবিতা কখনও তত্ত্বের ভারে ভারাক্রান্ত হয় না। ইহা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির আনন্দ-বেদনায় পূর্ণ। এই শ্রেণীর কবিতা পাঠ করিলে আমরা কবির অন্তরের গভীর তলদেশ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারি। সমস্ত কবিতাটির মধ্যে কবির প্রাণস্পন্দন যেন আন্দোলিত হিল্লোলিত হইতে থাকে।

গীতিকবিতার অবয়ব দীর্ঘাকৃতি হয় না। গীতিকবিতাতে কবির অনুভূতি প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহা দীর্ঘাকার হইতে পারে না। কারণ একই অনুভূতি মানুষের অন্তরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সাবলীল গতি, সঙ্গীতমুখরতা, নিটোল স্বল্পাকৃতি অবয়ব—এই হইল গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। আর কবির আন্তরিকতা-পূর্ণ অনুভূতি হইল গীতিকবিতার প্রাণ।

আনন্দের উদ্বোধনই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। তত্ত্বমূলক বা উদ্দেশ্যমূলক কবিতা অনেক সময় যে, কাব্যগুণসমৃদ্ধ হইয়া উঠে না এমন নয় কিন্তু গীতিকবিতায় তত্ত্বের স্পর্শও বর্জনীয়। গীতিকবিতার প্রধান কাজই হইতেছে নিছক আনন্দকে প্রকাশ করা এবং সেই আনন্দ অপরের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া। যাঁহারা কাব্যের মধ্যে উদ্দেশ্যকে অনুসন্ধান করেন তাঁহারা কাব্যরস হইতে বঞ্চিত হন। ইংরাজী সাহিত্যের দিক্‌পাল কবি মিলটন তাঁহার রচিত 'প্যারাডাইস লষ্ট'-এর একখণ্ড তাঁহার বন্ধু কেম্‌ব্রিজের গণিতের অধ্যাপক বাট্‌লারকে উপহার দিয়াছিলেন। বাট্‌লার কবিকে জানাইলেন যে বইখানি ভালই হইয়াছে কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। জ্যামিতি সব সময়ই একটা কিছু প্রমাণ করে। ঐ দৃষ্টিতে যিনি কাব্যকে দেখিবেন তাঁহার কাব্য-পাঠই বৃথা।

ধর্মমূলক বা ভক্তিমূলক কবিতা যে গীতিকবিতা হইয়া উঠিতে পারে না এমন কোন কথা নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এইগুলি তখনই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা হইয়াছে যখন ধর্মের আবেদনকে পশ্চাতে ফেলিয়া কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আকুলতাকে বিধৃত করিয়াছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাগানগুলির উল্লেখ করিতে পারি। এইগুলিতে ধর্ম-সাধনার বিশেষ ইঙ্গিত লুক্কায়িত থাকিলেও সুর ও অনুভূতির গুণে ইহারা গীতিকবিতার সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তীকালে বাঙ্গলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বৈষ্ণব কবিতার রূপটি এই চর্যাপদে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥
বেঙ্গস সাপ বড়্হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ ॥

টিলার উপর আমার ঘর। আমার কেউ প্রতিবেশী নাই। হাঁড়িতে ভাত নাই, নিত্য অভাবের সংসার। ব্যাঙ আর সাপ ঘরে বাড়িয়া উঠিল। ভাগ্য বিরূপ হইলে কি আর কপাল ফিরে? দুধ দুহিয়া নিলে কি আর তা গরুর বাঁটে ফিরিয়া যায়?—নিঃসন্দেহে এই গানে সাধন পদ্ধতির গোপন ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তবুও ইহার গীতিধর্মিতা ও রচয়িতার অনুভূতি লক্ষণীয়।

চর্যাপদের পরই আমরা বৈষ্ণব কবিতাবলীর উল্লেখ করিতে পারি। গীতিকবিতার দিক দিয়া এইগুলি শুধু বাঙ্গলা সাহিত্যের নয় বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

অথবা,

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি কি করে প্রাণ ॥

কিংবা,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

এইগুলিতে অন্তরের অনুভূতি, আবেগ ও আকুলতা যে ভাবে সুরের মধ্য দিয়া প্রাণ পাইয়াছে তাহার তুলনা পাওয়া ভার। বৈষ্ণব কবিরা ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের আচরিত ধর্মে তত্ত্বও ছিল কিন্তু তাঁহাদের রচিত কবিতায় উহা মুখ্য হইয়া উঠে নাই। বাউল গানের মধ্যে ঠিক ইহার বিপরীত দিকটা লক্ষ্য করা যায়। গীতিকবিতার গুণ থাকা সত্ত্বেও তত্ত্বের চাপে বাউল সঙ্গীত সার্থক গীতি কবিতায় পরিণত হইতে পারে নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে সার্থক গীতিকবিতার অভাব নাই। বাঙ্গলা দেশের জল হাওয়ার মধ্যে, ইহার মাটিতে এমন একটি কোমলতা ও সুরের আবেশ আছে যাহাতে রামায়ণ, মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে পর্যন্ত গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। কাহিনীমূলক খণ্ডকবিতাও কবি-প্রতিভার বলে সার্থক গীতিকবিতা হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'পুরস্কার', 'ভাষা ও ছন্দ', 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি কবিতা। টেনিসনের 'The Lady of Shallot' বা ব্রাউনিং-এর 'The Lost Leader' এই পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু তবুও বলিব কবির ব্যক্তি-অনুভূতি যে কবিতাকে স্নিগ্ধ কান্তি দান করে তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। বাঙ্গলা সাহিত্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী এই শ্রেণীর কবিতার প্রথম প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই গীতিকবিতা অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির সেই অনুভূতিতে আমাদের চিত্ত যখন এক কল্পলোকে উধাও হইয়া যায় তখনই গীতিকবিতার আসল সার্থকতা ধরা পড়ে। কবি যখন বলেন,

রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরবনা আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি॥
যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি।
রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ-রতন আশা করি॥—রবীন্দ্রনাথ

অথবা,

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল
বিদায় গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই,
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা সাজি।
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়॥—রবীন্দ্রনাথ

অথবা,

হে বসুধা
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে—যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসাররথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে

টানায়েছ রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল ক'মে
ছুটির গোধূলি বেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষু কর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ ;
দিতেছ ললাট পটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু, জানি
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারেনা ফেলিতে দূরে টানি।
তব প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত যে মানুষ, তারে
দিতে হবে চরম সম্মান তব শেষ নমস্কারে।
যদি মোরে পঙ্গু করো, যদি মোরে কর অন্ধপ্রায়,
যদি বা প্রচ্ছন্ন করো নিঃশক্তির প্রদোষচ্ছায়ায়,
বাঁধো বার্ধক্যের জালে, তবু ভাঙা মন্দিরবেদিতে
প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে—তারে কেড়ে নিতে
শক্তি নাই তব ॥—রবীন্দ্রনাথ

অথবা,

মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকল রবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য-প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।—রবীন্দ্রনাথ

অথবা,

If I were a dead leaf thou mightest bear ;
If I were a swift cloud to fly with thee ;
A wave to pant beneath thy power, and share

The impulse of thy strength, only less free
Then thou, O uncontrollable ! If even
I were as in my boyhood, and could be

The comrade of thy wonderings over heaven,
As then, when to outstrip thy skiey speed
Scarce seemed a vision, I would ne'er have striven

As thus with thee in prayer in my sore need.
O, lift me as a wave, a leaf, a cloud !
I fall upon the thorns of life ! I bleed !

A heavy weight of hours has chained and bowed
One too like thee : tameless, and swift, and proud.

(Shelley)

তখন আমরাও কবির সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাই। আর বারে বারে এইগুলি আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে। গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ গুণই হইতেছে এই যে, মনের যে-কোন অবস্থায় ঐগুলি আবৃত্তি করিলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। ক্ষণকালের জন্য হইলেও এই ধূলিধূসরিত ধরণীই তখন স্বর্গলোকে পরিণত হয়।

সনেট

কবিতার এক বিশেষ রূপকে 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী কবিতা' বলা হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সনেটের প্রবর্তক। কবির এক অখণ্ড ভাবকল্পনা সনেটে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। ইহা পয়ার বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়। চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট চৌদ্দ পংক্তিতে ইহা আত্মপ্রকাশ করে। সনেট শব্দটি ইটালীয়ান 'সনেটো' শব্দ হইতে উদ্ভূত।

The Sonnet (diminutive from Italian 'sono'—sound) is a short lyrical poem complete in one stanza, containing fourteen lines of five measured verse.—Prof. Bain

চতুর্দশ শতাব্দীর ইটালীয়ান কবি পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪ খৃষ্টাব্দ) সনেটের জন্মদাতা। দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি কবিগণের মতই ইংরাজী সনেট লেখকগণ সনেট রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে ওয়াট এবং স্যারে প্রথম সনেট রচনা করেন। অতঃপর সেকস্‌পীয়র ও মিলটনের হাতে সনেটের চরম উৎকর্ষ লাভ হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্‌, রসেটি, আর্নল্ড, ব্রুক প্রভৃতি কবিগণও সনেট রচয়িতা হিসাবে যশের অধিকারী।

সনেটে চৌদ্দটি পংক্তি বা চরণ থাকে। এই চৌদ্দ চরণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত থাকে—প্রথম আট চরণ (octave বা অষ্টক), তারপর ছয় চরণ (sestet বা ষট্‌ক)। প্রথম আট চরণে ভাব-কল্পনাটি রূপ ধারণ করে আর পরের ছয় চরণে ঐ ভাব-কল্পনাটি ব্যাখ্যাত হয় এবং পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। অষ্টকের আট চরণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত—চার পংক্তি+চার পংক্তি। প্রতি চার পংক্তির ভাগের নাম চতুষ্ক (Quartrain)। তেমনই আবার পরের ছয় পংক্তির দুইটি ভাগ—তিন পংক্তি+তিন পংক্তি। তিন পংক্তির এক এক ভাগকে ত্রিপাদিকা (Tercet) বলে। কিন্তু এই ভাগাভাগি সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, সমগ্র কবিতাটি যেন একটি অখণ্ড ভাবের দ্যোতনা করে।

পেত্রার্ক রচিত সনেটের চরণান্তিক মিলটিও নিয়মবদ্ধ। উহার মিলের নিয়ম (কখখক+কখখক)+(গঘঙ+গঘঙ) অথবা (গ ঘ ঙ+ঘ গ ঙ)। মধুসূদন প্রধানতঃ সনেটের এই রূপটিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন,

	কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে	ক
	কালীদহে। বসি বামা শতদল দলে	খ
	(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে	খ
অষ্টক	মনোহরা) বাম করে সাপটি হেলনে	ক
	গজেশে গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।	ক
	গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,	খ
	বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।	খ
	কার না ভোলে রে মনঃ, এহেন ছলনে।	ক

	কবিতা-পঙ্কজ রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,	গ
	ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! ফলঃ সুধাদানে	ঘ
ষট্‌ক	অমর করিলা তোমা অমরকারিণী	ঙ
	বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ	গ
	এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে ?	ঘ
	বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী।	ঙ

সেকস্‌পীয়র এই মিলের নিয়ম বহুক্ষেত্রে লঙ্ঘন করিয়াছেন। তিনি শেষ দুইটি চরণকে দোহার (Couplet) রূপ দিয়াছেন। মাইকেলের সনেটেও এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মাইকেলও সেকস্‌পীয়রের মত অষ্টক ও ষট্‌কের মিল সর্বত্র রক্ষা করেন নাই।

পরবর্তীকালে সনেটের চরণান্তিক মিলের কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ডি. জি. রসেটির একটি সনেটের রূপ হইতেছে :—

A Sonnet is a moment's monument---	A
Memorial from the soul's eternity	B
To one dead deathless hour. Look that it be,	B
whether for lustral rite or dire potent,	A
Of its own arduous fulness reverent :	A
Carve it in ivory or in ebony,	B
As Day or Night may rule ; and let Time see,	B
Its flowering crest impearl'd and orient.	A
A Sonnet is a coin : its face reveals,	C
The soul ;—its converse, to what power its due :—	D
Whether for tribute to the august appeals	C
Of life, or dower in Love's high retinue,	D
It serve; or' mid the dark wharf's cav'rnous breath	E
In Charon's palm it pay the toll to Death.	E

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি কবিদের হাতে সনেট বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। রবীন্দ্রনাথের সনেটে বিভিন্ন

প্রকার বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মধুসূদনের পর বাঙলা সনেটের রূপ সাধারণতঃ এইরূপ—(ককখখ+গগঘঘ)+(ঙঙচ+চছছ), (কখখক+কখখক)+(গগঘ +ঙঘঙ), (কখখক+কখখক)+(গঘগ+ঘগঘ)। দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

মাঝে মাঝে কতবার ভাবি, কর্মহীন
আজ নষ্ট হল বেলা, নষ্ট হল দিন॥
নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ—
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুর রূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুট বর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে।
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ। আমি নিদ্রাতুর
আলস্যশয্যার পরে শ্রান্তিতে মরিয়া
ভেবেছিনু, সব কর্ম রহিল পড়িয়া॥
প্রভাতে জাগিয়া উঠি মেলিনু নয়ন ;
দেখিনু, ভরিয়া আছে আমার কানন॥

প্রমথ চৌধুরীর সনেটের একটি দৃষ্টান্ত :—

পেত্রার্কা চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ, ক
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্যে সনেট সাকার। খ
একমাত্র তারে গুরু করেছি স্বীকার. খ
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ! ক
নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ! ক
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার, খ
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার, খ
একথা পণ্ডিতে বোঝে, মুর্খে লাগে ধন্ধ॥ ক
ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন, গ
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন॥ গ

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ, ঘ
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট। ঙ
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহা বিজাতীয় গন্ধ ঘ
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট! ঙ

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, ষটকের প্রথম দুই চরণে দোহার (couplet) সৃষ্টি হইয়াছে। সনেট কেন চতুর্দশপদী এই সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত হইতেছে :—

আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত, নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে' নিলেই শ্লোকের প্রতিচরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ্ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু' অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে—যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূর্ত। এই চৌদ্দ অক্ষর থাক্‌বার দরুণই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখতে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বল্‌তে হবে এমন কোন রচনা করতে গেলে, বাঙ্গালী কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ন্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, বাংলার কাব্য নাটক-রচয়িতা মাত্রই পূর্ব্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখতে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের মত, সনেটে চতুর্দ্দশ পদের একত্র সঙ্ঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

সনেটে একদিকে যেমন কঠিন বন্ধনের মধ্যে থাকিতে হয় বলিয়া কবি-কল্পনাকে সঙ্কুচিত থাকিতে হয় অন্যদিকে তেমনই উদ্দাম কাব্যোচ্ছ্বাস এই বন্ধনে সংযত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করে।

কাব্যবিচার

পৃথিবীতে অবিমিশ্র সুন্দর বা অবিমিশ্র মন্দ বলিয়া কোন বস্তু নাই, কোন বস্তুর মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় অংশই আছে। আবার আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে সুন্দর বলিয়া মনে হয় পরে হয়ত দেখা যায় তাহার সৌন্দর্য ঠিক যেন সম্পূর্ণ নয়। কোথায়ও না কোথায় একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে যাহা একমাত্র সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখেই তাহা ধরা পড়ে। অনেক ধাতু আছে যাহার রূপ ও রঙ ঠিক সোনার মত। তাহা চকচকও করে কিন্তু কষ্টিপাথরে ঘষিলেই তাহার কৃত্রিমতাটুকু ধরা পড়িয়া যায়। সমস্ত বস্তু বিচারেরই এইরূপ একটি না একটি কষ্টিপাথর আছে। অনেক সময় ইন্দ্রিয় আমাদের সহিত প্রতারণা করে। তারল্যকে সারল্য বলিয়া ভ্রম হয়, লঘুকে মনে হয় শ্রুতিমধুর। বাহিরের রূপ অনেক সময় তাহার অন্তর-স্বরূপটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। তখন এই কষ্টিপাথরটাই একমাত্র ভরসা, ইহার কাজে কোনরূপ জারিজুরি চলেনা। ভেট পাঠাইলেও ইহার ন্যায্য বিচারের হাত হইতে অব্যাহতি মিলেনা।

কাব্য বিচারেরও ঠিক এমনই কষ্টিপাথর আছে,—আছে এক সাধারণ মাপকাঠি। তবে অনেক সময়ই এই মাপকাঠি হইল কাব্যপাঠকের মন। এই মন, এই হৃদয়টাই বিচারের স্থায়ী আদালত। এই মনটা হওয়া চাই 'সহৃদয়'। আলঙ্কারিকেরা এই সহৃদয়তার একটা মোটামুটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন— যাঁহার মন অবিরত কাব্য পাঠের দ্বারা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ তিনিই সহৃদয়।

সহৃদয় পাঠক নিজের হৃদয় দ্বারা কাব্যের রসাস্বাদ করিবেন। তাঁহার সমস্ত অন্তর দিয়া কাব্যের সজীবতাকে গ্রহণ করিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে :

আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ পায় তাহা শুধু প্রাণে।

ইহার চেয়ে অধিক সত্য কথা আর কিছুই হইতে পারেনা। কিন্তু তবুও বাস্তবজগৎ অতিমাত্রায় বিশ্লেষণবাদী। ভাল লাগিয়াছে বলিলেই চলিবে না, কেন ভাল লাগিয়াছে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অন্তর সায় দিলনা, তাই খারাপ

লাগিয়াছে—এইরূপ কোন অস্পষ্ট উক্তি দ্বারা রেহাই পাওয়া যায়না। জবাব-দিহি করিতে হয়—কোনখানে খারাপ লাগিয়াছে, কি হইলে আরও ভাল হইত।

তাই সমালোচকেরা কতগুলি বিশেষ ছকে ফেলিয়া কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হন। এখানে কবি ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য। কবি হৃদয়বৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হন, সমালোচক তাড়িত হন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা। কবি কিছুটা ভাবপ্রবণ। কিন্তু সমালোচক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন। একজন আস্বাদনপন্থী অপরজন বিশ্লেষণপন্থী।

এই বিশ্লেষণের আলোকেই কাব্যের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের নব মূল্যায়ন করেন সমালোচক। সাহিত্যের যাঁহারা রসপিপাসু পাঠক, তাঁহাদের হৃদয় দিয়া কাব্যের সরসতাকে আস্বাদন করিলেই চলে কিন্তু যাঁহারা সাহিত্যের ছাত্র তাঁহাদের ধর্ম সমালোচকের। তাঁহাদিগকে শুধু আস্বাদন করিলেই চলেনা, তাহাকে প্রকাশ করিতে শিখিতে হয়। তাই কাব্যবিশ্লেষণ তাহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কতগুলি প্রথাগত নিয়ম মানিয়া তাঁহাদের এই বিশ্লেষণের কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। বিজ্ঞানের ছাত্র যখন গবেষণাগারে প্রাণীবিদ্যা বা শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে কোন পরীক্ষা করে তখন কতগুলি সুসম্বদ্ধ নিয়ম মানিয়া তাহাকে পরীক্ষার কার্যে অগ্রসর হইতে হয়। সাহিত্যের ছাত্রকেও তেমনই কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে কতগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় এবং তাহার পরীক্ষা বা বিশ্লেষণের ফলাফলকে লিপিবদ্ধ করিতে হয়।

'আবর্তন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া'। রূপ ও ভাবের এই ক্রমাবর্তন ও সার্থক সমীকরণের ফলেই সার্থক কাব্যের জন্ম। কোন কাব্যের কেবলমাত্র idea বা ভাব মহৎ হইলেই তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিব না। যতক্ষণ না তাহার রূপ (ছন্দ, ভাষা ও প্রকাশশৈলী, ইংরাজীতে যাহাকে বলিব style) ঐ ভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত হইয়া উঠিবে ততক্ষণ রূপের দিক হইতে কাব্যের একটা দৈন্য থাকিয়া যাইবে।

বাঙ্গলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' বিহারীলালের কাব্যে উচ্চ ভাবের কোনদিনই অভাব ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিহারীলালের কবিতাগুলি

অল্পকালের মধ্যেই পুরাতন হইয়া গেল তাহার রূপের দৈন্যের জন্য। বিহারীলালের প্রকাশভঙ্গি, তাঁহার ভাষা ও ছন্দ ঠিক কবিতার 'idea'-র সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে নাই।

আবার সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার কবিতায় এক অভিনব রূপকল্পনা উপস্থাপিত। তাঁহার ছন্দ মাধুর্য, তাঁহার শব্দচয়ন ও গঠনচাতুর্য বাঙ্গলা কাব্যজগতের এক নূতন দিগন্তকে খুলিয়া দিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (১)। কিন্তু তাঁহার কাব্যের 'idea' গভীর নয়। তিনি ভাবতারল্যের কবি। বস্তুর গভীরে তিনি কখনও প্রবেশ করেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য বিচারকের দৃষ্টিতে ত্রুটিমুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই।

কাব্যের আত্মা যে ধ্বনি ইহা সুদীর্ঘ অন্বেষা ও তুমুল বাদানুবাদের পর স্বীকৃত সত্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কাব্যবিচারে তাই রীতি এবং অলঙ্কারের কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা নাই। অলঙ্কারকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিলে 'মেঘদূত'-কে খারিজ করিয়া 'ভট্টিকাব্যম্'-কে প্রথম পুরস্কার দিতে হয়। আর 'রীতি'-কে প্রাধান্য দিলে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার বদলে আধুনিক কবিকুলের অনেকের গলাতেই জয়মাল্য পরাইতে হয়।

কিন্তু তাহাতে 'প্রগতিশীল' প্রবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইলেও সংবেদনশীল রসিক মনের পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই কাব্যবিচারের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সমালোচককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে :—

(ক) কাব্যাংশের ভাববস্তু :—প্রথমে দেখিতে হইবে গোটা কাব্যটির (বা কাব্যাংশটির) 'idea' বা ভাববস্তু কি? তাহা কি বক্তব্য বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, না তাহাতে কোনরূপ রসব্যঞ্জনা আছে? অথবা তাহাতে বস্তু-অলঙ্কার বা বক্রোক্তির রমণীয়তা সৃষ্টি হইয়াছে কি না।

(খ) ভাষা :—অলঙ্কৃত না অনলঙ্কৃত। অলঙ্কার থাকিলে দেখিতে হইবে কোন ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করা হইয়াছে এবং এই অলঙ্কার প্রয়োগ

---

(১) অবশ্য তাঁহার শব্দচয়ন ও শব্দগঠন সব সময় ত্রুটিমুক্ত নয়। তবু মোটামুটি ভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দচয়নের দ্বারা কাব্যের রসমাধুর্য ফুটাইয়া তুলিতে তাঁহার জুড়ি মিলেনা।

কাব্যটিকে শ্রুতিমধুর করিতে সাহায্য করিয়াছে কতটুকু (১)? গীতিকবিতার ভাষা হইবে শ্রুতিমধুর এবং সূক্ষ্মব্যঞ্জনধর্মী।

(গ) ছন্দ :—কাব্যটিতে কোন্ ছন্দ ব্যবহার করা হইয়াছে? দেখিতে হইবে ছন্দরীতি ভাবের অধীন হইয়াছে কিনা। ছন্দ যদি ভাবকে ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে কাব্যটিতে দোষ ঘটিবে। সর্বশেষে দেখিতে হইবে, যে ভাবটি প্রকাশ করা হইতেছে ছন্দ সেই ভাব প্রকাশের উপযোগী হইয়াছে কিনা। এবং দেখিতে হইবে ছন্দরীতির দিক দিয়া কাব্যটিতে কোন দোষ আছে কি না।

(ঘ) গুণধর্ম অনুসারে কাব্যকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, প্রসাদগুণ, মাধুর্যগুণ ও ওজোগুণ। অনলঙ্কৃত ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষার কবিতা প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ। ভারতচন্দ্র, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে এই প্রসাদগুণ সমৃদ্ধ। গীতিকবিতার ভাষাকে মাধুর্য-গুণ-সমৃদ্ধ হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গীতিকবিতা এবং বৈষ্ণবপদাবলীর ভাষার এই মাধুর্যগুণ আছে। অলঙ্কৃত বীররসোদ্দীপক গুরুগম্ভীর ভাষাকে ওজোগুণসম্পন্ন বলা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা এই গুণসম্পন্ন। দেখিতে হইবে আলোচ্য কাব্য কোন্ গুণসম্পন্ন

(ঙ) ভাব ও রসের দিক হইতে কাব্যটিকে কোন ভাগে ফেলা যাইবে। সম্ভব হইলে আলম্বন বিভাব ও স্থায়ীভাব উল্লেখ করিতে হইবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি নিম্নলিখিত কবিতাটিতে প্রয়োগ করিয়া দেখাইলে কাব্যবিচারের রীতি পদ্ধতি ও বিচার সম্পর্কীয় ধারণাটি সুস্পষ্ট হইতে পারে :—

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত; প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে; বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার,
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ্ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া—ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি

(১) অনেক সময় কাব্যে অলঙ্কার এবং বক্রোক্তিরও ব্যঞ্জনা থাকে। এ ব্যঞ্জনাকে অনেক সময় রসব্যঞ্জনা বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা। রসব্যঞ্জনা সর্বদাই এই সমস্ত নিরপেক্ষ।

কল্পনা বিকার তার শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে; লজ্জিত দেবতা তারে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

নারী ভোগবিলাসের সামগ্রী নহে। নারী শুধু নর্মসহচরী নহে। সে কঠিন কর্তব্য পথে পুরুষের যাত্রাসহচরী। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ের মিলনেই বিশ্বপ্রকৃতি সার্থক, সুন্দর ও সম্পূর্ণ। তাই নারীর সত্যকার প্রেম পুরুষকে বিচিত্র ছলনা জালে কখনই মোহমুগ্ধ করিয়া রাখেনা বরং তাহা পুরুষকে বিচিত্র সম্মানে ভূষিত করে। নারীর প্রেম পুরুষের চক্ষে মোহিনী অঞ্জন ধরাইয়া তাহাকে রূপ ও যৌবনের অন্ধ স্তাবকে পর্যবসিত করিয়া তোলেনা। বরং এই প্রেম তাহাকে নবজীবনের পথে কঠিন কর্তব্যভারে উদ্বোধিত করে। নারীর এই প্রেম যেমন বলিষ্ঠ যেমন অরুগ্ন, তেমনই এই প্রেম যাহার প্রতি বর্ষিত হইবে তাহাকেও এই সুস্থ প্রেমের মর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে।

শ্লথপ্রাণ দুর্বল প্রেমিকের ক্লেদঘন চাটুবাক্যে ভীরু প্রেম নিবেদন সবলা মহীয়সী নারীর কাছে এক দুঃসহ স্পর্ধা বলিয়া বোধহয়। ঘৃণ্য লালসার কলুষ-কুণ্ঠিত দৃষ্টি সে কখনই সহ্য করিতে পারে না। এই বীর্যই নারীত্বের গৌরব।

আলোচ্য কবিতাটিতে উপরিউক্ত ভাবনাই ব্যঞ্জনাধ্বনিময় শব্দ গ্রন্থনার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কাব্যের আত্মা ধ্বনি। রসের ব্যঞ্জনাই এই ধ্বনিকে সার্থক করিয়া তোলে। আলোচ্য কবিতাটিতে এই রসধ্বনি সার্থকরূপে প্রযুক্ত হইয়া কবিতাটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কোন এক সবলা নারীর সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন স্বগতোক্তি এই কাব্যটির বিষয়বস্তু হইলেও নারীত্বের মহান আদর্শ এবং সুস্থ ও সবল প্রেমের বন্ধনহীন মহিমাময় রূপটি বাচ্যার্থকে ছাড়াইয়া পাঠকের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির ভাষা লঘুধ্বনিময় তৎসম প্রধান। অলঙ্কার খুব বেশী ব্যবহার করা হয় নাই, (১) দুয়েক জায়গায় রূপকের কিছু কিছু

(১) অনলঙ্কৃত ভাষা কোনক্রমেই কাব্যের দোষ নহে। বরং তাহার মধ্য দিয়া যদি ধ্বনি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে কাব্যটি প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ হয়।

আভাস আছে মাত্র। প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হইলেও কবিতাটির সুরের মাঝে গীতিকাব্যের এক সূক্ষ্ম আমেজ পাওয়া যায়।

ছন্দের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলা যায় কবিতাটি সনেটকল্প। সনেটের কঠিন বন্ধন ও সুসম্বদ্ধতার একটি সুস্পষ্ট আভাস কবিতাটির মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। প্রবহমান মহাপয়ারের ছন্দে কবিতাটি রচিত।

কবিতাটি ওজোগুণসমৃদ্ধ। তবে এই ওজোগুণকে ছাপাইয়া কবিতাটির মাধুর্যগুণ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির স্থায়ীভাব ক্রোধ এবং তার রস-পরিণতি রৌদ্র রস।

রূপ ও ভাবের যথার্থ সামঞ্জস্য, শব্দ ও অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ নৈপুণ্য, সুনিপুণ ছন্দ কৌশল, বক্তব্যের ঋজুতা ও সর্বোপরি প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা কবিতাটিকে এক অলৌকিক সৌন্দর্যসুধায় রসমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

নাটক ও নাটকীয়ত্ব

ইংরাজীতে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে 'A nation is known by its theatre'—রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের অবস্থা দেখিয়াই একটি জাতির মর্মবাণীকে উপলব্ধি করা যায়। একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, তাহার স্বপ্ন, জাতির রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। শুধু তাহাই নয় সমস্ত সৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি এবং এই রস পাঠকের মনে অলৌকিক আনন্দের সন্ধান আনিয়া দেয়। নাট্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাহাই—দর্শকের আনন্দ বিধান। রঙ্গমঞ্চে যখন নাটকের পাত্র পাত্রীরা বাস্তব জীবনের কোন ঘটনাকে যথাযথভাবে বা রূপকের সাহায্যে উপস্থাপিত করে তখন দর্শক-চিত্ত এক অলৌকিক আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাট্য-কাহিনীর মধ্যে দর্শকেরা তাহাদের নিজের জীবনেরই প্রতিরূপ দেখিতে পায়। বেদনায় তাহারা কখনও বিগলিত হয়, কৌতুকহাস্যে কখনও বা ফাটিয়া পড়ে, কখনও বা প্রবল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এই বিস্ময়, হাসি-অশ্রু চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে যতই পরিবর্তিত করুক না কেন এ সকলেরই রস পরিণতি হইল অলৌকিক আনন্দ। এই আনন্দ আছে বলিয়াই নাটক যুগ যুগ ধরিয়া এত জনপ্রিয়। রসিক চিত্তে রঙ্গমঞ্চের আবেদন তাই যুগে যুগে আজিও অম্লান রহিয়াছে।

নাটকের উৎস—কবে কোন বিস্মৃত অতীতে নাটকের জন্ম হইয়াছিল আহার সঠিক বিবরণ আজও জানা যায় না। নৃত্য এবং সঙ্গীতকেই নাটকের প্রথম পর্যায় বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে অনার্য সম্প্রদায় নৃত্য গীত-বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিল। আর্যগণ ধীরে ধীরে অনার্যদের এই নৃত্য-গীতকে নিজেদের সমাজে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই নৃত্য-গীত-বাদ্যের সহিত সংলাপ যোজনা করিয়া ইহাকে নাট্যরূপ দান করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা প্রভৃতি সূক্ত-গুলিকেই ভারতীয় নাটকের আদি উৎস বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। উপনিষদের অন্তর্গত যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণের কথোপকথনের মধ্যেও এইরূপ নাটকের আদি বীজ অনুসন্ধান করা যায়।

অভিনেয়তাই নাটকের প্রধান গুণ। নাটক শুধু লিখিত হইলেই চলিবে না। তাহা অভিনীত হইতেও হইবে। প্রথম ভারতীয় নাটক কবে কোথায় অভিনীত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না; তবে পুরাণে আছে এইরূপ নাট্যপ্রচেষ্টার প্রথম অবতারণা যেখানে হইয়াছিল সেটি এই মাটি ও মানুষের পৃথিবী নহে—সেটি দেবলোক। অসুরগণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেবগণ এক অভিনব উপায়ে বিজয়োৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একস্থানে ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া তাহারই নিকটে দেবাসুর-যুদ্ধের-অনুকরণ করিয়া কয়েকটি দৃশ্যের অভিনয় করিলেন। অভিনয়ের প্রথমে মঙ্গল-সূচক শ্লোক আবৃত্তি করা হইল। এই শ্লোকটি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন মহামুনি ভরত। অভিনয়ের সময় অসুররাও উপস্থিত ছিল। তাহারা নিজেদের পরাজয় দৃশ্য অভিনীত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। তখন ইন্দ্র তাঁহার ধ্বজা দিয়া অসুরদিগকে প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিয়া ফেলিলেন। তখন হইতেই ইন্দ্রধ্বজের নাম হইয়াছিল জর্জর। তাহার পর হইতে 'জর্জর'ই প্রাচীন কালে অভিনয়ের পূর্বে পূজিত হইত।

ইহার পর ব্রহ্মার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ, সামবেদ হইতে সঙ্গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়কলা, অথর্ববেদ হইতে ভাব ও রস সংগ্রহ করিয়া নাট্য-

বেদ বা পঞ্চম বেদ নামে একটি নাট্যশাস্ত্র রচনা করিয়া ভরতমুনিকে ঐ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া একটি নাটক লিখিয়া নাটকটি প্রযোজনা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মার আদেশে ভরতমুনি অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সে অভিনয় সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল।

ইহার পর ভরতমুনি নূতন নাট্যশাস্ত্র লিখিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন। এই নাট্যশাস্ত্র শীঘ্রই ভরতের নাট্যশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। পরবর্তী যুগের সমস্ত নাটকই ভরতের নাট্যশাস্ত্র দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

রামায়ণ-মহাভারত সৃষ্টির পূর্ব হইতেই যে নাট্যসৃষ্টির কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের বহু প্রাচীন গ্রন্থে এবং রামায়ণ-মহাভারতে নাটক এবং নাট্যাভিনয়ের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ভাষায় অফুরন্ত নাটকের সৃষ্টি হইতে থাকে এবং ক্রমে নাট্যাভিনয় ও রঙ্গালয় সমাজ জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে আপনার স্থান করিয়া নিতে সমর্থ হয়।

ইউরোপীয় নাটকের আদি উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন গ্রীসদেশেই ইউরোপীয় নাটকের জন্মভূমি। প্রাচীন গ্রীস সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, বৈদগ্ধ্যে ইউরোপের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এই বিদগ্ধ গ্রীকগণের জীবনে সংস্কৃতি ও কৃষ্টির একটি ধারা তাঁহাদের নাটক ও নাট্যশালার মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃত ইংরাজী নাটকের জন্ম আরও অর্বাচীন কালে। এলিজাবেথীয় যুগ হইতেই ইংরাজী নাটকের শুরু। লাতিন, গ্রীক এবং ইটালীর ক্লাসিক্যাল নাট্যাদর্শ অবলম্বন করিয়া ইংরাজী নাটকের সূচনা করিয়াছিলেন মহামতি সেক্সপীয়র। অবশ্য সেক্সপীয়র তাঁহার পূর্বসূরীদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার নাটক স্ব-মহিমায় বিশেষ ভাবে প্রোজ্জ্বল। শুধু তাহাই নহে সেক্সপীয়র বহুক্ষেত্রে তাঁহার নাটকে নিজস্ব শিল্পরীতির প্রবর্তনা করিয়া ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত করিয়াছেন। সেক্সপীয়রের পরে অষ্টাদশ শতকে শেরিডন ও গোল্ডস্মিথ নাটক রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই ইংরাজী নাট্যসাহিত্যে বাস্তবতা ও স্বভাব-ধর্মিতার ধারাটি প্রবর্তিত হইয়া পৃথিবীর নাট্যজগতে এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি

করিয়াছে। গলস্‌ওয়ার্দি, বার্ণার্ডশ ও অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি যুগান্তকারী নাট্যকারবৃন্দের রচনায় সমাজ, জীবন ও সমস্যা এবং সেইসঙ্গে তাহার সমাধানের ইঙ্গিতও ঘটনার সুঠাম বিন্যাসে তাঁহাদের নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে। অবশ্য ইঁহাদের নাটকে নরওয়ের নাট্যকার ইবসেনের যথেষ্ট প্রভাব রহিয়াছে।

বাঙ্গলা নাটক আরও অর্বাচীনকালের। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে মাত্র তাহার জন্ম। বাঙ্গলা ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন তিনি বাঙ্গালী নন—জাতিতে রুশ, নাম তাঁহার হেরেসিম লেবেডফ। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সেই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। তবে ইহা মৌলিক নাটক ছিলনা। প্রথম মৌলিক বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল সর্বস্ব' নাটকই বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম সামাজিক নাটক এবং সেই সঙ্গে মৌলিক নাটক। অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে বাঙ্গলা নাটক সম্পূর্ণই ইংরাজী নাটকের আদর্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নাটকের সংজ্ঞা—নাটকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া একজন সংস্কৃত নাট্যকার বলিয়াছেন— 'অবস্থানানুকৃতি নাট্যম্'। কিন্তু কেবল মাত্র অবস্থানের অনুকৃতিই নাটক নহে, নাটকের প্রকৃত সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। নাটক শুধুমাত্র যাহা ঘটে তাহার অন্ধ অনুকরণ নয় (কোন সৎ সাহিত্যই বস্তুর অন্ধ অনুকৃতি হইতে পারে না)। নাটক জীবনের মূল্যায়ন—জীবনের প্রকৃত সমালোচনা। নাটক বাস্তব জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি কান্নাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে সত্য। কিন্তু বাস্তব জীবনের সত্য যখন নাটকে বর্ণিত হয় তখন তাহার বস্তুরসকে ছাপাইয়া সাহিত্যরসের অনির্বচনীয় সৌন্দর্যমহিমাটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 'Drama is the creation and representation of life in terms of theatre',— নাটক তাই জীবনের অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। নাটক যদি অন্ধ অনুকরণ হইত তাহা হইলে দর্শকেরা কখনও নাটক হইতে অনির্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ পাইত না। নাটকে যাহা দেখাইতে হয় তাহা বড় করিয়াই দেখাইতে হয়। জীবনের অসম্পূর্ণতাকে নাটকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হয়। জীবনের ক্ষুদ্র অসঙ্গতি নাটকে হয় চাপা দিতে হয় অথবা বড় করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়। ফুলের যে বাস্তব প্রয়োজন তাহা ফলের জন্য। বর্ণ-গন্ধহীন হইলেও ফল ধারণের পক্ষে তাহার কোন অসুবিধাই হয় না। কিন্তু মৌমাছি আর সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে গেলে ফুলকে একটু অতিরিক্ত বস্তু আহরণ করিতে হয়।

বিচিত্র বর্ণে গন্ধে তাহাকে নিত্য নব শোভায় নিজেকে মেলিয়া ধরিতে হয়। আর্টের সহিত বাস্তবের সম্পর্কটা ঠিক এইরূপ। নিতান্ত বস্তুগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বস্তুর যে-কোন একটা রূপ হইলেই চলিয়া যায়। কিন্তু রস পিপাসুর অন্তরে প্রবেশ লাভের যখন তাহার ইচ্ছা জাগে তখন বস্তুকে সৌন্দর্য শোভায় প্রসাধিত না হইলে চলে না। তবে এই প্রসাধনের অর্থ বাস্তবের আত্মবিলোপ নয়—আত্মপ্রসারণ। নাটক আর্টের একটি উচ্চ অঙ্গ, তাহাতে মহৎ আর্টের স্বভাবধর্মের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটান উচিত হইবে না।

তবে বিরুদ্ধ-মতবাদীরাও আছেন। তাঁহারা বলেন—'the show on stage must reproduce the forms of the things represented—nor more —nor less.' জীবনের যথাসম্ভব অনুকৃতিই সৎ নাটকের ধর্ম। সাহিত্যে যদি Objectivity বা তন্ময়তার স্থান কোথাও থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কাব্য ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে, নাটকের ক্ষেত্রে নয়। নাটকের এই উদ্দেশ্য ও শিল্পরীতি সম্পর্কে দ্বন্দ্ব আজিও অব্যাহত রহিয়াছে এবং ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা এক ভিন্ন জীবন দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে।

নাটকের আদর্শ—নাটক হুবহু বাস্তবের অনুকৃতি নহে কিন্তু তাহাকে বাস্তব বলিয়া ভুল হওয়া স্বাভাবিক। নাট্যকার তাঁহার নাটকে ঘটনা সংস্থাপন ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া বাস্তবতার ভ্রান্তির (illusion of reality) সৃষ্টি করেন। ফলে ক্ষণ কালের জন্য রঙ্গমঞ্চের পাত্র পাত্রীদিগকে আমাদের অতি পরিচিত পৃথিবীর মানুষ বলিয়া বোধ হয়। অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগে না। কার্যকারণ সম্পর্কের চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে আমরা ভুলিয়া যাই। পাদ প্রদীপের সম্মুখের বিচিত্র মানুষগুলিকে আমাদের পরম আত্মীয় ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিনা। এই ক্ষণকালের জন্য মনের সকল অবিশ্বাস ও সন্দেহকে আমরা নির্বাসিত করিয়া দিই। এই 'temporary suspension of disbelief'-ই সৎ নাটকের ধর্ম। 'The Development of Dramatic Art' নামক গ্রন্থে Stuart তাই বলিয়াছেন :—

> Drama is more than imitation. A portrait is an imitation and artistic likeness. Drama is an artistic illusion although it is not a perfect illusion of reality by which we are entirely deceived.

আঙ্গিক বা শিল্পরীতির দিক দিয়া নাটকের চারিটি অঙ্গ আছে। সে অঙ্গ চারিটি হইল—কাহিনী, চরিত্র, ঘটনাসমাবেশ ও সংলাপ। কাহিনী নাটকের প্রাণ। একটী সুন্দর প্রতিমা গড়িতে হইলে যেমন ভাল কাঠামো গড়িবার প্রয়োজন হয়, তেমনই একটি ভাল নাটকের পক্ষে সুন্দর-সুবিন্যস্ত কাহিনীর প্রয়োজন হয়। কাহিনী যত রসসমৃদ্ধ হইবে নাটকের রসও তত ঘনীভূত হইয়া উঠিবে।

এই কাহিনীর উপস্থাপন নাটকীয় হওয়া চাই এবং অবান্তর ঘটনাকে বাদ দিয়া ইহাদের মধ্যে মূল ঘটনাই কাহিনীর উপজীব্য হওয়া চাই। কাহিনী ঘটনা-বহুল হইতে পারে তবে তাহা সুসম্বদ্ধ হওয়া চাই এবং এমন ভাবে সুবিন্যস্ত হওয়া চাই যে নাট্যকার পরিণতি অংশে সমস্ত ঘটনা জালকে একত্র করিয়া তুলিতে পারেন। সেক্সপীয়রের অধিকাংশ নাটকই ঘটনা বহুল এবং মূল কাহিনীর পাশা-পাশি তাঁহার নাটকে উপ-কাহিনীও (Sub-plot) প্রচলিত আছে। কিন্তু এই সকল উপকাহিনীগুলি মূল কাহিনীর সহিত সুদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত এবং সবের উপরে নাট্যকারের বজ্রমুষ্টিতে সমস্ত কাহিনী নিয়ন্ত্রিত।

তবে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নাট্যাদর্শেরও পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বের মত নাটকের কাহিনী অংশে সুবিপুল ঘটনা জালের বিন্যাস আধুনিক নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যুগ ও জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাটকেও বাহিরের ঘটনাকে ক্ষুদ্র করিয়া সমস্ত সংগ্রামটাকে মনের ভিতর আনিয়া কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। তাই আধুনিক অনেক নাটকে ঘটনার বহুমুখিতা অপেক্ষা একমুখিতা, বিচিত্র চাঞ্চল্য অপেক্ষা বাহিরের প্রশান্তিটাই উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে।

নাটকে কাহিনী অপেক্ষা চরিত্র সৃষ্টির দাবী যে সর্বাধিক এবং মূল্যবান তাহা কয়েকজন নাট্য সমালোচক অকপটভাবে বলিয়া গিয়াছেন। হাডসন্ বলিতেছেন,

> In theatrical work story, incident and situation should be only another phase of the development of character... characterisation in really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work.

নাটক বর্ণনীয় নহে দর্শনীয়। পাত্র পাত্রীর কথপোকথনের মধ্য দিয়াই নাটকের কাহিনী আগাইয়া চলে রস পরিণতির দিকে। সুতরাং নাটকের সাফল্য নির্ভর করিবে চরিত্র সৃষ্টির উপর। নাট্যকার যে ভাবে তাঁহার চরিত্র-গুলির মুখে সংলাপ দিয়া তাহাদিগকে চালিত করিবেন কাহিনীও সেই অনুপাতে

চলিবে, চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নাট্যকার ইচ্ছা করিলে কাহিনীকে খুশীমত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। নাট্যকার যখন কোন ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক রচনা করেন, তখন পুরাণ কিংবা ইতিহাস হইতে তিনি তাঁহার কাহিনী সংগ্রহ করেন সত্য কিন্তু তিনি পুরাণ বা ইতিহাসের ততটুকু অংশকেই গ্রহণ করেন যতটুকু তাঁহার চরিত্রগুলির বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। ক্ষীরোদ প্রসাদের 'ভীষ্ম' নাটকটি মহাভারতের অমর কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভীষ্মের জীবনের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিকে প্রতিফলিত করিবার জন্য কাহিনীর যেটুকু প্রয়োজন, বিশাল মহাভারতের বিপুল ঘটনাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া মাত্র সেই ঘটনাটুকুই ঐ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। তেমনই ঐতিহাসিক নাটকেও কেবল মাত্র চরিত্র বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐতিহাসিক ঘটনার মাঝেও অনেক কাল্পনিকতার আশ্রয় লইতে হয়। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্সপীয়র, বাঙ্গলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি পড়িলে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

আবার আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে চরিত্র সৃষ্টিই নাটকের যে শ্রেষ্ঠ উপাদান তাহা প্রমাণিত হইবে। সার্থক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমেই নাট্যকার সকলের মাঝে অমরতা লাভ করেন। 'তোরাপ', 'নিমচাঁদ' প্রভৃতির মত চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই দীনবন্ধুকে পাঠকসাধারণ এখনও মনে রাখিয়াছেন। 'প্রফুল্ল' নাটকের কাহিনী অংশ কি তাহা হয়ত অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু 'যোগেশ'কে সকলেরই মনে আছে। তেমনই মনে আছে 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'করিম চাচা'কে আবার আধুনিক কালের নাটকের 'মানস' ও 'নীহারিকা'কে। নাট্যকারের হাতের সার্থক চিত্রণ-কৌশলের গুণেই এই সকল চরিত্রগুলি আজও অমর হইয়া রহিয়াছে।

সার্থক চরিত্রসৃষ্টি যেমন নাটকের পক্ষে বড় কথা তেমনই সেই চরিত্রগুলি কোনমতেই যথার্থ বিকাশলাভ করিতে পারে না যদি না তাহাদের সংলাপ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। বলিষ্ঠ সংলাপই একটি অমর নাট্যসৃষ্টির পক্ষে অন্যতম সহায়ক। বলিষ্ঠ সংলাপ অর্থে তাহাকে যে দীর্ঘ হইতে কিংবা অলঙ্কৃত হইতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। বরং দীর্ঘ সংলাপ নাটকের পক্ষে একটি দোষ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সংলাপের দীর্ঘতার বদলে অর্থঘন সংক্ষিপ্তি, কাব্যময়তার পরিবর্তে প্রকাশভঙ্গির ঋজুতাই সৎ নাটকের

কাম্য। আধুনিক নাট্যকলাবিধিতে চরিত্রানুযায়ী সংলাপের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে। নাটকে যদি প্রাকৃত ও ইতরজনের কোন চরিত্র থাকে তাহা হইলে কাব্যময় সাধুভাষা বা ভদ্র নাগরিক ভাষার পরিবর্তে ইতর-জনের ভাষা বলিলেই চরিত্র প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে যেখানে সাধারণ মানুষের মুখে প্রচলিত গ্রাম্যভাষা দেওয়া হইয়াছে সেখানে এই শ্রেণীর চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভদ্র চরিত্রগুলির বেলা দীনবন্ধু প্রচলিত ভাষাদর্শের উপরে উঠিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাদের মুখে শুদ্ধ সাধুভাষা বসাইয়াছেন। ইহার জন্যই সেই চরিত্রগুলি বহুলাংশে প্রাণহীন হইয়াছে। পৌরাণিক ও কিছু কিছু ঐতি-হাসিক নাটকে পূর্বে কাব্যচ্ছন্দে দীর্ঘ সংলাপ দেওয়া হইত। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে পাত্র-পাত্রীর মুখে এই কাব্যময় সংলাপ চরিত্রের বাস্তবতা ও নাটকীয় রসকে ক্ষুণ্ণ করিয়া নাটককে অতি-নাটকের কোঠায় পৌছাইয়া দেয়। এইজন্য আধুনিক নাটকে সংলাপের ভাষা সরল হইয়াছে, সংক্ষিপ্ত হইয়াছে ও ব্যঞ্জনাধর্মী হইয়াছে। দর্শককে নাটকের সংলাপই সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে। নাটক যতক্ষণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় দর্শকচিত্তে ততক্ষণই তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কিন্তু নাটক শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যত সময় যায় নাটকের কাহিনী অংশ দর্শকচিত্তে ততই অস্পষ্ট হইয়া আসিতে থাকে। অথচ নাটকের কিছু কিছু সংলাপ অংশ দর্শকদিগকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রবাদের স্থান অধিকার করিয়া আছে এমন দৃষ্টান্তের অভাবে নাই। হ্যামলেটের কাহিনী অংশের স্মৃতি দর্শক চিত্তে আজ বিলীয়মান হইয়াছে কিন্তু হ্যামলেটের 'to be or not be' কথাটি বা 'As you like it'-এর জেক্‌সের 'All the world is a stage…' ইত্যাদি সংলাপ বহুল প্রচলিত প্রবাদে পরিণত হইয়া এখনও সকলের মুখে মুখে ঘুরিতেছে। তেমনই 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল', অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতনের সেই গান 'আবার তোরা মানুষ হ' যুগ যুগ ধরিয়া দর্শকের স্মৃতিতে চিরজাগ্রত রহিয়াছে।

কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টি ছাড়াও নাটকের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ঘটনাসমাবেশ। জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচিত হইতে পারে। উপন্যাসে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সুপ্রচুর অবকাশ আছে। কিন্তু

নাটকে তাহা নাই। জীবনের অসংখ্য উপাদান হইতে কেবলমাত্র নাটকীয় মুহূর্তগুলিকেই নাটকে গ্রথিত করিতে হয়।

অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাকে বাদ দিয়া একমাত্র যে ঘটনা নাটকীয় গতিকে প্রখর করিয়া তুলিতে সাহায্য করে তাহাকেই নাটকে স্থান দিতে হয়। তাহার উপর পরিবেশ সৃষ্টির উপরেও নাটকের সাফল্য নির্ভর করে। নাটক যখন অভিনীত হয় তখন পাত্র-পাত্রীদের পোষাক পরিচ্ছদ, দৃশ্য সংস্থাপন, আবহসঙ্গীত, আলোকসম্পাত ইত্যাদির মাধ্যমে নাটকীয় পরিবেশটি ঘনীভূত করিয়া তুলিতে হয়। Worsfold এই জন্য বলিয়াছেন—

> The drama is therefore, a composite art in which the author, the actor and the stage manager all combine to produce tha total effect.

গঠনভঙ্গি—কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও ঘটনাসংস্থান যেমন নাট্যসৃষ্টির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য, তেমনই সংঘাত, গতি ও চমৎকারিত্ব হইল নাটকের সার্থকতার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। ইংরাজী conflict শব্দটিরই অর্থ বাঙ্গলায় সংঘাত বা দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব ব্যতীত নাটক হইতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব পাত্র-পাত্রীর অন্তরেরও হইতে পারে বা বাহিরেরও হইতে পারে। চরিত্রের সহিত চরিত্রের, মনের সহিত মনের, ব্যক্তির সহিত নিয়তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে সংঘাত তাহাই বাহিরের সংঘাত। প্রাচীন গ্রীক নাটক এবং আমাদের দেশের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকগুলি এইরূপ দ্বন্দ্বাশ্রয়ী ছিল। এলিজাবেথীয় যুগ হইতে সর্বপ্রথম বাহিরের সমস্ত ঘটনাকে মনের ভিতর কেন্দ্রীভূত করিবার প্রচেষ্টা দেখা দিয়াছিল। আধুনিক নাটকগুলিতে এই অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

ঘটনাবলী ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নির্ঝরিণীর মত প্রবাহিত হইয়া পরিণতির দিকে আগাইয়া চলার নামই নাটকীয় গতি বা action. এই action-ই নাটকের প্রাণ। 'An play is an action sir, action; not confounded philosophy'. অবশ্য আধুনিক নাটকে এই নাটকীয় গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া উহার অন্তরের philosophy-ই বড় হইয়া উঠিয়াছে।

এই গতিবেগ ও সংঘাতের সমীকরণেই নাটকীয় চমৎকারিত্বের সৃষ্টি

হয়। নাটক দেখিয়া দর্শক তৃপ্তি ও অলৌকিক আনন্দ লাভ করে।

•নাটকীয় ঐক্য—নাটক প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গেলেই নাটকীয় ঐক্যের (dramatic unities) কথা আসিয়া পড়ে। প্রাচীনপন্থী নাট্যকারগণ মনে করিতেন যে কোন সৎ নাটকের পক্ষে তিনটি ঐক্য মানিয়া চলা একান্ত প্রয়োজনীয়। নাটকীয় ঐক্য বলিতে তাঁহারা বলিতে চাহিতেছেন :

(১) সময়ের ঐক্য (unity of time)। নাটকীয় আখ্যানভাগ রঙ্গমঞ্চে দেখাইতে যতক্ষণ সময় লাগে, বাস্তব জীবনে সংঘটিত হইতে ঠিক যাহাতে ততক্ষণই লাগে এদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। এরিষ্টটল বলিয়াছেন, এক সূর্যোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত যতটুকু সময় অতিবাহিত হইবে ঠিক ততটুকু সময়ের মধ্যে যাহা ঘটা সম্ভব তাহা নাটকে দেখাইতে হইবে। কিন্তু একমাত্র একাঙ্কিকা নাটক ছাড়া কোন নাটকেই এই ঐক্য মানিয়া চলা সম্ভবপর নয়। সেক্সপীয়রের নাট্য সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র 'Tempest' ও 'Comedy of Error' নাটকে এই আদর্শ মানিয়া চলা হইয়াছে।

(২) স্থানের ঐক্য (unity of space)। নাটকে এমন কোন স্থানের উল্লেখ থাকিতে পারে না, যেখানে নাট্য-নির্দেশিত সময়ের মধ্যে নাটকের পাত্রপাত্রীর যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। পৌরাণিক নাটকে এই স্থানের অনৈক্য দেখা যায়। এই নির্দেশও নাটকে সব সময় মানিয়া চলা সম্ভব নয়।

(৩) ঘটনার ঐক্য (unity of action)। নাটকে এমন কোন দৃশ্য বা চরিত্রের উপস্থাপনা থাকিবেনা যাহাতে নাটকের মধ্যে কোনরূপ বৈসাদৃশ্য ও অসঙ্গতি থাকিতে পারে। এই ঘটনার ঐক্য সমস্ত নাট্যকারেরা মানিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ঐক্যগুলি মানা সম্ভব না হইলেও কেবলমাত্র ঘটনার ঐক্যের গুণেই যে নাটক সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে তাহার বহু প্রমাণ বহু বিখ্যাত নাটকে পাওয়া গিয়াছে।

স্তরবিন্যাস—উৎস হইতে মোহনা পর্যন্ত একটি নদীর ধারাপ্রবাহের মধ্যে যেমন কয়েকটি স্তর বিভাগ আছে, শুরু হইতে যবনিকা পর্যন্ত একটি নাটকের মধ্যেও সেইরূপ কতগুলি স্তর (stage) আছে।

নাটক একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠে এবং সেই ঘটনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে ভাবে বিন্যস্ত হয় তাহাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্য এই ধারা বিন্যাসের নামকরণ পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় নাটকে বিভিন্ন। কিন্তু তাহাদের বিষয় বিন্যাস প্রায়ই এক প্রকার।

ইংরাজি নাট্যশাস্ত্রে পাঁচটি স্তরের উল্লেখ আছে। এই পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়াই নাটকীয় ঘটনা রসনিষ্পত্তি লাভ করে। সে স্তরগুলি হইল (১) সংঘর্ষের সূত্রপাত (Exposition বা Initial incident), (২) সংঘর্ষের ক্রমব্যাপ্তি (Rising action), (৩) ক্রমোন্নতি বা চূড়ান্ত সংঘর্ষ (climax)—এই অবস্থায় দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি প্রবল। ফলাফল অনিশ্চিত। (৪) গতির নিম্নমুখিতা (Falling Action)—এই অবস্থায় প্রবল শক্তির জয় ঘোষণা। 'ম্যাকবেথ' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ম্যাকবেথের সহিত নিয়তির সংঘর্ষে নিয়তির জয় শুরু হইয়াছে। ম্যাকবেথ ক্রমশঃ ব্যর্থতার হীন পঙ্কে নামিয়া যাইতেছেন। এই অংশেই নাটকের falling action, (৫) যবনিকা বা 'Catastrophy' বা Conclusion—এই অংশে সকল সংঘর্ষের অবসান।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে নাটকের এই পাঁচটি স্তরকে পঞ্চসন্ধি নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি। শুধু তাহাই নহে তাঁহাদের মতে একটি নাটকে থাকিবে :—

(ক) বিলাস—(বিচিত্র গতি ও সস্মিত বাক্য)

(খ) ঋদ্ধি—(ধৈর্য ও গাম্ভীর্য)

(গ) বিভূতি - (সুখ ও দুঃখজাত নানা প্রকার স্থায়ী, সঞ্চারী ও ব্যভিচারীভাব)

নাটকের শ্রেণীবিভাগ—নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা খুব সহজসাধ্য নয়। প্রতি মুহূর্তেই অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেকে নাটককে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিয়া থাকেন—ট্র্যাজেডি ও কমেডি। কিন্তু ইংরেজ সমালোচক মৌলটন ট্র্যাজেডি ও কমেডি বিভাগ ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ট্র্যাজেডি ও কমেডির বাহিরেও আরও নাটক আছে। তাঁহার 'The Ancient classical Drama' গ্রন্থে মৌলটন দেখাইয়াছেন একটি নাটকে Tragedy-র বেদনা ও Comedy-র আনন্দ অবিমিশ্রভাবেই থাকিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সেক্সপীয়রের 'Merchant of Venice" এবং 'King Lear'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তবে অনেকে নাটককে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করিয়াছেন। তাহা হইল (ক) রসপ্রধান নাটক (ট্র্যাজেডি, কমেডি, মেলোড্রামা ও ফার্স) (খ) ভাবপ্রধান (ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক ও বাস্তব) (গ) রূপপ্রধান (গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য) (ঘ) উদ্দেশ্যপ্রধান (সমস্যামূলক নাটক, রূপক নাটক ও চরিত নাটক)

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মধ্যে নাট্যসৃষ্টি সর্বাপেক্ষা কঠিনতম প্রয়াস। নাট্যকারকে প্রতি পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' ঔপন্যাসিক ও কবির মত নাট্যকার নাটক রচনা করিতে পারেন না। নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিরপেক্ষতা তাঁহার একটি প্রধান গুণ। নাট্যকারকে সর্বদাই নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি পাপীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিবেন না, পুণ্যবানকেও তিনি পুরস্কৃত করিবেন না। যাহা ঘটনাসঙ্গত, যাহা ঘটিতেছে তাহাই তিনি বর্ণনা করিবেন। এই নিরপেক্ষ, তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের জন্যই সৎ উপন্যাস ও কাব্যের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৎ নাট্য প্রচেষ্টা সমতালে আগাইয়া চলিতে পারে না।

আর জাতীয় জীবন কর্মমুখর না হইয়া উঠিলে, বিচিত্র অভিজ্ঞতা না ঘটিলে, জীবন ও সমাজ ঘাতপ্রতিঘাতে গতিশীলতা অর্জন না করিলে কোন দেশেই সার্থক নাটকের সৃষ্টি হইতে পারে না।

যুদ্ধোত্তর উৎকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে তুমুল আলোড়ন আসিয়াছে তাহা বিভিন্ন জাতিকে নব নব নাট্য সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে। এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনা লইয়া সুরু হইয়াছে বিশ্বের নব নাট্য আন্দোলন।

ট্র্যাজেডি

ট্র্যাজেডি কোন মহৎ জীবনের মর্মন্তুদ বিনষ্টির কাহিনী। মানুষের জীবনের মাঝেই ট্র্যাজেডির বীজ সুগোপনে সুপ্ত হইয়া আছে। কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে এবং বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করে। মানুষ প্রেয়কে লাভ করিবার জন্য শ্রেয়কে হেলায় ত্যাগ করিয়া বসে, তাহার পর প্রেয় ও শ্রেয় এই উভয়কেই হারাইয়া নিদারুণ হাহাকারের মধ্যে জীবনের অবসান ঘটায়। অথবা বাঁচিয়া থাকিলেও চরম রিক্ততার অন্ধকারের মধ্যে সে বাঁচা মরার অধিক অভিসম্পাত বহন করিয়া আনে। খ্যাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার একটি কবিতায় ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন তাহাতে ট্র্যাজেডির উপরিউক্ত রূপটাই প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে :—

"দেবতা দোসর বীর, তারি পরাজয় কথা,
সে হৃদয় সাগর মন্থন ;
নীলাকাশে উষাসম গরলে অমৃতরাগ
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন কাহিনী"

এই দেবতা দোসর বীরের জীবন সংগ্রামে পরাজয় ও তাহার মৃত্যুঞ্জয়ী অমর জীবন কাহিনীই ট্র্যাজেডির মূল উপজীব্য। অবশ্য এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিরই স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্লাসিক্যাল যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির রূপ ও রেখার ঘটিয়াছে দীর্ঘ পরিবর্তন। এই ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাসটি আমাদের প্রবন্ধের মধ্যে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রাচীন গ্রীক নাটকই ট্র্যাজেডির আদি উৎস। গ্রীকগণ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই নিয়তিবাদী ছিলেন। এই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী নিয়তি যে মানুষের জীবনকে দুঃসহ দ্বন্দ্বে দোলায়িত করিয়া তোলে, মানুষের লীলাক্ষেত্রকে সে যে মুখরিত করিয়া তোলে অট্টবিদ্রূপে, শ্রেয়কে করে দুর্মূল্য, কৃপা করেনা কৃপাপাত্রকে এ বিষয়ে তাঁহারা অবহিত ছিলেন। তাই নিয়তির দুর্বার অভিশাপে দেবমানুষের লাঞ্ছনার ইতিহাস—পুরুষকারের শোচনীয় অপমানের কথা তাঁহারা ট্র্যাজেডিতে দেখাইয়া গিয়াছেন। এই নিয়তির নামকরণ তাঁহারা করিয়াছেন'Nemesis.'

ট্র্যাজেডি আঘাতে আঘাতে বেদনার সৃষ্টি করে মানব জীবনে। তাই ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি করুণ রস। কিন্তু শুধু করুণ রস হইলেই চলিবে না ট্র্যাজেডির আবেদন হইবে গাম্ভীর্যপূর্ণ (serious) এবং দর্শকের মনে যে সঞ্চারী ও ব্যভিচারীভাবের সৃষ্টি হইবে তাহার মধ্যে 'ভীতি' হইবে প্রধান। তাই এককথায় বলা যাইতে পারে ট্র্যাজেডি হইল 'ভয়ানক-মিশ্রিত করুণ রসাত্মক কাব্য।' এরিষ্টটল বলিয়াছেন,

> Tragedy is the representation of an action, which is serious, complete in itself, and a creation of limited length, it is expressed in a speech made beautiful in different ways in different parts of the play, it is acted not merely recited ; and by exciting pity and fear it gives a healthy outlet to such emotions.

এরিষ্টটলের সংজ্ঞানুসারে ট্র্যাজেডি জীবনেরই ক্রিয়াশীল রূপ। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই 'রূপ' প্রতিভাত হইয়া উঠে। আর নাট্টিক ঘটনাবস্তু সুগভীর ও পূর্ণবলয়িত আকারে ট্র্যাজেডিতে প্রকাশ পায়। ট্র্যাজেডি সর্বদাই ঘটনাত্মক, বর্ণনাত্মক নহে। বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রতিভাত হইয়া সমুদ্রগামী নদীর ন্যায় উপসংহার বা পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহাই ট্র্যাজেডির ধর্ম।

ট্র্যাজিডির রস করুণ হইলেও ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য কিন্তু দর্শককে আনন্দ দেওয়া। সমস্ত দিনের ক্লান্তির শেষে দর্শক যখন রঙ্গালয়ে প্রবেশ করে তখন রঙ্গালয়ে অভিনীত কোন বিয়োগাত্মক নাটকের নায়কের দুঃখ দেখিয়া সে হয়ত কাঁদিয়া ভাসায়। কিন্তু তাঁহার কান্নার অন্তরালে তাঁহার অবচেতন মনে আছে আনন্দের ফল্গুধারা। ট্র্যাজেডির এই আনন্দ সূক্ষ্ম ও গভীর। মঞ্চে অভিনীত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রুর মধ্যে মানুষ তাহার নিজের জীবনের সুখ-দুঃখেরই প্রতিফলন দেখিতে পায়। তাহার মনে জাগে এক বেদনা বা আনন্দ যাহা তাহারই অথচ যেন তাহারও নহে। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যাহাকে বলিয়াছেন 'মমেতি ন মমেতি চ'। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের দুঃখে, মানবতার চরম অপমানে, পুরুষকারের দুর্বার পরাজয়ে মানুষ চোখের জল ফেলিয়া এই অনাবিল আনন্দ লাভ করিয়া আসিয়াছে। সীতার দুঃখে দর্শক কাঁদিয়া ভাসায়, কর্ণের পরাজয়ে দর্শকের হৃদয়ে বেদনার প্লাবন কোন বাধা মানিতে চাহেনা। তাহার কারণ,

'করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥'

করুণ প্রভৃতি রসে যে মনে পরম সুখ জন্মায় তাহার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি।

Abercrombie তাই বলিয়াছেন যে চরম বেদনার মুহূর্তেও ট্র্যাজেডি আমাদিগের পরিতুষ্টি সাধন করে—Tragedy satisfies us even in the moment of distressing.

এই আনন্দ, এই পরিতুষ্টি সাধনের একটি বৈজ্ঞানিক নামকরণ এরিষ্টটল করিয়াছেন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন Cathersis বা ভাব মোক্ষণ, তাঁহার মতে 'Tragedy's function is to purge away our excess emotions'.

কোন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে যেমন দেহে বিষ প্রবেশ করাইয়া বিষ দূর করিতে হয়, তেমনই সামান্য পরিমাণে বাহিরের করুণা ও ভীতিকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অন্তরের গ্লানিকে পরিশোধিত করে ট্র্যাজেডি। এই পরিশোধনেই ভাবমোক্ষণ। অন্তরের অতিরিক্ত ভাবাবেগগুলিকে সংহত করিয়া জীবনের দুঃখ বেদনা ও মালিন্যের মাঝে আনন্দের অনির্বাণ বাণী বহন করিয়া আনিয়া জীবনের সার্থক মূল্যায়ন ঘটানোই তাই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। এরিষ্টটল বলেন, কোন লোকের দেহে রক্তাধিক্য ঘটিলে ডাক্তারগণ তাহার রক্ত কিয়ৎপরিমাণ বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহাকে নিরাময় করেন। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। মানুষের উদ্গত অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্লেদ-গ্লানি বাহির হইয়া আসে। বুকের ভার অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি টেনিসনের 'Home they brought their warrior dead' কবিতায় সৈনিক স্বামীর মৃত্যুতে বেদনাহত নির্বাক নিস্পন্দ স্ত্রীর কাহিনীটি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী বেদনায় হতবাক। তাহার চক্ষে এক ফোঁটা অশ্রু নাই। সমস্ত অশ্রু জমাট বাঁধিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। সকলেই বলিলেন যে অশ্রুপাত না করিলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এমন সময় একজন আসিয়া মৃত সৈনিকটির একমাত্র শিশুপুত্রটিকে তাহার কোলে ফেলিয়া দিল। এইবার স্ত্রীলোকটির উদ্গত অশ্রু আর বাধা মানিল না। দীর্ঘ নিদাঘের পর আষাঢ়ের অবিশ্রান্ত ধারাপাত নামিয়া আসিল তাহার দুই চক্ষে। এই শিশুটির জন্যই তাহাকে শুধু বাঁচিয়া থাকিতে হইবে।

এই কাহিনীটি এই স্থলে উপস্থাপিত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যে, অশ্রুপাতের মধ্য দিয়া জীবন সম্পর্কে আমাদের গড়িয়া তোলা অন্ধ আক্রোশ ও হতাশাকে যে মুহূর্তের মধ্যে চুরমার করিয়া ফেলি তাহা দেখানো। অশ্রুপাতের শেষে আমাদের মানসিক অবস্থাকে বর্ষণশেষের রৌদ্রোজ্জ্বল শুচিসুন্দর শারদ প্রকৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ট্র্যাজেডির এই মাধুর্যই আমাদিগকে গৃহকোণ হইতে বার বার রঙ্গালয়ের পানে লইয়া যায়। আমরা অঝোরে কাঁদিয়া ভাসাই কিন্তু যখন রঙ্গালয় হইতে বাহির হই তখন মনের মাঝে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দের সন্ধান পাই, আমরা বলি-'কী সুন্দর'! শেলী তাই বলেন :

Our sweetest songs are those
That tell of our saddest thought.

সক্রেটিশ ইহাকে বলেন—we smile through our tears.

ট্র্যাজেডি এই কথাটির বাঙ্গলা প্রতিশব্দ করা হইয়াছে বিয়োগান্ত। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি করুণ রসই ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি। মৃত্যু না থাক অন্তত একটি না একটি অশুভ ঘটনা বা বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়া ট্র্যাজেডির যবনিকা নামিয়া আসিবে। ইহাই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা। অধ্যাপক এফ. এল. লুকাস ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা আরও ব্যাপক। তাঁহার মতে ট্র্যাজেডির অন্তরালে বিষাদের আনন্দময় স্বরূপটি প্রতিভাত—

> Tragedy...is a representation of human unhappiness which pleases us notwithstanding, by the truth with which it is seen and the skill with which it is communicated...It is man's answer to the universe that crushes him so pitilessly.

ট্র্যাজেডি বলিলেই আসে ট্র্যাজিক হিরো বা ট্র্যাজেডির নায়কের কথা। নায়কের জীবনের মধ্যেই ট্র্যাজেডির বীজ সুপ্ত হইয়া থাকে। এই নায়ক জীবনে প্রভূত যশের অধিকারী হইতে পারেন। ধনে-মানে, প্রতিপত্তিতে তিনি অমিতবিক্রমশালী হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের কোথাও না কোথাও এক দুর্বলতা নিহিত থাকে। এই দুর্বলতার রন্ধ্রপথ দিয়া তাঁহার দেহে শনির প্রবেশ ঘটে। সমুজ্জ্বল নীলাকাশ দেখিতে দেখিতে ঝড়ের কৃষ্ণমেঘে ছাইয়া যায়।

সেক্সপীয়রের সুবিখ্যাত ট্র্যাজিক হিরো ম্যাকবেথের চরিত্রটি বিশ্লেষণ করিলে ট্র্যাজেডির নায়কের এই শোচনীয় পরিণামটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। গ্রন্থারম্ভের প্রথমে আমরা যে ম্যাকবেথের পরিচয় পাই, সে ম্যাকবেথ ধীরোদাত্ত বীররূপে উপস্থাপিত। তাঁহার বীরত্বে রাজা ডানকান্ হইতে শুরু করিয়া স্কটল্যাণ্ডের সামান্য সৈনিক পর্যন্ত বিস্ময়মুগ্ধ। তাঁহার যশ সৌরভ দিক হইতে দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই ম্যাকবেথের জীবনে চরম সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে শোচনীয় পতন নামিয়া আসিয়াছিল। এই পতনের জন্য দায়ী কে?—তাঁহার স্ত্রী। না ডাকিনীদের ভবিষ্যৎ বাণী, না তাঁহার দুর্বার নিয়তি?

আপাতদৃষ্টিতে উহাদের একটিকে বা সমগ্রভাবে উহাদের মিলিত শক্তিকে তাঁহার পতনের জন্ম দায়ী করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহারা আসল কারণ নয়। ম্যাকবেথের জীবনের ট্র্যাজেডি তাঁহার চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। ম্যাকবেথের জীবনে ট্র্যাজেডির কারণ তাঁহার চরিত্রের মধ্যে দুর্বার উচ্চাকাঙ্ক্ষা (ambition), তাঁহার অন্ধ কুসংস্কার (ডাকিনীদের ভবিষ্যৎ বাণীতে আস্থা স্থাপন, তাঁহার এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তিরই কারণ) ও তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনোবৃত্তি। এইগুলি তাঁহার চরিত্রেরই অন্তর্নিহিত অপগুণ। এই ছিদ্রপথ দিয়াই অধঃপতনের রাহু আসিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অনর্থক রক্তপাতে প্ররোচিত করিয়াছে। অবশেষে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চরম হতাশায় জর্জরিত হইয়া তিনি বলিয়াছেন, 'জীবন একটা মূর্খের দ্বারা কথিত অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।' ট্র্যাজিক হিরোর সংজ্ঞা দিতে গিয়া তাই এরিষ্টটল বলিয়াছেন :—

> He falls from a position of lofty emminence and the disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to so great error of frailty.

বর্তমানে ট্র্যাজিক হিরোর সম্পর্কে এই ক্ল্যাসিক্যাল ধারাটির অবশ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নায়ক চরিত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ছাড়াও কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক ঘটনার চাপে পড়িয়া যে নায়কের জীবনে ট্র্যাজেডি নামিয়া আসিতে পারে, এ ধারণাটি আধুনিক কালের নাট্যরীতিতে প্রবর্তিত হইয়াছে। আর ট্র্যাজেডির এই বিবর্তন যাঁহার রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তিনি হইলেন নাট্যগুরু ইবসেন।

ইবসেনের নাটকে দেখা গিয়াছে যে, সমাজ সংসারের বিরূপতা ও উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপস্থিতির জন্ম সুন্দর-সুস্থ জীবনের উপর অকস্মাৎ কালরাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার সুবিখ্যাত নাটক দুইটি 'Enemy of the People', এবং 'Doll's House'-এর কথাই ধরা যাক। প্রথমটির নায়ক ডাঃ স্টকম্যান্ সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আজীবন তিনি তাঁহার কলোনীবাসীর উন্নতির জন্ম কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্বান, পরোপকারী, নির্ভীক এবং দয়ালু। স্ত্রী ও পুত্র কন্যা লইয়া একটি সুখী পরিবারের কর্তৃত্বপদে আমরা তাঁহাকে নাটকের প্রথমে দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শহরের মেয়র তাঁহার এই প্রতিপত্তিবৃদ্ধিতে আশঙ্কিত। তাহার উপর শহরের জল সরবরাহ সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতির কথা

যখন ডাঃ স্টকম্যান সত্যের খাতিরে তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া জনসাধারণকে জানাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বার্থে স্বভাবতই আঘাত লাগিল। ডাঃ স্টকম্যানের বিরুদ্ধে ইহার পর তিনি যে চক্রান্ত শুরু করিলেন তাহা ঘৃণ্য এবং বর্বরতাপূর্ণ। এই চক্রান্তের জালে জড়িত হইয়া ডাঃ স্টকম্যান সমাজ হইতে বয়কট হইলেন এবং দেশবন্ধু ডাঃ স্টকম্যান রূপান্তরিত হইলেন দেশের শত্রুরূপে। এই নাটকে ডাঃ স্টকম্যানের জীবনের ট্র্যাজেডি দেখাইতে গিয়া নাট্যকার দেখাইয়াছেন তথাকথিত গণতন্ত্রের বিকৃতরূপ। জীবনপথে সার্থক ভাবে চলার মন্ত্রই হইল একলা চলার বাণী।

ইবসেনের 'Doll's House'-এর নায়িকা নোরার জীবনেও ট্র্যাজেডি নামিয়া আসিয়াছে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে। যে পতির সুখের জন্য লাস্যময়ী নোরা সব কিছুকেই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, একদিন নিদারুণ হাহাকারের মধ্য দিয়া সেই নোরা উপলব্ধি করিয়াছে যে স্বামী আর তাহাকে ভালবাসেনা। তাহার জীবনের এই ট্র্যাজেডির জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই সে নয়। কারণ তাহার নিষ্কলুষ জীবনে পাপের কোন স্পর্শতো নাই-ই, উপরন্তু যে অপাপবিদ্ধ প্রেম নারীর সর্ব খর্বতারে দহন করিয়া তাহাকে এক পরম শুচিতার আসনে সমাসীন করায়—নোরা সেই বিজয়িনী প্রেমের অধিকারিণী। বাহিরের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীই নোরার জীবনে এই ট্র্যাজেডিকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

এই ধরণের ট্র্যাজেডিকেই নাট্যজ্ঞরা 'Tragedy of incident' আখ্যা দিয়াছেন। আর নায়কের চরিত্রের মধ্যেই যে ট্র্যাজেডির বীজ নিহিত থাকে, তাহাকে আখ্যাত করা হইয়াছে 'Tragedy of Character' (যেমন ম্যাকবেথ, ওথেলো প্রভৃতি)। দুইটি বাঙ্গলা নাটকের উদাহরণ দিলে 'Tragedy of Incident'টি আরও সুপরিস্ফুট হইবে। এই দুইটি নাটক গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' এবং দ্বিজেন্দ্র লালের 'সীতা।'

'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের জীবনে কি চরম অভিসম্পাত নামিয়া আসিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। যে পুষ্পোদ্যান একদা যোগেশ আন্তরিকতা, শ্রম আর অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা এক লহমায় শুকাইয়া গিয়াছে। যোগেশের চরিত্রকে কিন্তু তাহার পতনের জন্য দায়ী করা যায় না। যোগেশ মদ্যপ ছিল একথা সত্য এবং তাহার পানাসক্তি তাহাকে অধঃপতনের আরও গভীরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে এ কথাও সত্য

কিন্তু তাহার জীবনের ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইয়াছে আরও আগে। তাহার নির্বিঘ্ন নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার উপর ব্যাঙ্ক ফেলের সংবাদ যেদিন সর্বপ্রথম আসিয়া প্রবেশ করিল সেই দিনই সে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর একে একে ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতা,. ভ্রাতৃজায়ার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, মাতার মস্তিষ্ক বিকৃতি তাহাকে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে ঠেলিয়া দিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির নিকট সে অসহায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' নাটকেও সীতার জীবনে ট্র্যাজেডি নামিয়া আসিয়াছে ঠিক এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে। সীতা সাধ্বী রমণী। তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার সতীত্ব, তাঁহার চরিত্র মাধুর্য নিঃসন্দেহে কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু একমাত্র প্রতিকূল ঘটনার চাপে পড়িয়া এই অপাপবিদ্ধা নারীকে বার বার বেদনার অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এমনকি নাটকের শেষ দৃশ্যে সে দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে যেই স্বামীর স্পর্শলাভ করিয়াছে, অমনই কোথা হইতে দুর্বার নিয়তি ভূমিকম্পের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাঁহাকে চির-জনমের মত প্রিয়তম হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে।

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি করুণ রস। এই করুণ রস নায়কের মৃত্যু হইতে উদ্ভূত হইবে, সেক্সপীয়রের যুগ পর্যন্ত ইহাই ছিল নাট্যকারদের ধারণা। কিন্তু মৃত্যুতেই যে ট্র্যাজেডি নয় এই ধারণা সাম্প্রতিক কালে বদ্ধমূল হইয়াছে। জীবনের চরম প্রাপ্তির আনন্দের মাঝে যখন আসন্ন বিচ্ছেদের হাহাকারের সুরটি বড় হইয়া উঠে তখনই জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। মহাভারতের ট্র্যাজেডি কর্ণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে নয় বা মহাপ্রস্থানের পথে একে একে চার পাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মৃত্যুতে নয়— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বিজয়ের পর চরম প্রাপ্তির পর যখন পাণ্ডবেরা এক অসীম শূন্যতার মধ্যে উপলব্ধি করিলেন যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিয়া তাঁহারা রাজ্য পাইয়াছেন বটে, কিন্তু এ রাজ্যসুখ ভোগ করিবার জন্য মাত্র কয়টি প্রাণী ছাড়া আর কেহই জীবিত নাই, তখনই ট্র্যাজেডি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য চতুর্দশ দিবসব্যাপী অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীকে বুকের রক্ত দান করিতে হইয়াছে সে উদ্দেশ্য যখন সিদ্ধ হইল তখন তাঁহারা গভীর বেদনার সহিত উপলব্ধি করিলেন যে এই প্রাপ্তি তাঁহাদের নিকট এক সর্বনাশা অভিশাপের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছে। তাই রাজ্যত্যাগ করিয়া পঞ্চপাণ্ডবকে মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রী হইতে হইল। এইখানেই সমগ্র মহাভারতের ট্র্যাজেডি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে মবারক-জেবউন্নিসার প্রণয়কাহিনীর মাঝে এই ট্র্যাজেডির অন্তর স্বরূপটি ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। মবারকের জীবনের ট্র্যাজেডিটি তাহার আত্মদানের মাঝে ততখানি নিহিত নয়—যতখানি নিহিত জেবউন্নিসার সহিত তাহার পুনর্মিলনের ঘটনাটিতে।

মৃত্যুর সীমানা পার হইয়া মবারক অন্ধকার উদয়সাগরের তীরে তাহার প্রিয়তমাকে ফিরিয়া পাইয়াছে। যে জেবউন্নিসার কাছে প্রেমের দেবতা একদিন পূজার পরিবর্তে তাহার জরিজহরৎ বিজড়িত চরণের আঘাত পাইয়াছিল, সেই দেবতার চরণে অভাগিনী জেবউন্নিসা এতদিন ধরিয়া আপনার মাথা খুঁড়িয়া মরিয়াছে। প্রেমের একান্ত স্বরূপটি জেবউন্নিসা যখন আপন হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে, প্রেম যখন রাজনন্দিনীর সমস্ত দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের আসনে সমাসীন করাইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তেই সে আপন দয়িতকে ফিরিয়া পাইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই মিলনই তাহাদের জীবনের বেদনার দুঃখকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। মিলনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে মৃত্যুপিপাসু মবারকের মনেও ক্ষণকালের জন্য সন্দেহ জাগিয়াছে—মরিব, না মরিব না। কিন্তু কোথা হইতে দুর্বার নিয়তির মত সেই অন্ধকার উদয়সাগরের তীরে সহস্র দীপালোকের পার হইতে দরিয়ার ছায়ামূর্তিটি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এইবার আর মবারকের মনে কোন সন্দেহ নাই। তাহার কণ্ঠে আমরা প্রাপ্তির চরম লগ্নে যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার ভাষাকে অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরাইয়া উঠিতে শুনিয়াছি—'ইয়া আল্লা আমাকে মরিতেই হইবে'। ইহা অপেক্ষা জীবনে চরম ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে।

বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত ফেনিল ঢেউ কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু 'গৃহদাহ'-এর অচলার তো মৃত্যু হয় নাই। তবু বাঁচিয়া থাকাই কি মৃত্যুর অধিক জ্বালা অচলার জীবনে আনে নাই? গৃহ শুধু সুরেশ ও মহিমের দগ্ধ হয় নাই,—গৃহদাহ অচলারও হইয়াছে। অভাগিনী অচলা একদিকে স্বামী, অপর দিকে স্বামীর বন্ধু এই উভয়ের কাহাকে সে জীবনে বরণ করিবে, সারা জীবন ধরিয়া এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও তাহা ঠিক করিতে পারে নাই। সে দুইজনের যে কোন একজনকে বরণ করিয়া যতবার গৃহ রচনা করিতে চাহিয়াছে ততবারই তাহার সে গৃহ ব্যর্থতার আগুনে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করে নাই বটে, কিন্তু জীবন্মৃত

হইয়া চরম অপ্রাপ্তির মধ্যে আশাহত হইয়া বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুর অধিক।

আবার মৃত্যুর ঘনঘটা অনেক সময় ট্র্যাজিক অনুভূতিকে নষ্ট করিয়া দেয়। বেহালায় করুণ সুরের মূর্ছনা তুলিতে হইলে তাহার সুরটিকে স্বভাবতই কোমল করিতে হয়—চড়া সুরে করুণ আবহাওয়াটি জমিয়া উঠে না। ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রেও তাই লেখক বা নাট্যকারকে রচনার সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এতটুকু এদিক ওদিক হইলে চলে না।

ইহার উপর অতিরিক্ত মৃত্যু, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের মনের করুণ ভাবটিকে দূরীভূত করিয়া দেয়। নির্জন নিস্তব্ধ গৃহে মানুষের অসহায় মৃত্যুর দৃশ্য দর্শক সাধারণের হৃদয়কে যেরূপ দ্রবীভূত করে—মহাশ্মশানে মৃত্যুর মিছিল দেখিয়া মানুষের মন সেইরূপ দ্রবীভূত হয় না। গভীর নিস্তব্ধ রাত্রিতে গুপ্তঘাতকের হস্তে কোন সৎ চরিত্র সর্বগুণসম্পন্ন মানুষের হত্যা দেখিলে আমরা কাঁদিয়া ভাসাই। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে অবিরাম মৃত্যুলীলা চলিতেছে সেখানে মানুষের হত্যাকাণ্ড আমাদের মনে ততখানি সাড়া জাগায় না। তাই ডানকানের হত্যা দৃশ্যে বা সীজরের হত্যাকাণ্ডের ফলে দর্শক সাধারণের চক্ষু যেরূপ অশ্রু বিগলিত হইয়া উঠে, এরিখ মারিয়া রেমার্কের বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস 'All quiet on the western front'-এর চিত্ররূপের মাঝে যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের অবিরাম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য দেখি, তখন যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের মন এক বিরূপতায় ভরিয়া উঠিলেও ঠিক ততখানি বেদনায় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে না।

এই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর বিভীষিকা দ্বারা করুণ রস সৃষ্টি করিতে চাহিলে দর্শকের মনে আসে এক নিদারুণ ভীতি। এই জাতীয় ট্র্যাজেডিকে সমালোচকেরা বলিয়াছেন :—Horror tragedy. অধ্যাপক নিকল এই ধরণের ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বলেন :—

> It (Horror tragedy) stands apart in having all or most of the stress on the outward elements with whatsoever there may be inner tragedy closely interwoven with and descending upon the stage sensationalism.

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি ঠিক যথার্থ ট্র্যাজেডি না হইবার ইহাই অন্যতম কারণ। নীলদর্পণের পরিণতি অংশে মৃত্যুর ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে। গোলোক বসু মরিয়াছে, ক্ষেত্রমণি মরিয়াছে, সরলা প্রাণ দিয়াছে,

উন্মত্ত সাবিত্রীর জীবনেও অবশেষে মৃত্যু নামিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর এই মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া দর্শকগণ অশ্রু বিসর্জনের আর অবকাশ পায় না। তাই তাহাদের অশ্রুধারা উদ্গত হইবার পূর্বেই জমাট বাঁধিয়া যায়। বেদনায় অভিভূত হইবার পূর্বে দর্শকরা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া যায়। জীবনের উপর নিয়তির এই দুর্লঙ্ঘ্য অভিশাপ নামিয়া আসিল কাহার পাপে?

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে একখানিও ট্র্যাজেডি নাই। তাহার কারণ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি। মানুষের জীবন যে পরম করুণাময় ঈশ্বরেরই একটি অভিপ্রকাশ এবং ঈশ্বর যাহা করেন তাহা মানবের মঙ্গলের জন্যই, এমন একটি বিশ্বাস ইহার পিছনে কাজ করিয়াছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে মানুষের জীবনে যাহা অশুভ বলিয়া বোধ হইতেছে তাহা পরিণামে শুভ ফলই দান করিবে, এই প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা মানুষের জীবনের অন্ধ নিয়তিবাদে (Evil Destiny) আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। আর যাহা তাঁহারা জীবনে মানিতে পারেন না, নাটকের মধ্য দিয়া তাহাকে সাধারণ্যে প্রচার করাও তাঁহারা গর্হিত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

তাই দেখিতে পাই ট্র্যাজেডির প্রচুর উপকরণ থাকা সত্ত্বেও 'উত্তররামচরিত' নাটকে ভবভূতি শেষ দৃশ্যে রামের সহিত সীতার মিলন ঘটাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সে মিলনকে স্থায়ী করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে যখন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাবপ্লাবন ও তাহার আদর্শবাদ বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে সংক্রমণ লাভ করিতে শুরু করিয়াছে তখনই বাঙ্গলা নাটকে সার্থক ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মহাকবি মধুসূদনই তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মধ্য দিয়া সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডির আদর্শকে বাঙ্গলা নাটকে উপস্থাপিত করিয়া এক নূতন যুগের সূত্রপাত করিলেন।

আজ ট্র্যাজেডি কথাটি এত জনপ্রিয় হইয়া গিয়াছে যে দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তার মধ্যে কোন অতি সাধারণ ব্যর্থতার কথা বলিতে হইলেও আমরা 'ট্র্যাজেডি' শব্দটি নিয়ত ব্যবহার করিয়া থাকি। ভাষা ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন:

……অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।

বেদনার মাঝে অলৌকিক আনন্দের এই ফল্গুধারা যুগ যুগান্তর ধরিয়া 'ট্র্যাজেডি' রসপিপাসু মানব হৃদয়ের কাছে উপস্থিত করিয়াছে। তাই ক্ল্যাসিক্যাল যুগ হইতে শুরু করিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বস্তুতান্ত্রিক সমাজ জীবনেও ট্র্যাজেডি মানুষের কাছে সমান প্রিয়।

কমেডি

কমেডি শব্দটির অর্থ হইল শুভান্ত বা মিলনান্ত। সাধারণতঃ জীবনের দুইটি রূপ—একটি হইল অবসাদ আর অবক্ষয়ের, অপরটি হইল আনন্দ ও প্রাচুর্যের। একদিকে জীবনের মর্মন্তুদ বিনষ্টি, অপরদিকে হাস্যে-লাস্যে-গানে-ছন্দে ভরা জীবনের নব নির্মিতি। জীবনের এই প্রথম দিকটাকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে ট্র্যাজেডি। আর শেষেরটিই কমেডির উপকরণ।

ট্র্যাজেডি ও কমেডি যেন একই জীবন-বোধের দুইটি ধারা। একটি সরু সূতা দিয়া উহারা পরস্পর বাঁধা। জীবনে অবিমিশ্র সুখ ও অবিমিশ্র দুঃখ নাই। অশ্রুর অন্তরালেও হাসির সুস্পষ্ট রেখা। আবার হাসির অধরেও অশ্রুর চরণ চিহ্ন।

জীবন ও জগতের অসঙ্গতির প্রাবল্য হইতেই কমেডির জন্ম। এই অসঙ্গতি কথার সহিত কার্যের, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে ট্র্যাজেডির মূলেও এই অসঙ্গতি। কামনার সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার, চাওয়ার সহিত পাওয়ার, আশার সহিত ফলাফলের যেখানে বিরাট অসঙ্গতি দেখা দেয় সেখানেই জীবনে ট্র্যাজেডি ঘনাইয়া আসে। তবে ট্র্যাজেডির সহিত কমেডির মৌল পার্থক্যটি হইল ট্র্যাজেডিতে যা অসঙ্গতি তাহা নায়কের জীবনের সহিত জগতের কিন্তু কমেডিতে যা অসঙ্গতি তাহা সাধারণ বিশ্ব সৃষ্টির। ম্যাক্‌বেথ চাহিতেছেন তাঁহার জীবনের উচ্চাশাকে পূরণ করিতে কিন্তু জগৎ সংসার তাঁহার প্রতিকূল। পরিণামে তাই স্কটল্যাণ্ডের নিরঙ্কুশ সিংহাসনের পরিবর্তে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার জীবনের এই যে ইচ্ছার সহিত ফলপ্রাপ্তির অসঙ্গতি ইহাকে অবলম্বন করিয়াই ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এই বিশ্ব সৃষ্টির অন্তরালে সৃষ্টিকর্তার কার্যের ভিতর এক দারুণ অসঙ্গতি আছে। তাঁহার বণ্টন কোথাও সমান নয়। তিনি কাহাকেও

স্থূলবুদ্ধি করিয়াছেন অথচ সে প্রখর বুদ্ধির দম্ভ করিতেছে, কূটবুদ্ধি ব্যক্তি কোথাও বা সারল্যের অভিনয় করিতেছে, মূর্খ করিতেছে পাণ্ডিত্যের প্রবল অভিমান। তাহাদের চরিত্রের এই পরস্পর বিরোধী অংশগুলি এক সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক করিয়া রাখিতেছে। কমেডি এই সমস্ত মানুষের জীবনকে লইয়াই রচিত। দূর হইতে দেখাইতে হয় বলিয়া কমেডিতে মানুষের এই অসঙ্গতিগুলি বড় করিয়া দেখাইতে হয়। নাট্যকার Ben Johnson তাঁহার কমেডিগুলিতে সৃষ্ট চরিত্রগুলির স্বভাব অতিরঞ্জিত করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। কমেডির মাতাল চরিত্র হয়ত সাধারণ মাতাল অপেক্ষা একটু বেশী অস্বাভাবিক। কমেডির পাওনাদার হয়ত সাধারণ পাওনাদার অপেক্ষা আরও একটু বেশী ভণ্ড। কার্টুনে আমরা এই বড় করিয়া দেখান অস্বাভাবিকতাটাই দেখিতে পাই। কোন ব্যক্তির নাকটা হয়ত অস্বাভাবিক লম্বা, কাহারও অবয়ব সংস্থানের ভিতর কোন সঙ্গতি নাই। সার্কাসের ক্লাউন তাই কদাকার। বিচিত্র বর্ণের পোশাক পরিচ্ছদ পরিয়া, মুখে অস্বাভাবিক পরিমাণে নানাপ্রকার রঙ মাখিয়া সে এই অসঙ্গতিটুকুকেই প্রবল মাত্রায় ফুটাইয়া তোলে। তবে এই অসঙ্গতি মানুষকে বেদনার্ত করিবার জন্য নহে। মানুষকে আনন্দ দিবার জন্য। এ আনন্দ দানের উদ্দেশ্য কখনও নিরঙ্কুশ হইতে পারে, কেবলমাত্র হাল্কা হাস্য রস সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই অসঙ্গতির প্রয়োগ হইতে পারে। আবার এই হাসির অন্তরালে প্রচলিত দেশাচার, সমাজ ও সভ্যতাকে বিদ্রূপ করাও ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে। এরিষ্টটল তাই কমেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

> A Comedy is an imitation of men worse than the average; worse however, not as regards any and every sort of fault but only as regards particular kind, the ridiculous which is a species of the ugly. The ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others,

সেই জন্যই কমেডির ফলশ্রুতি সর্বদাই হাস্যরস। কমেডির ফল সর্বদাই শুভ।

তবে ক্ল্যাসিক্যাল কমেডিগুলি অবিমিশ্র কোন শুভ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিত না। এই কমেডি গভীর দুঃখময় মর্মন্তুদ ঘটনার ভিতর দিয়া

শুরু হইত এবং শেষ হইত সুখময় ঘটনায়। এই জীবনে দুঃখটাই একমাত্র বড় জিনিষ নয়। দুঃখনিশার শেষে সুখের নূতন প্রভাতের স্বপ্ন যে এই জীবনেই সফল হইতে পারে, এই বোধ তাঁহাদের জীবন দৃষ্টিকে প্রভাবিত না করিয়া পারে নাই। দান্তে তাঁহার 'Divine Comedy' এক নারকীয় বীভৎসতার মধ্য দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্য দিয়া সে নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে। আমাদের দেশের ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' নাটকটির কথা ধরা যাইতে পারে। বেদনাদায়ক দৃশ্যের মধ্য দিয়া নাটকটি আরম্ভ না হইলেও নাটকটির মধ্যে ট্র্যাজিক উপকরণের কিছু অভাব নাই। কিন্তু নাটকের শেষ দৃশ্যে সমস্ত বেদনা আর্তি সব দূরীভূত হইয়া প্রেমের অনির্বচনীয় আনন্দঘন রূপটি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

সহানুভূতি ব্যতীত সৃষ্টি নাই। সহানুভূতিশীল ব্যক্তির অন্তর কখনও জীবনের বহিরঙ্গটা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। বাহিরের ঘটনার অন্তরালে সে বস্তুর অন্তর স্বরূপকে আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। তাই কমেডির চরিত্রগুলি জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হইলেও এই হাসির অন্তরালে তাহাদের জন্য বেদনা থাকিয়া যায়। এই হাস্যরসকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে এই হাসির অন্তরালে কত গভীর ব্যথার সুর প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। যে ব্যক্তিটি স্রষ্টিকর্তার তির্যক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য অন্তরে দুর্বার কামনা দ্বারা কোন কিছু একটাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে কিন্তু হয়ত দৈহিক বা মানসিক অপটুতার জন্য বার বার পিছু হটিতেছে, আপাতদৃষ্টিতে আমরা তাহার অসঙ্গত কার্যকলাপে হাসিয়া উঠিতেছি বটে কিন্তু হাসি শেষ হইলে আমরা অন্তরের অন্তস্থলে এই দুর্ভাগা ব্যক্তিটির জন্য অশ্রুপাত না করিয়া পারি না। যেখানে কমেডির ভিতর লেখকের কোনরূপ সহানুভূতি নাই, যে কমেডি সৃষ্টির মধ্যে জীবন দর্শনের বিরাট রূপটি অনায়ত্ত তাহা প্রহসন মাত্র। মহৎ কমেডি তাহা নহে।

গুণধর্ম অনুসারে সমালোচকগণ কমেডিকে কয়েক ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

(ক) যে নাটকের মধ্যে কবিত্ব ও কল্পনার উচ্ছল প্রকাশ, সমালোচকগণ তাহার নাম দিয়াছেন রোমান্টিক কমেডি। যেমন সেক্সপীয়রের 'Twelfth Night'.

(খ) যে কমেডিতে সমাজের নীতি, সভ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাকে সামাজিক কমেডি (Comedy of Manners)

বলে। বার্ণার্ড শয়ের 'Arms and the Man', রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন', দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী,' রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', প্রমথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ', 'পরিহাস বিজল্পিতম্' এই শ্রেণীভুক্ত।

(গ) যে কমেডিতে নাটকের কোন পাত্র-পাত্রীর বিরুদ্ধে তুমুল ষড়যন্ত্র হয় এবং পরিণামে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, তাহাকে চক্রান্তমূলক নাটক বা 'Comedy of Intrigue' বলে। Dryden-এর সুবিখ্যাত নাটক 'The Spanish Frair' এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

(ঘ) যে নাটকে ঘটনা সমাবেশ বা নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত অপেক্ষা নাটকীয় পাত্র-পাত্রীগণের সংলাপের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয় তাহাকে 'Comedy of Dialogue' বলে। সেক্সপীয়রের 'As you Like it' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

ট্র্যাজেডি সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে ট্র্যাজেডির করুণরস আমাদের হৃদয়ে রক্তমোক্ষণের কাজ করে। তাহা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্যকে দূর করিয়া দিয়া জীবন দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে, সুস্থ করে, সহানুভূতিপ্রবণ করে। কমেডির ফলশ্রুতিও এই একইরূপ। শ্রেষ্ঠ কমেডি আমাদের নিজেদের জীবনেরই একটি গ্লানিকর লজ্জাজনক ত্রুটিকে নাটকে উপস্থাপিত পাত্র-পাত্রীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলে।

এই ত্রুটি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেরও হইতে পারে, আবার জাতীয় জীবনেরও হইতে পারে। গোগোলের 'গভর্ণমেণ্ট ইনস্‌পেক্টর' নাটকে আমলাতন্ত্রের যে ঘৃণ্য স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে বা প্র, না, বি'র 'পরিহাস বিজল্পিতম্' নাটকে আমাদের সমাজের উপরের তলার লোক, যাহারা সমাজে যথেষ্ট সম্মানার্হ তাহাদের চরিত্রের দুর্বলতার যে বিরাট দিকটি উপস্থাপনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা হাসির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অজান্তে নিজেদিগকে সংশোধিত করিবার অনুপ্রেরণাও লাভ করি। যে আচরণ আমরা এতদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছি, যে সংস্কারের অন্ধপ্রাবল্যে আমরা এতদিন তাড়িত হইয়া আসিতেছি, তাহা যে কত হাস্যকর তাহা এক নিমিষে আমরা উপলব্ধি করি। তাই Molvolio যখন Olivia-র প্রেমস্বপ্নে উন্মাদ হইয়া উঠে, তখন আমাদের হাসি পায়। 'ঘটিরাম ডেপুটি'-র নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া আমরা হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব চরিত্রের মধ্যে দুর্বলতার অন্তর্নিহিত স্থান কোথায় এবং কিরূপ

আচরণ করিলে আমরা ব্যক্তিগত জীবন হইতে সে দুর্বলতাকে ঝাঁটাইয়া দূর করিয়া দিতে পারি তাহার সন্ধান আমরা পাইয়া থাকি।

অবশ্য সমস্ত কমেডিই যে এইরূপ সামাজিক চরিত্রের দীনতা শোধনে দর্শক সাধারণকে উদ্বোধিত করিবে তাহার কোন অর্থ নাই। বেন জনসন, গোগোল, বার্ণার্ড শয়ের কমেডির মত সেক্সপীয়রের কমেডিগুলি সমাজ ও সভ্যতার প্রতি কোনরূপ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে বিভূষিত হইয়া উঠে নাই। সেক্সপীয়রের কমেডিগুলি যেন কোন রোম্যাণ্টিক জগতের হাস্যে-লাস্যে ভরা শুভান্ত কাহিনী।

দর্শক চিত্তে অলৌকিক আনন্দের উপস্থাপনাই নাটকের লক্ষ্য। ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয়ই সে আনন্দের উপকরণ। তবে তাহাদের বহিরঙ্গের কিছুটা পার্থক্য। প্রথমটিতে বেদনার মধ্য দিয়া আনন্দের রসলোকে পাড়ি জমাইবার প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়টিতে আনন্দের মধ্য দিয়া বেদনার অমৃতকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

নাটক বিচার প্রসঙ্গে

'কাব্যবিচার' প্রসঙ্গে রসবিচারের প্রকৃত মাপকাঠি কি এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে কোন কোন বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত সে সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। নাটক বিচার প্রসঙ্গে আমরা নাট্যরসের আলোচনা করিয়া যথার্থ এবং সার্থক নাটকের পক্ষে কোন কোন গুণ থাকা অবশ্য কর্তব্য তাহা আলোচনা করিব।

নাটক ও উপন্যাস উভয়েরই প্রাণকেন্দ্র হইবে প্লট এবং চরিত্র। উপন্যাসে অবশ্য প্লট, চরিত্র চিত্রণ এবং উপযুক্ত ঘটনা সংস্থাপন থাকিলেই চলে। কিন্তু নাটকের পক্ষে আরও কয়েকটি অত্যাবশ্যক বস্তুর প্রয়োজন। তাহা হইল Dramatic action বা নাটিক ক্রিয়া, চরিত্রের conflict বা দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব হইতেও পারে আবার বহির্দ্বন্দ্বও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত অপর কতকগুলি বিষয়ের উপরও নাট্যকারের দৃষ্টি দিতে হয়। সেগুলি হইল,

(ক) সংলাপ : সংলাপ নাটকের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নাটক দৃশ্যকাব্য হইলেও তাহা শ্রবনীয়ও বটে। সুতরাং নাটকের সংলাপ যদি বলিষ্ঠ না হয়—তাহা হইলে নাট্যরস ব্যাহত হইতে বাধ্য। নাটকের পক্ষে সুদীর্ঘ সংলাপ নাটকীয় রস নিষ্পত্তির পথে অন্তরায়। সংলাপ দীর্ঘ হইলে তাহা আবেগ

প্রধান বা মেলোড্রামাটিক হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। দর্শকের পক্ষেও দীর্ঘ সংলাপ বিরক্তিকর। সংলাপের ভাষা কখনও অবান্তর হইবে না। যাহা নাটকীয় গতিকে আগাইয়া লইয়া যাইতে কিছুমাত্র সাহায্য করে না সেইরূপ সংলাপ সর্বদাই পরিত্যজ্য।

(খ) হাস্যরস: নাটকটি যদি হাস্যরসাত্মক হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে এই হাস্যরস কতখানি স্বাভাবিক এবং এই হাস্যরস নাটকটির উপর আরোপিত না নিহিত। অনেক সময় কেবলমাত্র dramatic relief দিবার জন্যে serious নাটকেও হাস্যরসের আমদানী করা হয়।

(গ) করুণরস বা Tragic sense: নাটকটি যদি করুণরসাত্মক হয় তাহা হইলে এই করুণরস Tragic কি Pathetic (১) তাহা বিচার করিতে হইবে। নাট্যাংশ দেওয়া থাকিলে অনেক সময় পুরা নাটকের গতি প্রকৃতি জানা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে হাস্য অথবা করুণ রসের প্রয়োগ কতখানি সার্থক হইয়াছে তাহা বিচার করিতে হইবে।

(ঘ) Climax বা চরমোন্নতি: পঞ্চসন্ধি অনুসারে নাটকের যেখানে climax বা চরমোন্নতি, গোটা নাটকের পক্ষে সে স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন নাটক বিচার করিতে গেলে এই পঞ্চসন্ধি ভাগ করিয়া দেখাইতে হইবে ইহার সংঘর্ষ বা চরমোন্নতি কোন দৃশ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। এমনকি একটি খণ্ড নাট্যাংশের মধ্যেও এমন এক একটি স্থান দেখা যায় যেখানে নাট্যাংশটির চূড়ান্ত সংঘর্ষ ঘটিয়াছে।

(ঙ) প্রতিটি নাটকে কোন না কোন নায়ক থাকে। নাটকের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নায়কের চরিত্র সেই অনুযায়ী কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহার বিচার করিতে হয়। নাট্যাংশের মধ্যেও দেখা যায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে একটি চরিত্র বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। এই কেন্দ্রস্থ চরিত্র কোন্‌টি তাহা সমালোচককে বিচার করিতে হয়।

(চ) গান: নাটকের গান একটি অঙ্গ। গানগুলি যথাযথ বিন্যস্ত হইয়াছে কি-না এবং তাহা স্থানপোযোগী হইয়াছে কি-না তাহা বিচার করিতে হয়।

(ছ) নাট্যাংশটির স্থায়ী ভাব কি এবং তাহার পরিণতি কোন রস এবং সম্ভব হইলে আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাবের নামোল্লেখ করিতে হয়।

---

(১) Tragic ও Pathetic-এর পার্থক্য ট্রাজেডি প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(জ) অভিনেয়তার দিক দিয়া নাটকটির কোন ত্রুটি আছে কি-না দেখিতে হইবে।

নিম্নের নাট্যাংশটি বিশ্লেষণ করিলে বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে:—

(লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ)

লেডী ম্যাক্‌। যে মদিরা উন্মত্ত করেছে সবে—
করিয়াছে সাহস প্রদান মোরে ;
জ্ঞান-জ্যোতি নির্বাণ সবার যে প্রভাবে—
উদ্দীপিত করেছে আমায়।
একি ! না পেচক—ফুৎকার,
ভয়ংকর রজনীর ঘণ্টা-নিনাদক,
কঠিন আরাবে দেয় বিদায় সবায়।
এতক্ষণ নিয়োগ হয়েছে বুঝি কাজে,
উদ্‌ঘাটিত দ্বার মদমত্ত ভৃত্যগণে,
নিজকার্য করে উপহাস—
নাসিকার ধ্বনি করি ;
পানপাত্রে করিয়াছি ঔষধ প্রদান,
যাহে প্রকৃতির সনে, মৃত্যু করে বাদ—
জীবিত কি মৃত বলি।

নেপথ্যে ম্যাক্‌বেথ। কেও ? কি আঁ !

লেডী ম্যাক্‌। বুঝি সর্বনাশ হয়, কাঁপিছে হৃদয়,
জেগেছে সকলে, কার্য নহে সমাধান।
উদ্যম বিফল, কার্য নাশ, মজাইল-মজাইল।
একি !
কোষমুক্ত করি রাখিয়াছি রক্ষকের অসি
ভ্রম নাহি হবে দেখে নিতে।
আকারে না হ'ত যদি পিতার সমান,
আমি সাধিতাম কাজ ;

(ম্যাকবেথের প্রবেশ)

স্বামী মম !

ম্যাক্‌বেথ। করিয়াছি কার্য সমাধান,
শুনেছ কি কিছু ?

লেডী ম্যাক্‌। মাত্র পেচকের নাদ, আর ঝিল্লীর ঝঙ্কার কয়েছিল কোন কথা ?

ম্যাক্‌বেথ। কখন ?

লেডী ম্যাক্‌। এখন।

ম্যাক্‌বেথ। নামিতে নামিতে ?

লেডী ম্যাক্‌। হাঁ।

ম্যাক্‌বেথ। শুন দ্বিতীয় কক্ষেতে কেবা ?

লেডী ম্যাক্‌। ডনালবেন ?

ম্যাক্‌বেথ। (হস্ত দেখিয়া) দৃশ্য অতি দুঃখকর !

লেডী ম্যাক্‌। পাগলের কথা,—দুঃখকর।

ম্যাক্‌বেথ। নিদ্রাঘোরে জনেক হাসিল,
জনেক কহিল হত্যা
জাগাইল পরস্পরে ;
শুনিলাম দাঁড়ায়ে সে সব—
প্রার্থনা করিয়া পুনঃ নিদ্রা গেল সবে।

লেডী ম্যাক্‌। এক কক্ষে আছে দুইজন।

ম্যাক্‌বেথ। জনেক কহিল,—রক্ষা কর ভগবান।
'শান্তি শান্তি' জনেক কহিল,
হত্যাকারী হস্ত যেন দেখিল আমায়।
শুনিয়া সভয় উক্তি সে সবার,
নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
যবে দোঁহে ডাকিল কাতরে,—
রক্ষা কর ভগবান !

লেডী ম্যাক্‌। এন না এ ঘোর দুর্ভাবনা !

ম্যাক্‌বেথ। কেন নারিলাম 'শান্তি' উচ্চারিতে,
ঈশ্বরের আশীর্বাদ মম প্রয়োজন সমধিক ;
শান্তি উচ্চারিতে কণ্ঠরোধ হ'ল মম।

লেডী ম্যাক্‌। এরূপে এ সব চিন্তা নাহি দেহ স্থান,
উন্মত্ততা হবে তাহে।

ম্যাক্‌বেথ। যেন করিনু শ্রবণ, 'ঘুমায়ো না আর'
হত্যাকারী নিদ্রা করে নাশ।...

লেডী ম্যাক্‌। একি ভাব তব ?

ম্যাক্‌বেথ। কহিল আবার—
ঘুমায়োনা আর নিদ্রাগত গৃহবাসিগণে
গ্লামিসের অধিপতি নিদ্রা করে নাশ,
ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।

॥ ২ ॥

আলোচ্য নাট্যাংশটিতে ম্যাক্‌বেথ ও লেডী ম্যাক্‌বেথের জীবনের এক চরম উদ্বেগজনক মুহূর্ত বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র ঘটনাটি অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে এই দম্পতি গভীর নিশীথে গৃহের মধ্যে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দৃশ্যটির পরিবেশ সংস্থাপনও এই ষড়যন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পেচকের তীক্ষ্ণ চীৎকার ভাসিয়া আসিতেছে। প্রহরীরা গভীর নিদ্রায় অচৈতন্য। লেডী ম্যাক্‌বেথ এই অংশে কেন্দ্রস্থ চরিত্র। তাঁহাকে মনে হইতেছে এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা। তাঁহার মনে আশঙ্কা জাগিতেছে কার্যের সাফল্য সম্পর্কে। ম্যাক্‌বেথ এই দৃশ্যে একজন উদ্বেল, ভীরু ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত। তিনি কাহাকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত হস্তে মঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু হত্যার সেই ভয়াল করুণ দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। এই হত্যাকাণ্ড তাঁহার মানসিক শান্তিকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাহার প্রবল তাড়নায় বেদনাহত কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন—'ম্যাক্‌বেথ না ঘুমাইবে আর।'

আলোচ্য নাট্যাংশটির সংলাপ গৈরিশ ছন্দে লিখিত! সংলাপের আবেদন বলিষ্ঠ এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হইলেও ইহার প্রকাশশৈলীর মাঝে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। নাট্যাংশটির প্রধান গুণ হইল ইহার নাটিক ক্রিয়াটি এই অংশে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়া দর্শকের মনে একটা সুতীব্র suspense বা কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়াছে। নাটক সর্বদাই গতিশীল। পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়াই এই নাটিক গতি প্রখর হইয়া উঠে। ঘটনা স্রোত কোনখানে থামিয়া থাকে না; ক্রমাগতই সবেগে প্রবাহিত হইয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আলোচ্য

নাট্যাংশটিতেও তাহাই হইয়াছে। লেডী ম্যাক্‌বেথের প্রবেশ হইতে ম্যাক্‌-বেথের শেষ প্রলাপোক্তি পর্যন্ত নাটকীয় গতি এমন ভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে যাহাতে দর্শক-মনে স্বভাবতই এই অনুতপ্ত ভাবপ্রবণ ঘাতকের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা জানিবার জন্য একটা কৌতূহল থাকিয়া যায়।

নাট্যাংশটির মধ্যে আরও একটি বিষয় বিশেষ সার্থকতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। তাহা হইতেছে দ্বন্দ্ব বা conflict. ম্যাকবেথ ও লেড়ী ম্যাকবেথ এই উভয়ের মনেই প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়া ম্যাক্‌বেথ তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছেন।

নাট্যাংশটির মধ্যে চরমোন্নতি বা climax কোথায় হইয়াছে তাহা দেখিতে হইবে। লেডী ম্যাক্‌বেথ ম্যাক্‌বেথের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে হইতেছে এই বুঝি তাঁহার স্বামী বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এমন সময় ম্যাক্‌বেথ রক্তাক্ত হস্তে মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। লেডী ম্যাক্‌বেথ তাঁহাকে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'স্বামী মম!' ম্যাক্‌বেথের সমগ্র কৃতকর্ম সম্পর্কে এই যে অধীর আগ্রহে একটি সম্বোধনের ইঙ্গিতে জানিবার প্রচেষ্টা এই অংশে নাটকীয় রসের চরমোন্নতি ঘটাইয়াছে। ইহার পর ম্যাক্‌বেথের সংলাপের দ্বারা ঘটনার উপর falling action পড়িবে।

নাট্যাংশটির স্থায়ীভাব হইল ভয়। ইহার রস পরিণতি হইল ভয়ানক রস। অবশ্য ম্যাক্‌বেথের এই উন্মত্ততার মধ্যে কিছুটা করুণ রসের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

অভিনেয়তার দিক দিয়াও নাট্যাংশটির কোন ত্রুটি নাই। অবশ্য সংলাপ যে কতকাংশে কৃত্রিম হইয়া গিয়াছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার জন্য উপস্থাপনা এবং শব্দচয়ন পদ্ধতিই একমাত্র দায়ী।

উপন্যাসের শিল্পরীতি

উপন্যাস সাহিত্যের একটি শাখা মাত্র। কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ রম্যরচনা ইত্যাদির মত উপন্যাস সাহিত্যশিল্পের একটি দিক অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। আবার এই উপন্যাসের জন্ম সাহিত্যের অন্যান্য শাখার অনেক পরে হইয়াছে। অর্থাৎ উপন্যাস সাহিত্যমাতার কনিষ্ঠ সন্তান। কিন্তু গরুড়ের মতো এই সন্তানের ক্ষুধা এত তীব্র যে,সে সাহিত্যের অন্যান্য সন্তানদের বুভুক্ষু রাখিয়া মারিয়া

ফেলিবার যোগাড় করিয়াছে। গানণিকরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে পাঠকদের শতকরা ষাটভাগই শুধুমাত্র উপন্যাস পড়েন। উপন্যাসের এই অপরিসীম জনপ্রিয়তার কারণ—ইহার সহজ ভঙ্গি এবং বক্তব্য বিষয়ের বিচিত্রতা। হেন বিষয় নাই যা নাকি উপন্যাসকে আশ্রয় করিয়া বলা না যায়। কিভাবে দ্রুত-গতিতে উপন্যাস রূপান্তরের পথে চলিয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

গণতন্ত্রের সঙ্গে উপন্যাসের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। সমাজে যেদিন দীনতম ব্যক্তিরও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল উপন্যাসের আবির্ভাব সেদিন হইতেই। প্রথমে দেবদেবীরা, তারপর পর্যায়ক্রমে রাজা, মন্ত্রী. সেনাপতি, ধনিক, বণিকরা সাহিত্যের আসরে কুলীনপদবাচ্য ছিলেন। গল্পপ্রিয় মানুষের জন্য ছিল উপদেশ-মূলক কথাকাহিনীর ছড়াছড়ি। সাহিত্যিকদের একমাত্র ব্রত ছিল অন্নদাতা, আশ্রয়-দাতা প্রভুদের মনস্তুষ্টি করা। কৃত্তিবাসের দৃষ্টি ছিল রাজা গণেশের দিকে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের ছিল পরাগল খাঁ এবং তস্য পুত্র ছুটি খাঁয়ের প্রতি, ভারতচন্দ্র কাব্য-রচনা করিয়াছিলেন শুধুমাত্র মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। কিন্তু যেদিন মানুষ বুঝিল মহারাজের পুত্রবিয়োগের ব্যথা আর হারাণ মণ্ডলের পুত্র-বিয়োগের ব্যথার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই তখনই রামা শ্যামারাও সাহিত্যের দরবারে কল্কি পাইল। দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সংগ্রাম করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তখনই দেখি ইংরেজী সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে। এবং আশ্চর্য এই যে প্রথম ইংরাজী উপন্যাস (রিচার্ডসনের 'পামেলা'—১৭৪০ খৃষ্টাব্দ) একজন চাকরাণীকে নায়িকারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই নবজাত শিল্পকে নিয়া তখন হাসাহাসির অন্ত ছিল না। রিচার্ডসনকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য ফিল্ডিং 'পামেলা'র এক প্যারডি (জোসেফ এণ্ড্রুজ) লিখিলেন। কিন্তু ফিল্ডিং এই ঠাট্টার মধ্য দিয়াই স্বীয় প্রতিভাকে চিনিতে পারিলেন। তার ফলে রচিত হইল ইংরেজী সাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'টম জোন্স'।

শীঘ্রই উপন্যাস বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং ইউরোপীয় সাহিত্যগুলিকে উপন্যাস একেবারে যাহাকে বলে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল। কোলরিজ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা শেলী কীটসকে বুঝিতে যে পরিমাণ মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন উপন্যাস পাঠ করিতে তার দরকার নাই। তাহা ছাড়া উপন্যাসের মধ্যে গল্পের আকর্ষণ তো প্রবল।

এই উপন্যাস বস্তুটি কি? এক কথায় ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা মোটেই

সহজসাধ্য নয়। কারণ উপন্যাসের আকৃতি, প্রকৃতি এবং গতি কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই। 'কপালকুণ্ডলা'ও উপন্যাস আবার 'বি. টি. রোডের ধারে'-ও উপন্যাস। রাজসিংহ, গোরা, শ্রীকান্ত, পথের পাঁচালী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা —ইহারা সবই উপন্যাস। অথচ কত বিচিত্র ইহাদের প্রকাশভঙ্গি। উত্তমপুরুষে বা পরের জবানিতে ইহার কাহিনী বলা যাইতে পারে। আর মানবমনের এমন কোন জিজ্ঞাসা নাই যা নাকি ইহার বিষয়ীভূত হইতে না পারে। সমালোচকরা কিছুতেই এই সর্বগ্রাসী শিল্পটিকে সংজ্ঞার মধ্যে আনিতে পারিতেছেন না। অথচ মূলতঃ কিন্তু নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কাহিনী এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়া চরিত্রসৃষ্টি—এই হইল এক কথায় নাটকের ধর্ম। অবশ্য নাটকের আবেদন অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের মনে আসিয়া পৌছায়। এই জন্য নাটককে অনেকে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না—তাঁহারা ইহাকে একটি মিশ্র শিল্প বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ দুইটি প্রক্রিয়া (রচনা এবং অভিনয়) এক সঙ্গে যুক্ত না হইলে নাটকের প্রাণ সঞ্চার হয় না।

তেমনিই উপন্যাসের মূল ধর্ম নাটকের মত বলিয়া অনেকে উপন্যাসকে 'পকেট থিয়েটার' বলিয়া অভিহিত করেন। অর্থাৎ নাটকের দৃশ্যাবলী যে কাজ করে ঔপন্যাসিক বর্ণনার সাহায্যে তাহা করিয়া থাকেন। এক পলকের দৃষ্টিতে অবশ্য তাহাই মনে হয়। মনে হয় অভিনীত হয় বলিয়া নাটকের আকার ক্ষুদ্র হইবে এবং একা বসিয়া পড়িবার জিনিষ বলিয়া উপন্যাসের আকৃতি মহাভারতের মত (রোমাঁ রলাঁর জাঁ ক্রিস্তফ) হইতে আপত্তি নাই। কিন্তু তাই কি ? গতিবেগ, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ নাটকের প্রাণ। উপন্যাসে এইগুলি থাকিলে ইহার আবেদন খুবই সহজে পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু না থাকিলে ক্ষতি নাই। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে কি আমরা নাটকীয় গুণের সন্ধান করি।

তাহা হইলে উপন্যাসের প্রকৃতি কিরূপ ? সাধারণতঃ উপন্যাস সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয় তাহা হইতেছে :—

(ক) লেখকের ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও অনুভূতি কোন কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া শিল্পে রূপায়িত হইলে তাহাকে উপন্যাস বলা চলে।

(খ) উপন্যাসের কাহিনী বা প্লট হইল তাহার প্রধান অঙ্গ। এইটিকে কার্য-কারণসূত্রে আবদ্ধ করিয়া এবং সরস করিয়া পাঠকের সামনে উপস্থিত করা সার্থক ঔপন্যাসিকের প্রধান কর্তব্য। অসংলগ্ন বা শিথিল আখ্যানভাগ উপন্যাসের

পক্ষে মারাত্মক ক্রটী বিশেষ।

(গ) এই কাহিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে তাহার কোন নিয়ম নাই। কিন্তু দেখিতে হইবে তাহা যেন সুসংবদ্ধ হয়।

(ঘ) কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য হইবে চরিত্র সৃষ্টি করা এবং ঐ চরিত্রসমূহের মধ্য দিয়াই লেখকের জীবনদর্শন বা জীবনানুভূতি প্রকাশিত হইবে।

(ঙ) বাণীভঙ্গির উপর ঔপন্যাসিককে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ খুব ভাল কাহিনীরও অপঘাত মৃত্যু ঘটিবে যদি লেখকের ভাষা ও ষ্টাইল দুর্বল হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টি, পটভূমি এবং ভাষা ও ষ্টাইল ইহাদের সম্মিলিত রূপই হইতেছে সার্থক উপন্যাস। কাজেই জিনিষটি খুব সহজ নয়। কাব্য বা নাটক রচনা করিতে কতকগুলি নিয়ম-বন্ধন মানিতে হয়। উপন্যাসের বেলায় এসবের এতটা কড়াকড়ি নাই। এই জন্যই উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এত ভীড়। এবং সব দেশের সাহিত্যেই উপন্যাসের এত ছড়াছড়ি। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

অপর দিকে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণটিও আর কিছুই নয়—ইহার সহজবোধ্যতা। আজিকার দিনে কাব্যের ক্ষেত্রে এই সহজবোধ্যতা অনুপস্থিত—অনেকাংশে নাটকের ক্ষেত্রেও তাহাই। বহির্জগতের নানাদৃশ্য—নদী, পাহাড়, চাঁদ বা শ্যামল তৃণভূমি, একটি বিশীর্ণ বৃক্ষ, ইহার নিষ্পত্র শাখা, একদল ভিখারী, একটি নেড়ী কুকুর এমন কি একটা মরা ইঁদুর পর্যন্ত কবিচিত্তকে ভাবাইয়া তোলে, এই ভাবনা কবি ভাষায় প্রকাশ করিয়া সহৃদয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহেন। প্রশ্ন আসে কবি কি ভাবে তাহা প্রকাশ করিবেন। কবির কাজতো ফটোগ্রাফার বা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ নয় যে তিনি দৃষ্টবস্তুর হুবহু বর্ণনা দিয়া খালাস পাইবেন। কবি তাহা পারেন না। কেননা দৃষ্টবস্তু কবির মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করে। এই ভাবগুলি কবি দৃষ্টবস্তুর অনুরূপ (বলাই বাহুল্য ভাবের অনুরূপ) বিষয় দ্বারা প্রকাশ করেন। বস্তুগত বা গুণগত সাদৃশ্য-মূলক কোন উপমার সাহায্যে কবি যখন তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করেন তখন পাঠকের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কবি যখন ভাবমূলক সাদৃশ্য দ্বারা অর্থাৎ কোন প্রতীক দ্বারা তাঁহার মনের আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহেন তখনই বাঁধে গোলমাল। কারণ কবির মনে দৃষ্টবস্তুর সদৃশ যে ভাব-প্রতীক জাগিয়াছে পাঠক হয়তো তাহা ঠিক ধরিতে পারেন না। তখনই আসে

দুর্বোধ্যতার অভিযোগ। উপন্যাসের বেলায় এই অসুবিধা নাই। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আজকাল এই অভিযোগ উঠিয়াছে। কারণ আজকাল নাটক যেমন প্রতীকী হইয়াছে উপন্যাসও সেই পথে পা বাড়াইয়াছে।

•

উপন্যাসের যে শিল্পরীতির কথা বলা হইল তাহা সাধারণতঃ এইভাবে রূপায়িত হয় :—

১) ঐতিহাসিক উপন্যাস—ইহাতে কাহিনী সৃষ্টির দায়িত্ব অনেকটা সহজ। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক স্বভাবতই অতীতমুখী। সূক্ষ্ম কার্য-কারণ এবং কালজ্ঞান ঐতিহাসিক উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য সর্ত। কালজ্ঞান বলিতে আমরা অতীতে কি ধরণের জিনিষ ঘটিতে পারে এই সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানের কথাই বলিতেছি। রাজসিংহ স্কুটারে চড়িয়া ঔরংজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন এ জিনিষ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা অবশ্য একটা মোটা কথা। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঘটনার বেলাতেও লেখককে সতর্ক হইতে হইবে, অতীতচারী হইতে হইবে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের যুগ অবশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র—রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ যুগের উপর যবনিকাপাত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এ ইহার পরীক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন 'রাজসিংহ', 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এর পর ইহার পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব নয়। অধুনা বাঙ্গলা সাহিত্যে আবার কিছু কিছু ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। কিন্তু এইগুলি ইতিহাসের নামে জলো রোমান্টিকতার কণ্ডূয়ণ ছাড়া আর কিছু নয়।

(২) সামাজিক উপন্যাস—ইহার পরিধি অতি সুবিশাল। উপন্যাস মাত্রই সামাজিক। কাজেই ইহার পরিধি নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

(৩) কাব্যধর্মী উপন্যাস—ইহাও সমাজের বাহিরের জিনিষ নয়। উচ্ছ্বাসময় বর্ণাঢ্যতা ও বাস্তববিমুখীনতার জন্য কতকগুলি উপন্যাসকে এই নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি, (বিশেষ করিয়া মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গল) 'ময়মনসিংহ গীতিকা', নবীন সেনের 'রঙ্গমতী', রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যাকারে উপন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়। টেনিসনের 'এনোক আর্ডেন' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কাব্যধর্মী উপন্যাসের নিদর্শন হিসাবে আমরা 'কপালকুণ্ডলা', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদির নাম করিতে পারি।

(৪) ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস—সমাজের বা জীবনের ভাবকল্পনার অসঙ্গতির দিকটাই

এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। লেখক কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ না করিয়াও সমস্যাগুলির হাস্যকর দিকটা আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ে ব্যর্থতা সম্পর্কে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা করা সম্ভব নয় এক 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্' গল্পের দ্বারা তাহা অতি সহজেই সম্ভব হইতে পারে।

(৫) ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস—এই শ্রেণীর উপন্যাস এখনও অভিজাত সাহিত্যের আসরে স্থান লাভ করিতে পারে নাই যদিও ইহাদের পাঠকসংখ্যা সুবিপুল। এই শ্রেণীর উপন্যাসে সাহিত্যগুণ নাই এই কথা বলা চলে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির কথা উল্লেখ করিতে পারি।

বলাই বাহুল্য উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ ইহাতেই সম্পূর্ণ নয়। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য হিসাবে উপন্যাসকে বিপ্লবাত্মক উপন্যাস, বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, কাহিনী উপন্যাস, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস, লোমহর্ষক উপন্যাস ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

এইভাবে উপন্যাস রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি এমন এক শ্রেণীর উপন্যাসের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে যাহা নাকি অঘটন-ঘটনপটিয়সী উপন্যাসের ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর। আমরা মনস্তাত্ত্বিক বা চৈতন্যস্রোতমূলক (Stream of consciousness) উপন্যাসের কথাই উল্লেখ করিতেছি। কি ভাবে উপন্যাস তাহার দুইশত বৎসরের খোলসটাকে মুহূর্তে ছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিতেছে এই শ্রেণীর উপন্যাসে আমরা তাহার পরিচয় পাই। কাব্যের ক্ষেত্রে যে প্রতীকের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি এই শ্রেণীর উপন্যাসেও সেই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কাব্য-নাটকের মতই দুর্বোধ্যতা দেখা দিতেছে।

মানুষের মন সম্পর্কে ফ্রয়েডের যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে। ফ্রয়েড মানুষের মনকে [১] সজ্ঞান বা চেতন [২] অধিচেতন [৩] অচেতন বা নির্জ্ঞান এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

লক্ষ বছর পূর্বে মানুষ যখন জীবরূপে এই প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে আসিল তখন তাহার মন ছিল স্ফটিকের মতই শুভ্র বা নিষ্কলঙ্ক। চিন্তা তাহাকে তখন পীড়ন করে নাই। প্রবৃত্তির খেয়ালে সে চলিত—তাহাকে বাধা দেওয়ার কেউ ছিলনা তাহার প্রয়োজনও ছিলনা। কিন্তু কালক্রমে বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে

পারিল এই বিরূপ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইবে। ফলে সে প্রবৃত্তির মুখে লাগাম পরাইল। কন্যা, মাতা, ভগ্নীর প্রভেদ সে মানিয়া নিল। বিরুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলিকে সে পিষিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিল। কিন্তু তাহারা মরিল না। শৃঙ্খলিত বন্দীর মত মনের একেবারে অন্তস্থলে গিয়া তাহারা আশ্রয় নিল।

কিন্তু সেখানে তাহারা আবদ্ধ থাকিতে চায় না। মাঝে মাঝে তাহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠে। তখন তাহাদের রূপ দেখিয়া মানুষ ভয় পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে ডাণ্ডার প্রহারে আবার তাহাদিগকে কারাগারে পাঠাইয়া দেয়। তখন সেই অবদমিত বন্দীর দল ঘুমন্ত মানুষের মনে স্বপ্নের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু দেখা দেয় প্রতীকরূপে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বোঝান যাক। এককালে মানুষ ভ্রাতা ভগ্নীর বিভেদ মানিত না। আজিকার দিনে ইহা ভয়াবহ অপরাধ। এই চিন্তা মনে আনাও পাপ। কিন্তু চিন্তাকে আমরা মারিয়া ফেলিতে পারিনা, তাই তাহাকে মনের অন্তস্থলে (নির্জ্ঞান স্তরে) পাঠাইয়া দিয়াছি। কিন্তু মানুষ প্রবৃত্তির দাস মাত্র। যতই সে প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করুক না কেন, কোন এক সময় তাহার কাছে সে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলে। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। যে মুহূর্তে এই চিন্তা তাহার মনে জাগে অমনি তাহার অধিচেতন মন তাহাকে চাপিয়া ধরে এবং আবার তাহাকে কারাগৃহে পাঠাইয়া দেয়। তখন সেই বন্দী প্রবৃত্তির দল গাছ, সাপ, পুকুর, সিঁড়ি, লাঠি, গর্ত ইত্যাদি প্রতীকরূপ নিয়া স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়। মানুষ এই অদ্ভুত স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়ে। ফ্রয়েড এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে মানুষের অবদমিত বা অতৃপ্ত কামনাই স্বপ্নে ভিন্ন মূর্তিতে আসিয়া দেখা দেয়।

তাহা হইলে দেখা গেল মানুষের মনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সজ্ঞান মনে সে সকলের সঙ্গে চলাফেরা মেলামেশা করে। অধিচেতন মনকে সে পাহারাদার হিসাবে রাখিয়া দিয়াছে যাহাতে চাপা চিন্তার দল সজ্ঞানে আসিয়া হাজির হইতে না পারে। আর নির্জ্ঞান মনতো তার পিষিয়া-মারিয়া-ফেলা চিন্তারাজির আবাসস্থল মাত্র।

ফ্রয়েডের এই মনোবিশ্লেষণ চিন্তার রাজ্যে এক যুগান্তর লইয়া আসিল। ঔপন্যাসিক এই বিচিত্র ক্রিয়াশীল মনকে উপন্যাসের বিষয়ীভূত করিয়া তুলিলেন। মানুষের মন সত্যই কি বিচিত্র! যে মুহূর্তে আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটা জটিল সাংসারিক বিষয় আলোচনায় মগ্ন আছি ঠিক সেই মুহূর্তে মন

হয়তো আমার দশ বছর পূর্বে দেখা একটা রেল-দুর্ঘটনার কথা ভাবিতেছে। এই যে মনের গতি—প্রকাশ্যে এক এবং সেই সঙ্গে অপ্রকাশ্যে আর—ঔপন্যাসিকরা এই মনের গতিকেই উপন্যাসের কাহিনীতে পরিণত করিলেন। তাঁহারা মানবমনের জটিলতা প্রতিপাদনের জন্য তাহার সচেতন চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে নির্জ্ঞান বা অবচেতন মনের অস্ফুট, অবয়বহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-কল্পনা, অতীত স্মৃতির খণ্ডাংশ, আকস্মিক অনিয়ন্ত্রিত ভাবসঙ্গ প্রভৃতি মিশাইয়া মানব-প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ সত্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা জেমস্ জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসের নাম করিতে পারি। এক অখ্যাত ব্যক্তির মাত্র ২৪ ঘণ্টার এলোমেলো চিন্তাধারাকে তিনি এই উপন্যাসে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন। মানুষের মনের গোপন কোণে যে অব্যবস্থিত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয় তাহাকে যদি আলোতে টানিয়া আনা যায় তবে তাহার রূপ দেখিয়া আমরা আঁৎকাইয়া উঠি। কোন ভদ্র ব্যক্তি যে কত কুৎসিৎ চিন্তা মনের আড়ালে লুকাইয়া রাখিতে পারেন তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। কিন্তু সত্যান্বেষী শিল্পী তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না যদিও সমাজ সেই চিত্র সহ্য করিতে পারে না। 'ইউলিসিস' উপন্যাসকে প্রথমটায় অশ্লীলতার দায়ে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যে ভার্জিনিয়া উলফ, মিস্ রিচার্ডসন এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রবর্তক। ফরাসী সাহিত্যে মারসেল্ প্রোস্ত বোধ হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ মনের এই বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁহার 'পঞ্চভূত'-এর এক ভূত সমীর একদিন বলিতেছে—'মানুষের অন্তঃকরণে দুই অংশ আছে। একটা অচেতন—বৃহৎ, গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট; আর একটা সচেতন—সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে, গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে ক্রমে সংস্কার, স্মৃতি, অভ্যাস, আকারে একটি বৃহৎ গোপন আঁধারে অবচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া কেহ তাহার স্তরপর্যায় আবিষ্কার করিতে পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে অথবা

আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'নষ্ট নীড়' ইত্যাদি গল্প উপন্যাসে আমরা ইহার কথঞ্চিৎ প্রয়োগ দেখিতে পাই।

স্বভাবতই এই শ্রেণীর উপন্যাসে গল্পাংশ না থাকাতে সাধারণ পাঠকের পক্ষে ইহাদের রস গ্রহণ করা শক্ত। বিশেষ করিয়া মানুষের 'চেতনার স্রোত' অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে প্রবাহিত হয় আর ব্যক্তিবিশেষে তাহার প্রকৃতি হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। লেখক যে কোন্ প্রকারের 'চেতনার স্রোত'-কে রূপায়িত করিবেন তাহা সম্পূর্ণই লেখকের রুচির উপর নির্ভর করে। সেই স্রোতের সঙ্গে পাঠকের নিজের মনের বা তার কল্পিত মনের সাদৃশ্য থাকিলে উত্তম, না থাকিলেই দুর্বোধ্যতার প্রাচীর আসিয়া পাঠক ও লেখকের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়।

সাধারণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠক ঔপন্যাসিককে বলেন—'Beguile me, offer me comedy and tears, tell me about droll people and lovers, and a story that will keep me rooted to the spot and my eyes glued to the page'. কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা। এখানে গ্রন্থকার পাঠককে বলেন—'Here is the artistic record of a mind, at the very moment that it is thinking. Try to penetrate within it . You will know only as much as this mind may reveal . It is you, not I, who will piece together any 'story' there may be, of course, I have arranged this illusion for you. But it is you who must experience it'.

তাহা হইলেই বোঝা যাইতেছে এই শ্রেণীর উপন্যাস পাঠে পাঠকের দায়িত্ব কত অধিক। সুখপাঠ্য গল্প পাঠের জন্য যাঁহারা উপন্যাস পড়েন উপন্যাসের এই রূপান্তরিত রূপ তাহাদের জন্য নয়।

ছোট গল্পের পরিচয়

সাহিত্যের সর্বপুরাতন ও আদিম ফসল গল্পসাহিত্য। সে মানবজাতির ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অতীত। সভ্যতার যে ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আজ ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদিগের গবেষণার সামগ্রী, সেই বিবর্তমান মানবসভ্যতার প্রথম স্তরও তখন শুরু হয় নাই। সুসভ্য মানবজাতির পূর্বপুরুষ তখন আরণ্যক প্রকৃতির

মাঝে, পর্বতের গুহায়, বৃক্ষের কোটরে দিন যাপন করিতেছে। মানব ইতিহাসের সেই বিলীয়মান অতীতে প্রথম গল্পের জন্ম।

সে গল্প মানুষ মুখে মুখে রচনা করিয়াছে। মুখের কথা উপকথায় রূপান্তরিত হইয়া এক গোষ্ঠী হইতে অপর গোষ্ঠী, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সারাদিনে আহার সংগ্রহের দুর্বার তাড়না, প্রতি মুহূর্তে জীবন সংগ্রাম। সন্ধ্যার অবসরে নিরাপদ গৃহপরিবেশের মধ্যে গৃহস্বামী পরিবারের সকলকে লইয়া গল্প বলিতে বসিয়াছে। সে গল্পের চরিত্র অরণ্যের বিচিত্র জীবজন্তু, কখনও কখনও চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা প্রকৃতির দুর্নিরীক্ষ এবং বিস্ময়কর শক্তিসমূহ—যাহাদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল এবং ভীতি অপরিসীম। এ সকল গল্পের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য তরুণদের শিক্ষাদান। তাহাদিগকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা। পরোক্ষ উদ্দেশ্য হইল তাহাদের অবসরকে আনন্দ দিয়া ঘিরিয়া রাখা। আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, বিভিন্ন দেশের রূপকথার গল্প, আরও পরবর্তী-কালের জাতক সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারতের নানা উপকাহিনী, বাইবেলের প্যারাবল্‌স্‌, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, তুতিনামা, হুমায়ুন-নামা, কথাকোষ, বিভিন্ন 'ফেবল্‌স, ইহাদের মাঝে ছোটগল্পের বীজ নিহিত আছে।

কিন্তু এই গ্রন্থগুলি ছোট গল্পের আদি উৎসস্থল হইলেও, ঐ গল্পগুলি কেবল মাত্র ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র ধর্ম ও নীতি ব্যতীত সমাজ ও জীবনের অন্যান্য দিকে বিশেষ কোন সন্ধান এই গল্পগুলিতে পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলির মধ্যেই সর্বপ্রথম সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাংসারিক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়সমূহ আসিয়া ভীড় করিল। প্রায় সাড়ে পাঁচশত গল্পের মাধ্যমে ভগবান অমিতাভের মহাবোধি লাভের জন্মজন্মান্তরের প্রচেষ্টা জাতকে বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্য, পশু আর প্রকৃতি লইয়া এতদিন ধরিয়া গল্পসাহিত্যের যে গতানুগতিকতা অনুসরিত হইয়া আসিয়াছিল, জাতকের গল্পে তাহার সর্বপ্রথম অব্যাহতি লাভ ঘটিল। কারণ জাতকের গল্প—অনেক-খানি মাটি ও মানুষের গল্প :—

> The Jataka stories are like vivid flashes throwing light on the old Indian panoroma of bazar and caravan, farm-yard and barracks, the busy workshop and closed cloister.—E. Horrwitz.

জাতকের পর সংস্কৃত সাহিত্যের 'বৃহৎকথা' ও 'কথা সরিৎসাগর', এবং দণ্ডীর

'দশকুমার চরিত'-এর গল্পগুলিকে আধুনিক ছোটগল্পের আদিম উৎসস্থল বলা যাইতে পারে। পাশ্চত্য সাহিত্যেও আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর রোমাঞ্চকর এবং উত্তেজনাকর কাহিনীগুলি অনেকস্থলে 'কথা সরিৎ সাগর' ও 'পঞ্চতন্ত্র'-এর গল্পগুলিকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার এই আরব্য উপন্যাসের কাহিনীগুলি বিচিত্রবর্ণে সজ্জিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে যাঁহাদের রচনার মধ্য হইতে আধুনিক ছোটগল্পের বীজটি সুপ্ত থাকিতে লক্ষ্য করা যায় সেই বোক্কাচ্চিয়ো, চসার প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের রচনার ভিতরও এই সহস্রজ্যোতি আরব্য উপন্যাসের রশ্মিবিন্দু না পড়িয়া পারে নাই।

বহু বিদগ্ধ সমালোচকের মতে বোক্কাচ্চিয়োর 'দেকামেরণ'-এ আধুনিক ছোট গল্পের লক্ষণ অনেকাংশে প্রতিভাত। মহামারীর ঝঞ্ঝা-বাত্যাতাড়িত তিনজন তরুণ ও সাতটি তরুণী এক নির্জন গ্রামের পরিত্যক্ত শূন্য প্রাসাদে আশ্রয় লইয়া ছিল। অবসর বিনোদনের জন্য তাহারা দশজনে দশদিন ধরিয়া পর্যায়ক্রমে একটি করিয়া গল্প বলিয়াছে - তাহাদেরই সঙ্কলন—'দেকামেরণ'। 'দেকামেরণ'-এর গল্পগুলিতে প্রেম ও প্রতিহিংসা, দৈব ও পুরুষকারের সংঘাত, নর-নারীর পারস্পরিক শাঠ্য এক নাটকীয়-পরিবেশন-নৈপুণ্যে ও সরল সুললিত প্রকাশ কৌশলে যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বের রসপিপাসু সমস্ত মানুষকেই আহ্বান জানাইয়া আসিতেছে।

বোক্কাচ্চিয়ো ইতালির মানুষ। তাঁহার 'দেকামেরণ'ও লেখা ইতালিয়ান ভাষায়। আধুনিক ছোট গল্পের জন্ম তখনও ইংলণ্ডে হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কবি চসারের 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্'-এর মধ্যেই ইংরাজী গল্প সাহিত্যের ভ্রূণ অন্তর্নিহিত। ক্যাণ্টারবেরি টেলস্ মৌলিক রচনা নহে। আরব্য উপন্যাস, 'দেকামেরণ' এবং বহু উপকথা হইতে চসার তাঁহার 'ক্যাণ্টারবেরি টেলসের' উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস্' মুখ্যত কাব্য। কিন্তু এই বিচিত্র কাব্যগাথার ভিতরে ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি—এক কথায় তাহাদের জীবনের মর্মবাণীটি অনিন্দ্য সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক ফরাসী গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা হইতেছেন ফ্রাঁসোয়া র‍্যাবলে। তাঁহার রচনার মধ্যে একদিকে রৌদ্রালোকিত উদ্দাম কৌতুক, অপরদিকে তাহার অন্তরালে রুগ্ন সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কশাঘাত। ধর্মযাজক, পুলিশ প্রভৃতি সকলের প্রতিই তাঁহার বিদ্রূপ বাণ নির্মম ভাবে বর্ষিত হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর পর অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে জলন্ত লেখনী লইয়া আবির্ভূত হইলেন ফরাসী বিপ্লবের জন্মদাতা ভল্‌তেয়ার। ভল্‌তেয়ারের পরে দিদারো, স্তাঁদাল, বালজ্যাক, হুগো, ফ্লবের তাঁহাদের রচনায় ভঙ্গুর, শ্লথ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসানে এক সুখী রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ছোটগল্পের যিনি নব মূল্যায়ন করিলেন তিনি ফরাসী সাহিত্যিক মোপার্সাঁ। মোপার্সাঁর রচনার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে তৃতীয় নেপোলিয়নের ফ্রান্সের অবক্ষয়িত তিক্ত নিষ্ঠুর-হৃদয়হীন সমাজের রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনায় একদিকে শতাব্দীর নিষ্ঠুর অভিশাপ, হাহাকার ও নগ্ন জীবনের চিত্র, অপরদিকে নূতন বলিষ্ঠ মানুষের অভ্যুদয়ের উদয়তীর্থে নব জীবনের জয়গান। হয়ত জীবনের সে নব অভ্যুদয়ের চিত্রটি ক্লেদ ও গ্লানির মেঘজালের আড়াল হইতে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই কিন্তু যে জীবন-জিজ্ঞাসা, যে মর্মযন্ত্রণা হইতে সার্থক ছোটগল্পের জন্ম, মোপার্সাঁর রচনাতেই তাহার সার্থক স্বতোচ্ছল প্রকাশ। ফ্রান্সে এই সময় হইতেই ন্যাচারালিষ্ট আন্দোলন শুরু হইয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনের গুরু এমিল জোলা। আলফাঁস দোদে জোলারই সার্থক শিষ্য। তাঁহার গল্পে জীবনের নগ্ন চিত্রণ আছে বটে কিন্তু তাহার পাশাপাশি প্রকৃতি ও প্রেমের অনির্বচনীয় সর্বপর্বতাদহনকারী সৌন্দর্যও উপস্থাপিত। ইহা ব্যতীত স্বনামধন্য আনাতোল ফ্রাঁ উনিশ শতকের ফরাসী ছোটগল্পের ঐতিহ্যময় ধারাকে ব্যর্থতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ মূল্যে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন।

রাশিয়ার উনিশ শতকের কবি পুশকিন ছোটগল্প খুব কমই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বল্পতম রচনাই বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের ইতিহাসে তাঁহার স্থান সংরক্ষিত করিবে। সাধারণ মানুষের গল্পকার গোগোলই রুশ সাহিত্যে আধুনিক ছোটগল্পের জন্মদাতা। গোগোলের গল্পগুলিতে যেমন একদিকে জারতন্ত্রী রাশিয়ার অত্যাচার অবিচার ও আমলাতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে, অপরদিকে তাহার অন্তরালে এক সুগভীর মানবিক সহানুভূতির সুরটি ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। গোগোলের পর টলষ্টয়, চেখভ, টুর্গেনিভ, আরও পরবর্তী কালের ম্যাক্সিম গোর্কী শুধু রুশ সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যে ছোটগল্পকে এক সুউচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যে যাঁহারা ছোটগল্প রচনায় প্রভূত খ্যাতি

অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইংরাজ লেখক গলসওয়ার্দি ও সমারসেট মমের ন্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ ২ ॥

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শুরু করিয়া সমসাময়িক কাল পর্যন্ত ছোটগল্পের বিবর্তনের ধারাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এখন এ প্রশ্ন পাঠকের মনে স্বতঃই উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, সাহিত্যের এই সর্বপুরাতন শাখাটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ কি? ঈশপ ও পঞ্চতন্ত্রের আমলে গল্পের যে প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিক ছিল বর্তমান কালের ছোটগল্পে নিশ্চয়ই সে প্রকাশভঙ্গি ও আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্ষুদ্রত্বই কেবলমাত্র ছোটগল্পের একমাত্র লক্ষণ নয়। এইচ. জি. ওয়েলস ছোটগল্পের আকৃতির ক্ষুদ্রত্বকে ছোটগল্পের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তবে ওয়েলসের মতে ছোটগল্পের এই ক্ষুদ্রত্ব কখনও অস্বাভাবিক এবং অপ্রয়োজনীয় রকমের ক্ষুদ্র হইবে না অথবা অসঙ্গত রকমের বড় হইবে না।

কেবলমাত্র আকৃতির দিক দিয়া নয় প্রকৃতির দিক দিয়াও ছোটগল্পের মধ্যে এক অখণ্ড বিশিষ্টতা আছে। ছোটগল্প যে কোন বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু তাহার আরম্ভের ভিতর এক আকর্ষণীয় নাটকীয়তা থাকিবে। সমগ্র কাহিনীর ভিতর দিয়া লেখকের একটি বিশেষ ভাবকল্পনা বা idea-কে সামগ্রিক ভাবে প্রকাশিত করিয়া তুলিতে হইবে। এই idea-কে গল্পকার চলমান জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তকে অবলম্বন করিয়া প্রতিভাত করিবেন।

মানুষের প্রবহমান জীবনে শত শত মুহূর্ত বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। একমাত্র যাঁহার মধ্যে প্রকৃত শিল্পদৃষ্টি আছে তিনি এই বিদ্যুতের স্ফুরণকে দেখিতে পারেন। এই ক্ষণ-মুহূর্তটি গল্প-কারের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে idea-কে গঠন করিতে সাহায্য করে। ছোটগল্প এই idea-রই প্রতিরূপ।

> A short story must contain one and only one informing idea and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method.—Hudson

দ্বিতীয়ত প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্যেই একটি নাটকীয় স্থর ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। গতির (action) শ্লথতা ও কাহিনীর অবিন্যস্ততা ছোটগল্পের পক্ষে মারাত্মক অন্তরায়। গল্পের মধ্যে একটি উৎকণ্ঠা (suspense) ও চরম মুহূর্ত (climax) অনিবার্যভাবেই উপস্থিত থাকিবে।

ছোটগল্প গীতিকবিতার মতই ব্যঞ্জনাধর্মী। গীতিকবিতা যেমন পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায় না—মনের মাঝে তাহার রেশটি অনুরণিত হইতে থাকে, তেমনই ছোটগল্প পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুরাইয়া যায় না। মনের মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা গুণ গুণ করিয়া বাজিতে থাকে।

উপন্যাসের মত সমাপ্তির বিরতি ইহার মধ্যে নাই। শেষ হইয়াও ছোটগল্প শেষ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন :—

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্পের সরল সার্থক এবং সুন্দরতম সংজ্ঞা এত স্বল্পের ভিতর আর কোথাও আছে কি না তাহা বলিতে পারিনা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে ছোটগল্প জীবনের বহুমুখী ঘটনাকে লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। আর জীবনের প্রকাশ তো বহু বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র পথে। তাই ছোটগল্পেরও শ্রেণী বিভাগ অসংখ্য। কোন গল্প বা এক টুকরা মেঘ, একটি শীর্ণ বৃক্ষশাখা, ঝিঁঝি পোকার অশ্রান্ত আওয়াজের মধ্য দিয়া কোন অনির্বচনীয় সঙ্কেতকে প্রকাশিত করিয়া তুলিতেছে, কোন গল্পে জীবন জিজ্ঞাসারই প্রাধান্য, কোথাও বা সমাজ সমস্যাটাই মুখ্য, কোথাও বা নর-নারীর আদিম প্রেমলীলা বিচিত্র বর্ণে উপস্থাপিত।

ছোটগল্পের গুণধর্মের এই পার্থক্য অনুসারে সাহিত্য সমালোচকেরা ছোটগল্পকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। সেগুলি হইল যথাক্রমে—

(ক) দার্শনিক গল্প :—এ গল্পে রূপকের অন্তরালে বা খোলাখুলি ভাবেই লেখকের জীবনদর্শন মুখ্য হইয়া উঠে। টলষ্টয়, ডি. এইচ. লরেন্স, লাগেরভিষ্ট প্রভৃতির ছোটগল্পে এইরূপ দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

(খ) সমাজ সমস্যামূলক—সমাজ ও সামাজিক মানুষকে বাদ দিয়া কোন সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। তাই বিশ্বেব সকল ছোটগল্পেই সমাজ ও যুগ সমস্যার পরিচয় কম বেশী উপস্থাপিত। গোর্কী, মোপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কর প্রভৃতি লেখকরা এই শ্রেণীর গল্প রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছেন।

(গ) মনস্তাত্ত্বিক :—ছোটগল্পের মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ আধুনিক ছোট গল্পে বিশেষ প্রাবল্য লাভ করিতেছে। ছোটগল্প মনোজগতেরই কাহিনী। তাই মনোবিশ্লেষণ ইহার অপরিহার্য অঙ্গ। তবে মনস্তত্ত্ব যদি গল্পের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইলে গল্পের সৌন্দর্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়। ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ জগতে তুমুল আলোড়ন আনিবার পর ছোটগল্পও এই ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব অনুসারে গড়িয়া উঠিতেছে। সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর প্রভৃতির গল্পে এই মনস্তত্ত্বের বিলসন উল্লেখযোগ্য।

(ঘ) রোমাণ্টিক গল্প :—নরনারীর প্রেম-মাধুর্যকে অবলম্বন করিয়া এই গল্পগুলি রচিত। রোমাণ্টিক গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

(ঙ) রূপক গল্প :—রূপকের অন্তরালে কোন সর্বজনীন সত্যকে প্রকাশ করিয়া তোলাই রূপক গল্পের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের 'একটি আষাঢ়ে গল্প' 'তোতা-কাহিনী', মোপাসাঁর 'একটি ঘোড়ার কাহিনী', অস্‌কার ওয়াইল্ড-এর 'সুখী রাজপুত্র ও স্বার্থপর দৈত্য', টলষ্টয়ের 'মাটির নেশা' প্রভৃতি বিশ্বসাহিত্যের সার্থক রূপক গল্পের উদাহরণ।

(চ) ব্যঙ্গ গল্প :—সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাকে ও প্রচলিত রুগ্ন দেশাচারকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জর্জরিত করিয়া তোলাই এই শ্রেণীর গল্পের কাজ। ভলতেয়ারের 'ক্যান্দিদ', চেকভের 'বহুরূপী", ও হেনরীর 'পুলিশ ও ধর্মগীতি', রাজশেখর বসুর 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড', 'কচি-সংসদ' প্রভৃতি গল্পে এই শ্রেণীর ব্যঙ্গরস সার্থক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়াও যাঁহারা

অবিমিশ্র হাসির গল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মার্ক টোয়েন, স্টিফেন লিকক, পি. জি. ওডহাউস, বাঙলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরের এই শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও ঐতিহাসিক গল্প, বৈজ্ঞানিক গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, ভৌতিক গল্প, রাজনৈতিক গল্প, প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় ছোটগল্পকে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

॥ ৩ ॥

বিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠ দশকে ছোটগল্পের আঙ্গিক ও শিল্পরীতি সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ ধারণার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আধুনিক কালের ছোট গল্পে একদিকে আসিয়াছে সূক্ষ্ম প্রতীকধর্মী শব্দের প্রয়োগ, বাক্যগঠনের সংক্ষিপ্তি ও কাব্যিক উপস্থাপনা। সবার উপরে মনস্তত্ত্ব ও মনোবিশ্লেষণের প্রাধান্য। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ যে ধরণের ছোটগল্প লিখিয়া গিয়াছেন আজ আধুনিক সাহিত্যিকদের ছোটগল্পের রচনাভঙ্গির সহিত তাহার আকাশপাতাল তফাৎ। তবে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে বাঙলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের প্রবর্তনা করেন রবীন্দ্রনাথ। জীবনের বিভিন্ন দিককে লইয়া নানাভাবে তিনি তাঁহার ছোটগল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ হয়ত কিছু মাত্রায় রোমান্টিক, কিছু মাত্রায় অতীতচারী, জীবন দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আসল পরিচয় তাঁহার ছোটগল্পে। তাঁহার গল্প সাধারণ মানুষেরই মর্মবাণী।

শরৎচন্দ্র পুরাপুরিই জনজীবনের প্রতিনিধি, তবে তাঁহার ছোট গল্প সংখ্যায় অতি স্বল্প। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নামটিও স্মরণযোগ্য।

কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম উলঙ্গ বাস্তবতা ও জীবনের নিদারুণ রিক্ততা ও হাহাকারের দিকটি উপস্থাপিত। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' ভগবানের বন্দীদশা ঘুচাইবার দুরন্ত শপথ তাঁহাদের রচনায় ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ইঁহারাই কল্লোল গোষ্ঠীর সার্থক গল্পকার। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প ইঁহাদের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম। শরৎচন্দ্রের পর

বাঙ্গলার গ্রাম ও তাহার মানুষকে এত আপন করিয়া সর্বপ্রথম দেখিয়াছেন তারাশঙ্কর। তাঁহার ছোট গল্পেও যুগচেতনা উপস্থাপিত। কিন্তু তারাশঙ্করের কাছে সত্য ও সুন্দর অভেদ। তাঁহার জীবন দৃষ্টিতে 'এ দুয়ের মাঝখানে আছে কোন মিল'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার প্রলেপই কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আধুনিক গল্পকারদের মধ্যে সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল মিত্রের গল্পে রসঘন রোমান্টিকতার মিষ্ট সুরভি সার্থকভাবে ধ্বনিত। মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছতার অন্তরালে রোমান্সের সুরটি আবিষ্কার করিয়াছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যে পল্লীবাঙ্গলার মাটি, মানুষ আর অবজ্ঞাত প্রকৃতি একদা অমর গল্পকারের লেখনী স্পর্শে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল—সে অমর গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমকালীন ছোটগল্পে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব যাঁহাদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাঁহারা হইতেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী, বিমল কর, সমরেশ বসু প্রভৃতি।

॥ ৪ ॥

ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ আজ তরুণতম জীবন শিল্পীদের হাতে। সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের রূপও বিবর্তিত হইতেছে, হইবেও। তবু বলিষ্ঠ সুখী সমাজ গঠনের স্বপ্ন যখন সার্থকতা লাভ করিবে, ক্রান্তিকালের অনিশ্চয়তার যখন ঘটিবে অবসান তখন সুপ্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া উত্তরকালের কথা-শিল্পীরা সত্য-শিব-সুন্দরের আরাধনায় হাতের ডালি ভরিয়া তুলিবেন। আজিকার ছোট গল্প সেই অনাগত দিনের প্রস্তুতি।

রম্য রচনা

'রম্য রচনা' শব্দটির অভিধানগত অর্থ—যে রচনা রমণীয় বা সুন্দর। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সংজ্ঞাটিকে অতি ব্যাপক বলিয়া মনে হয়। কারণ সকল সৎ সাহিত্যের ধর্মই এই যে, তাহা রসোত্তীর্ণ হইবে। এবং যে রচনা রসোত্তীর্ণ, নিঃসন্দেহে তাহা রমণীয় এবং সুন্দর। এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ কবিতা, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ সকলকেই রম্য রচনা আখ্যায় ভূষিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রম্য রচনা বলিতে আমরা এক বিশেষ রচনারীতিকেই বুঝিয়া থাকি। জনৈক সমালোচকের একটি মন্তব্যকে

অনুসরণ করিয়া বলিতে হয়, যে রচনায় জীবনের লঘু-চপল বিকাশগুলিকে লইয়া উচ্চতর সারস্বত কর্মে নিয়োজিত করা হয় সেই রচনাই রম্য রচনা। এ যেন হঠাৎ 'আলোর ঝলকানি' লাগিয়া ঝলমল করা চিত্তের ক্ষণপ্রকাশ। বিদগ্ধ সাহিত্য সভায় মাইক্রোফোনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্বরচিত গল্প পাঠ করা নহে, যেন কোন অলস মধ্যাহ্নে বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশিয়া খোশ গল্প করা। আড্ডার মেজাজটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত কিন্তু সংযত ও রুচির সীমা সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ। বীরবল ইহাকে বলিয়াছেন গুণপণাযুক্ত ছ্যাবলামি। রম্য রচনার উৎপত্তি ও বিকাশ এইরূপ একটি মেজাজী পরিবেশ হইতেই। রম্য রচনা সেই জাতীয় রচনা যাহাকে ডাঃ জনসন বলিতেছেন : ....Loose sally of mind, which is an irregular undigested piece and not regular or orderly composition. প্রবন্ধের সহিত রম্য রচনার এখানেই পার্থক্য। উপমা দিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, একটি ক্লাসিক, অপরটি রোমান্টিক। প্রবন্ধ শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। প্রবন্ধ দৃঢ়সম্বদ্ধ। তাহা সর্বদাই তথ্যপ্রধান। যুক্তিতর্ক ও বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন একটি বিশেষ মতামতকে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্য সেখানে প্রবল। যাহা বিষয়ের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, প্রবন্ধের সীমানায় তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাহার উপর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট। গুরু গম্ভীর বিষয়কে লইয়াই প্রবন্ধকারের কারবার। তাহা সর্বদা বস্তুধর্মী বা objective. প্রবন্ধকারের মেধা ও বুদ্ধির ছাপ প্রবন্ধের সর্বত্র কিন্তু হৃদয়ের সামান্যতম পরিচয়ও সেখানে অনুপস্থিত।

পক্ষান্তরে রম্য রচনা সর্ববন্ধন মুক্ত। তাহা মন্ময়। শেলীর স্কাইলার্ক-এর মত তথ্যভারমুক্ত জগতের উপর দিয়া তাহার লঘুপক্ষ সঞ্চরণ। এ জাতীয় রচনা সম্পর্কে রবার্ট লিণ্ড বলিতেছেন :

> Sometimes it is nearly a sermon, sometimes is nearly a short story. It may be a fragment of autobiography or a piece of nonsense. It may be satirical or vituperative or sentimental. It may deal with any subject from the day of judgement to a pair of scissors.

উপন্যাস এবং গল্পের সহিত রম্য রচনার পার্থক্যটি হইল, উভয়ের মধ্যেই একটি কাহিনীর বৃত্ত রহিয়াছে। এই বৃত্তকে অবলম্বন করিয়াই শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত

কাহিনীটি আগাইয়া চলে। এ কাহিনীর যেমন একটি বিজ্ঞানসম্মত শুরু আছে, তেমনই রসসম্মত সমাপ্তিও আছে। কাহিনীর মাঝে চরম মুহূর্ত (climax) সৃষ্টি করিয়া তাহার সুসম্বদ্ধ পরিণতিটি গল্প উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিতে হয়।

কিন্তু রম্যরচনার এরূপ আঙ্গিকগত কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। তাহা সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ ভাবেই বর্ণনাত্মক—বিশ্লেষণাত্মক নহে। রম্যরচনার মাঝে জীবন দর্শনের কোন সুগম্ভীর বাণীর অন্বেষণ করিতে গেলে ভুল করিতে হইবে। অবশ্য এ জাতীয় রচনায় জীবন ও জগতের বৈষম্য ও অসঙ্গতি সম্পর্কে লেখকের সুকঠোর কটাক্ষ যে থাকে না তাহা নহে। কিন্তু কখনই এই তত্ত্বের দিকটি বড় হইয়া উঠে না। এক কথায় এ জাতীয় রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় 'বাজে কথা'। আর 'বাজে কথা' বলিয়াই একমাত্র এ জাতীয় রচনার দ্বারা লেখককে আমরা অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে পারি। প্রবন্ধ, উপন্যাসে যে লেখককে আমরা পাইয়া থাকি তাহা তাঁহার পণ্ডিত ও দার্শনিক সত্তা। বড়জোর লেখক সেখানে আমাদের সমব্যথী। আমাদের পথ প্রদর্শক গুরু। কবিতায় কবির পরিচয় পাই তাহাও তাঁহার দার্শনিক সত্তার। এখানে হয়ত কবির হৃদয়ের কিছুটা পরিচয় আমরা পাই, তাঁহার কাব্য কূজন আমাদিগকে মুগ্ধ করে। তিনি আমাদের রস দান করেন, আমরা অঞ্জলি ভরিয়া তাহা পান করিয়া ধন্য হই। এখানে আমাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ভক্ত ও ভগবানের অথবা দাতা এবং গ্রহীতার। কিন্তু রম্যরচনার ক্ষেত্রে লেখক আমাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কারণ তিনি আমাদের দর্শন শুনাইতে আসেন না। তত্ত্ব বা তথ্যের ভারে আমাদিগকে বিড়ম্বিত করেন না। ফরাসের তাকিয়ায় হেলান দিয়া তিনি অনর্গল আমাদিগকে 'বাজে কথা' শুনাইয়া যান। তাহার মধ্যে ধার থাকিলেও ভার নাই। প্রজ্ঞা থাকিলেও দর্শন নাই। এখানে লেখক আমাদের আত্মীয় নন, গুরু নন, হিতৈষী নন—তিনি শুধু 'বন্ধু'। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি :

> অন্ন খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।

> উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মন্থর আমল হইতে তাহা বাঁধা ; কাজের কথা যে পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়।

রম্যরচনাকে তুলনা করা যায় চিঠির সহিত। চিঠি মাত্রেরই আসল রস হইল ব্যক্তিগত রস। কোন চিঠি পড়িলেই তাহার অন্তরালে পত্র প্রেরকের ছবিটি এক লহমায় ভাসিয়া উঠে। রম্যরচনায় আসল রসও এই ব্যক্তিগত রস। লেখকই ইহার নায়ক। বিচিত্র দৃষ্টি, বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র বস্তুকে রম্য-রচনার লেখক হৃদয়ের জারক রসে রঞ্জিত করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করেন। সব কিছুর অন্তরালে তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি। রম্যরচনার আদি প্রবর্তয়িতা ফরাসী সাহিত্যিক মোঁতেন। তিনি বলিতেছেন—Reader, myself am the matter of my work. তাই রম্যরচনা কখনও স্কেচ জাতীয়—লেখক এখানে জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের রমণীয় চিত্র নির্মাতা। কখনও বা তাহা আত্মচরিতের ঢঙে লেখা, কখনও বা তাহা ভ্রমণকাহিনী মূলক। এই ব্যক্তিগত সুরটি ধ্বনিত হইবার জন্যই রম্যরচনার নাম অনেকে দিয়াছেন—'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।'

তবে এই ব্যক্তিগত সুরটি অনেক ক্ষেত্রে আমিত্বের দীপ্ত অহঙ্কারে পরিণত হইবার বিপজ্জনক প্রবণতা দেখা যাইতে পারে। রম্যরচনায় লেখকের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ অসংযম নহে। বাজে কথার অর্থ যা খুশি তাই নহে, রসিকতার অর্থ স্থূলতা নহে। শুধু ভঙ্গি দিয়া চোখ ভুলাইবার প্রবণতা এ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। তাই আধুনিক যুগের রম্যরচনার জনৈক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

> এজাতীয় রচনায় আতিশয্য ও পুনরুক্তি এসে যাবার আশংকা ষোল আনা। রসিকতা যেখানে দীপ্তিহীন, বক্তব্য সেখানে কষ্টকল্পিত, অভিজ্ঞতা নিঃশেষিত প্রায়, প্রিয়বচন তখন বলা বাহুল্য। আমিত্বের খোঁচা যেখানে উগ্র আর পাণ্ডিত্য হয় প্রকট, আত্ম-প্রকাশ সেখানে ধূমায়িত বহ্নি, আত্মম্ভরিতারই নামান্তর। এক কথায় রসজ্ঞানের হয় সমাধি। আবার লেখক যদি অবাঞ্ছিত স্থূলত্বের কোঠায় নেমে আসেন, তাঁর বিরূপ বিদ্রূপ হয়ে যায় চুট্‌কি, আঞ্চলিক গ্রাম্যতা।

উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্যের মত রম্যরচনার উৎপত্তি ইউরোপীয় সাহিত্যে। রম্যরচনা কথাটি ফরাসী 'বেল্-লেতর' শব্দ হইতে আসিয়াছে। ফরাসী দেশের রেণেসাঁ যুগের সাহিত্যিক মোঁতেন এই শ্রেণীর সাহিত্যে পথিকৃৎ। তবে কেহ কেহ 'Gulliver's travels'-খ্যাত ইংরাজী সাহিত্যিক Swift-কে রম্যরচনার জন্মদাতা বলিয়া অভিহিত করেন। Swift-ই সম্ভবত তাঁহার রচনায় 'Belles-lettres' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে ব্যাকরণশাস্ত্র, বাগ্মিতা ও কাব্যকলাকেই রম্যরচনা বলা হইত। পরবর্তী কালে 'কল্পনা-কান্ত' ও 'শিল্প-সম্মত' যে কোন রচনার ক্ষেত্রেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। আধুনিক কালে রম্যরচনা বলিতে বাঙ্গলা ভাষায় লঘু হাস্য রসাত্মক কল্পনাময় ও বর্ণনা প্রধান এক শ্রেণীর প্রবন্ধকে বুঝি।

ইংরাজী সাহিত্য Swift-এর পর Charles Lamb-এর রচনায় রম্যরচনার প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। Lambএর বিখ্যাত রম্যরচনা 'The Superannuated Man' যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে Lamb-এর রচনায় রসিকতা ও কারুণ্য, তারল্য ও গাম্ভীর্য একই সঙ্গে বিচিত্র প্রবাহে মিশ্রিত হইয়া কিভাবে বহিয়া চলিয়াছে। সে প্রবাহের মাঝে যে সূর্যের প্রখর রশ্মির বিচ্ছুরণ—সে সূর্য যেন Lamb-এর হৃদয় ও প্রজ্ঞার মিলিত জ্যোতির্ময় রূপ। সে আলোয় প্রাত্যহিক জীবনের সব তুচ্ছতা দূরীভূত হইয়া জীবন রসিক Lamb-এর ভাস্বর মূর্তিটি প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে।

Lamb-এর পর ইংরাজী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রম্যরচনা রচয়িতা ডি কোয়েন্সী। ইঁহারই বিখ্যাত আফিংখোরের আত্মকাহিনী বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের দপ্তর সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে আর্ণল্ড বেনেট, গলসওয়ার্দি, এইচ জি ওয়েলস্, ডি এইচ লরেন্স—যে ভ্রমণকাহিনীগুলি লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে রম্যরচনার গুণধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে উপস্থিত। চেষ্টারটন, বেলক, হাক্সলি, অডেন, স্পেণ্ডার, ম্যাকনিস প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ অন্যান্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর রম্যরচনা লিখিয়াছেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল'কে অনেকে উপন্যাস বলিয়া অভিহিত করেন কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে রম্যরচনা বলাই বোধ হয় সঙ্গত। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'-র মধ্যেই বাঙ্গলা সাহিত্যের রম্যরচনার আদি বীজ নিহিত থাকিতে দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়াই সর্বপ্রথম বাঙ্গলা রম্যরচনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

বঙ্কিমের 'লোকরহস্য' 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ এবং বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ রম্যরচনার সহিত একাসনে বসিবার দাবী করিতে সমর্থ। সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' সে যুগের প্রসিদ্ধ রম্যরচনা।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও রম্যরচনার মধ্যে যদি কোন সূক্ষ্ম প্রভেদ রেখা টানা যায় তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের এ জাতীয় রচনাগুলিকে রম্যরচনা না বলিয়া ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলিব। রবীন্দ্রনাথের মনন স্বভাবতই কাব্যধর্মী। তাই তিনি যে প্রবন্ধই লিখিতে বসিয়াছেন, তাহা কবিসুলভ তন্ময়তার গুণে সরসতার কোঠায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' 'পঞ্চভূত' সমস্তই এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ে পড়ে। তাঁহার 'জীবনস্মৃতি', 'ছিন্নপত্র', প্রভৃতি রচনাগুলি আত্মনিষ্ঠ রম্যরচনারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে বীরবলের শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে অবিসংবাদী। বীরবল মনের দিক দিয়া এ্যারিস্টোক্র্যাট। তাঁহার মনটাই পুরা মজলিশী। কাজেই 'মলাট সমালোচনা' হইতে 'চুটকি' পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই তাঁহার অবাধ পদসঞ্চার। এবং তাঁহার সাহিত্যের ফরাস সর্বদাই জমজমাট। আধুনিক সাহিত্য জগতের প্রায় সমস্ত রথী-মহারথীরাই কিছু না কিছু রম্যরচনা লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মুজতবা আলি, কালপেঁচা (বিনয় ঘোষ) বিমলাপ্রসাদ ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাযাবর (বিনয় মুখোপাধ্যায়), রঞ্জন (নিরঞ্জন মজুমদার), রূপদর্শীর (গৌরকিশোর ঘোষ) নাম উল্লেখযোগ্য।

মুজতবা ও রূপদর্শী, হুতোম এবং বীরবলের সুযোগ্য উত্তরসূরী। মুজতবার রচনায় বিভিন্ন ভাষাগত ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়া তাঁহার পরিহাসকে সুপরিচ্ছন্ন করিয়াছে। রূপদর্শীর রচনায় মুজতবা আলির মত জীবনাভিজ্ঞতা এত ব্যাপক নহে এবং তাঁহার রচনায় মুজতবার মত পাণ্ডিত্যের স্ফুরণ নাই। তিনি সাধারণ আটপৌরে জীবন হইতে রচনার প্লট সংগ্রহ করিয়াছেন। এইদিক দিয়া তাঁহার সাংবাদিক দৃষ্টিভঙ্গি রচনার সার্থকতার পথে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। রূপদর্শী, হুতোম এবং বীরবলের মত প্রাকৃতজনের ভাষা (ইংরাজীতে যাহাকে slang বলে) নিপুণ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। মুজতবার রচনায় স্যাটায়ার অপেক্ষা হিউমার অনেক বেশী। কিন্তু রূপদর্শীর রচনায় স্যাটায়ার ও হিউমার প্রায় সমান সমান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার সর্বাত্মক গ্রাসের ফলে আমাদের জীবন ক্রমশ যান্ত্রিক হইয়া উঠিতেছে। এযুগে চিন্তার অবসর ক্রমশ লোপ পাইয়া

যাইতেছে। তাই গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ আর তেমন পাঠককে পূর্বের মত আকর্ষণ করিতে পারেনা। তাই আজ এমন রচনার চাহিদা ক্রমশ দেখা দিতেছে, যে রচনার আবেদন যতই গুরুগম্ভীর হউক না কেন, তাহার প্রকাশ হইবে লঘু এবং আঙ্গিক হইবে লোকায়ত। এক কথায় তাহা শুধু সর্বজনবোধ্য হইবে না, সর্বজন আকর্ষণীয় হইবে। একমাত্র রম্যরচনারই এই দাবী মিটাইবার ক্ষমতা আছে।

তবে ঠুনকো জনপ্রিয়তার লোভে স্থূল, ভঙ্গিসর্বস্ব, চটকদারি রচনার রম্যরচনার ভীড়ে মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একমাত্র পাঠক সাধারণের সতর্ক প্রহরার ফলেই তাহার প্রতিরোধ সম্ভব হইতে পারে।

প্রবন্ধ সাহিত্য

'প্রবন্ধ' শব্দটির অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। এ বন্ধন বিষয়ের সহিত প্রকাশ ভঙ্গির, রূপের সহিত ভাবের, ভাষার সহিত বক্তব্যের।

সাধারণতঃ কোন তত্ত্বকে বা তথ্যকে প্রকাশ করিয়া তোলাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ণনার অবকাশ সেখানে নাই, আবেগের বিস্তৃতি সেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রবন্ধকার সমুদ্রের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হন না, তিনি তাঁহার অতলস্পর্শী গভীরতার পরিমাপ করিতে আগ্রহী হন। যুক্তি ও তর্কের জালে বক্তব্য বিষয়কে এক অপূর্ব বিশ্লেষণের রসে মথিত করিয়া তিনি পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপিত করান। এক কথায় তিনি যতখানি স্রষ্টা তাহার অধিক নির্মাতা। তিনি শুধু উপভোক্তা নন সেই সঙ্গে ব্যাখ্যাতাও। আবেগ ও প্রজ্ঞার সার্থক সমীকরণেই সৎ সাহিত্যের জন্ম। ভাল উপন্যাস ও কবিতার ক্ষেত্রে এই ধর্মের কষ্টিপাথরেই সাহিত্যবিচার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবন্ধকারের পক্ষে হৃদয়গুণ যতখানি প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক দরকার সমুন্নত প্রজ্ঞার। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তিনি পুরামাত্রায়ই বুদ্ধিধর্মী। হৃদয়াবেগ অনেক ক্ষেত্রে চিত্তের স্থৈর্যকে নষ্ট করিয়া দিতে পারে, বিচারের সতর্ক চক্ষুকে অনেক ক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত করিতে পারে। তাই তিনি হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধিকেই অধিক বেশী স্থান দিয়া থাকেন।

এই তন্ময়তাই (Objectivity) প্রবন্ধকারের প্রকৃষ্ট গুণ। বস্তুর

রসরূপ অপেক্ষা বস্তুর অন্তরস্বরূপের প্রতিই প্রবন্ধকারের সতর্ক দৃষ্টি। প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রবন্ধকার তাঁহার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যান। যে বিষয় বা বস্তু লইয়া তিনি 'প্রবন্ধ' রচনা করিতেছেন তাঁহার দৃষ্টিকে সর্বদাই সে বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দুর উপর রাখিতে হয়। 'অশ্ব' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিতে হইলে অশ্বারোহী সম্পর্কে এমন কোন প্রসঙ্গের তিনি অবতারণা করিতে পারেন না যাহা তাঁহার বক্তব্যের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তিনি শুধু শিক্ষক, পাঠকেরা তাঁহার ছাত্র। সুদীর্ঘ যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া তিনি বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। Magic নয়, Logic-ই প্রবন্ধকারের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

অবশ্য ইহার পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রবন্ধের দৃঢ় সন্নিবদ্ধ কঠিন নাগপাশ মোচন করিয়া তাহাকে সাহিত্যের অলৌকিক সৌন্দর্যমালায় ভূষিত করা হইতেছে। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যগ্রাহ্য 'প্রকৃষ্ট-বন্ধন' ও তন্ময় রূপটি ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া তাহার পাশা-পাশি নূতন রচনাদর্শ স্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধকে সমালোচকেরা 'Intimate Essay' বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আর পূর্বে উল্লিখিত প্রবন্ধকে 'Treatise' বা 'Monograph' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। বাঙ্গলায় উহাকে বলা হইয়াছে, 'আলোচনা ভূয়িষ্ঠ' প্রবন্ধ। জীবন চরিত, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক অথবা সাহিত্যিক প্রবন্ধমালা এই শ্রেণীর প্রবন্ধের উল্লেখ্য উদাহরণ।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা 'রম্যরচনা' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রজ্ঞা অপেক্ষা হৃদয়ের স্থান অধিক। তাহা কখনও রোমান্টিক গাথা, কখনও লেখকের জীবন যন্ত্রণার কাব্যিক আর্তি, কখনও তাহা পদলালিত্যে ললিত-লবঙ্গলতার মত কোমল। কখনও বিষয় গাম্ভীর্যে ডম্বরুধ্বনির মত গুরু গুরু, অথচ সুরের সুমিষ্টতায় তাহা হৃদয়গ্রাহী। কখনও সে আপন বেগে পাগল পারা ছুটিয়া চলা স্রোতস্বিনীর মত হাস্যমুখর, লাস্যময়। তাহার কোন ভার নাই আছে শুধু রস।

ইংরাজী সাহিত্যে অগণিত বিষয়ের উপর অসংখ্য প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। কারণ দার্শনিক হইতে বৈজ্ঞানিক সকলেরই আপন মতাদর্শ প্রচার করিতে হইলে 'প্রবন্ধ' ব্যতীত আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাই দার্শনিক Locke এর 'An Essy on the human understanding' যেমন একাধারে খ্যাতি

অর্জন করিয়াছে তেমনই জেমস্ জীনসের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধমালাও সেইরূপ ইংরাজী সাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে। শেলীর অমর কবিতাবলীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'Defence of Poetry' গ্রন্থখানিও অসাধারণ কৃতিত্বের দাবী রাখে।

প্রবন্ধ সাধারণতঃ জ্ঞানের সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। আমরা জানি জ্ঞানের সাহিত্যকে রস-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া চলে না। রস-সাহিত্যের মর্যাদা একমাত্র ভাবের সাহিত্যেরই প্রাপ্য। কিন্তু একথাও সত্য যে প্রতিভার বলে সাহিত্যিক জ্ঞানের সাহিত্যকেও (Literature of knowledge) রসসমৃদ্ধ ভাবের সাহিত্যের (Literature of power) পর্যায়ে উন্নীত করিয়া দিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করিতে পারি। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ সাহিত্য সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরাজ প্রাবন্ধিক রবার্ট লিণ্ড বলিয়াছেন :—

> It is strange that the essay which at first sight looks the easiest and most natural thing in the world to write, has so seldom achieved excellence, yet it is an indisputable fact that the greatest essayist like the greatest letter-writer, is rarer even than the great poet.

বাঙ্গলা সাহিত্যে 'প্রবন্ধ' গল্প ও উপন্যাসের মতই অর্বাচীন কালের। বাঙ্গলা প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্ম শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হাতে। মার্শম্যান, কেরী, প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গদ্যসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের হস্তে বাঙ্গলা প্রবন্ধ সাহিত্য এক সুবিন্যস্ত রূপ ধারণ করিল। বাঙ্গলা প্রবন্ধ সাহিত্যের পথিকৃৎ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের ভাষা সুমিষ্ট, প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। বিদ্যাসাগরের পর অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধমালা ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধমালা উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য প্রবন্ধকারদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর বিষয়-ভাবনার পরিবর্তে সরস লঘু বাণীভঙ্গি রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে তাহা

পুরাপুরি বিকাশ লাভ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর মত গ্রন্থে যেমন একদিকে গম্ভীর তত্ত্ববহুল প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন অপরদিকে তেমনই 'লোক রহস্য' 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর মত লঘু রসাত্মক প্রবন্ধ রচনায় অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা প্রবন্ধের এক নূতন দিগন্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ম প্রধানতঃ কবিধর্ম। তাই প্রবন্ধের ক্ল্যাসিক্যাল বন্ধনে তাঁহার কবিমানস কখনও বন্দী থাকিতে পারে নাই। লঘুপক্ষ বলাকার মত ভাব ও অনুভূতির রাজ্যে তাঁহার কল্পনা পাখা মেলিয়াছে। তাই তাঁহার প্রবন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ময় বক্তিগত প্রবন্ধ। তাহাতে লিরিকের সুরঝঙ্কার এক বিচিত্র ঐকতানে বাজিয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত serious বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াও তিনি তাঁহার এই মনোধর্মকে প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। রবীন্দ্রযুগের লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি লেখকরা প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখজনক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

সমকালীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র প্রবন্ধসম্ভার সৃষ্ট হইতেছে। রম্যরচনার তারল্য যদিও উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিতেছে তবুও বাঙ্গলা সাহিত্যের এই বিভাগ যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

সমালোচনা সাহিত্য

'সমালোচনা' শব্দটির অর্থ সম্যকরূপে আলোচনা। বলা বাহুল্য এ আলোচনা সাহিত্য সম্পর্কীয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতারও নহে, তাহা দৈববাণী। সাহিত্য সমাজের সম্পত্তি। সুতরাং সমাজস্থিত প্রতিটি ব্যক্তির তাহাতে মৌল অধিকার। তাই সাহিত্য রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে লইয়া সমাজে আলোচনা শুরু হইয়া যায়। আদি হইতে বর্তমান পর্যন্ত বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া সাহিত্যের রূপ পরিবর্তিত হইলেও তাহার একটি আদর্শ নীতি ও নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার আঙ্গিক ও কলাবিধির এক সুসমঞ্জস আদর্শ সাহিত্য রসিকের নিকট নির্দিষ্ট

হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নূতন সাহিত্য রচিত হইলেই তাহাকে এই বিধিবদ্ধ নিয়মের ছাঁচে ফেলিয়া বিচার করিবার প্রবণতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কোন সুনির্দিষ্ট প্রথায় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাহিত্যের সম্যক আলোচনা তাই সাহিত্য বিচারের কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরেই সাহিত্যের মূল্যায়ন ঘটিয়া থাকে।

অবশ্য সমালোচনার আদর্শ সংজ্ঞা লইয়া সমালোচকদের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ সাহিত্যে গতিশীলতাকে অস্বীকার করিয়া পুরাতন সংস্কারবদ্ধ আইনকানুনের দ্বারা সাহিত্য সমালোচনা করিয়া থাকেন। কেহ বা পুরাতন নিয়মশৃঙ্খলকে সযত্নে পরিহার করিয়া যুগধর্ম অনুযায়ী নূতন নিয়মকানুনের ছকে সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হন। আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতে অবশ্য 'Inductive' ও 'Deductive' এই দুই প্রকার সমালোচনার ধারাকেই অনুসরণ করা হইতেছে।

আজকাল আবার মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সাহিত্য সমালোচনার নীতি নির্ধারিত হইতেছে। ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতেই সাহিত্য সমালোচনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মার্ক্সবাদীরা এযাবৎ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। মার্ক্সীয় সমালোচনা পদ্ধতি বিষয়ের সৌন্দর্যের উপর তত জোর দেয় না। জনৈক সমালোচকের ভাষায় বলিতে হয়ঃ এ সমালোচনার মধ্যে 'আত্মা' নেই, 'নটরাজ' নেই, বিশুদ্ধ অমৃতরস নেই—এর মধ্যে আছে মানুষের দেহ ও মন, পৃথিবী ও সমাজ, মানুষের শিক্ষা ও সাহিত্য। অবশিষ্ট যা তা মানুষের নয়, সমাজের নয় সুতরাং মার্ক্সীয় সমালোচনার অন্তর্ভূক্ত নয়।

সমালোচকের দায়িত্বও সাহিত্যস্রষ্টা অপেক্ষা কম নহে। সমালোচক শুধু সাহিত্যের মূল্যায়নই করেন না তিনি সৎসাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলিতেছেনঃ

> যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি সমালোচকের প্রতিভাও আছে। এক একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না, যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে

এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদায় সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁক ডাক, তর্জন-গর্জন ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়ি-জুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরণবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দারোয়ানগুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্যাদা বোঝেন।

রবীন্দ্রনাথের এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের দ্বারাই সমালোচনার উদ্দেশ্য ও তাহার আদর্শটি আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গলা সমালোচনা সাহিত্যের উৎপত্তি অতি অর্বাচীনকালে। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে রসবাদ ও ধ্বনিবাদের প্রচলন থাকিলেও প্রকৃত সমালোচনা সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। অবশ্য রূপ ও সনাতনের সংস্কৃত গ্রন্থাবলীতে এবং জীব গোস্বামীর রচনায় বৈষ্ণব দর্শন সম্পর্কিত রসতত্ত্বের উল্লেখ্য আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনা উনবিংশ শতাব্দীতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'রহস্য সন্দর্ভ', 'মিত্রপ্রকাশ', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনামূলক বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীটন সোসাইটিতে 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামে যে একটি বক্তৃতা দেন তাহা বাঙ্গলা সমালোচনার ক্ষেত্রে পরম সম্পদ হইয়া থাকিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালিদাসের অমর কাব্যগুলির সাহিত্যিক মূল্য বিচার করেন। শুধু কালিদাস নহেন, মাঘ প্রভৃতি

খ্যাতনামা কবির বহুখ্যাত কাব্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্পর্কে তিনি তাঁহার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বীটন সোসাইটিতে আর একজন কবির একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যাসাগর হইতে রঙ্গলাল পর্যন্ত সমালোচনার যে ধারাটি চলিয়া আসিয়াছে তাহার অধিকাংশই সংস্কৃত সাহিত্যকে কেন্দ্র করিয়া। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের পর হইতে মধুসূদনের পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। মধুসূদনের অমর কাব্যগুলির উপর বিভিন্ন সমালোচনা মূলক গ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে বাঙ্গলা সাহিত্যে সমালোচনার সে ধারা বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সফল সাহিত্যিক ছিলেন না তিনি সার্থক সমালোচকও ছিলেন। বঙ্কিম সমসাময়িক যুগে রমেশচন্দ্র দত্তের 'Litereture of Bengal', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম সমালোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলা সমালোচনার নূতন মান নির্ধারণ করিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের সমালোচনাদর্শ নন্দনতত্ত্বসম্মত, তাহা অপ্রয়োজনের আনন্দে বিশ্বাসী। তিনি বলেন ঃ—'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়!' তাই তাঁহার সমালোচনা ভাবপ্রধান। রবীন্দ্রযুগের সমালোচকদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি লেখকগণ নীতির ভূমিকাকে প্রধান্য না দিয়া সৌন্দর্য আলোচনাকে মুখ্য করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা জ্ঞানভূয়িষ্ঠ ও তির্যক। বক্তব্যের অন্তরালে লেখকের তীক্ষ্ণ কৌতুকপ্রিয়তা তাঁহার সমালোচনাকে সুখপাঠ্য করিয়াছে।

আধুনিক যুগের সমালোচনার ক্ষেত্রে একশ্রেণীর রাজনৈতিক দর্শন সমস্ত সাহিত্যকর্মকে বিশেষ কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে দেখিবার অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। তাহা হইল মার্কসীয় দর্শন। মার্কস্‌বাদীদের মতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের ফলেই কবিচিত্ত প্রভাবিত হয়; সেজন্য সাহিত্য সমাজকে অস্বীকার করিতে পারে না। এইজন্য তাহার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে, সে দায়িত্ব হইল প্রগতিশীল শ্রেণীর ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিবার চেষ্টা করা। সাহিত্যকে এই কর্তব্য পালনে আগাইয়া আসিতে হইবে। যে সাহিত্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিবে, সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে সাহিত্যের

absolute উদ্দেশ্য হইবে, সে সাহিত্য নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াশীল—এই বিচার-দর্শনের আওতায় পড়িয়া বহু সাহিত্য মার্কসবাদী সমালোচকের নিকট· হইতে খারিজ হইয়া যাইতেছে।

বর্তমান যুগে সমালোচনার যে আদর্শ সকলের কাম্য তাহা নিঃসন্দেহে সকল দলীয় প্রভাবমুক্ত। 'সমালোচনার জন্ম সমালোচনা' এই মনোভাব বাতিল করিয়া খোলা মন লইয়া ও সাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত মৌল আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য সমালোচনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

পত্রসাহিত্য

বিশ্বকবি বলিয়াছেন: 'একাকী গায়কের নহেতো গান, গাহিতে হবে দুই জনে।' অবশ্য শুধু গানের ক্ষেত্রে নহে, মানুষের চিন্তা, ভাবনা, তাহার মর্মের আকৃতি, হৃদয়ের বাণী কোন কিছুই নিজের মাঝে ধরিয়া রাখিবার নহে। প্রকাশই তাহার ধর্ম, বিকাশেই তাহার সার্থকতা। সেইজন্যই যুগ যুগান্ত ধরিয়া মানুষের চিন্তা ভাবনা সর্বসাধারণের হৃদয়রাজ্যে আপনার আসন করিয়া লইবার জন্য সততই মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে।

কিন্তু এমন কতকগুলি বিষয় আছে তাহা সকল হৃদয়ের অনুসন্ধানী নহে। একটি বিশেষ হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিবার জন্যই তাহার সর্ব আকুলতা। মানুষ সমাজকে বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না এবং তাহার যাহা কিছু সৃষ্ট তাহা সমাজের জন্য একথা সত্য কিন্তু এই সমাজের অসংখ্যের ভিতর হইতে সে দু'এক-জনকে খুঁজিয়া বাহির করে যাহারা তাহার আত্মার প্রতিভূ। যাহার 'চেনার আলোক' দিয়া সে আপনাকে চিনিতে পারে, আপনাকে আবিষ্কার করিতে পারে। যাহার কাছে জীবনের সুখ-দুঃখ আশা আনন্দের কথা অকপটে নিবেদন করিয়া সে ভারমুক্তির আনন্দকে আস্বাদ করিতে পারে। সে তাহার প্রিয়জন—কখনও তাহার নিকটতম আত্মীয়, কখনও বা সে প্রিয়তমা, কখনও সে অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব। ইহাদের কাছে সে একান্তে জীবনের মর্মবাণীকে উৎসর্গ করে পত্রাকারে। সে পত্রের রস ব্যক্তিগত কিন্তু ব্যক্তিসীমাকে ছাড়াইয়াও অসীম অনাদি রসের জগতে তাহার সঞ্চরণ। তাহার মূল্য শুধু ব্যক্তিগত নয় সমাজগত। ক্ষণকালের গণ্ডী পার হইয়া কখনও কখনও সে পত্র শাশ্বতকালের সীমায় নিজেকে

উত্তীর্ণ করায়। সে-পত্র তাই শুধু প্রয়োজন চরিতার্থতার পত্র নহে—তাহার সাহিত্যিক মূল্য যুগ যুগ ধরিয়া স্বীকৃত। সে-পত্র তাই পত্রসাহিত্য। একজন প্রখ্যাত সমালোচক তাই এ সকল সার্থক পত্রের রচয়িতাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

> Great letter writers were suppressed novelists, frustrated essayists born before their time.

মানুষ যেদিন হইতে লিপি আবিষ্কার করিতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতেই পত্রসাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও গ্রীকপুরাণে আমরা পত্র-রচনার উল্লেখ পাই। মহাভারতের নল-দময়ন্তী উপখ্যানে দময়ন্তীর হংসের পায়ে বাঁধিয়া নলরাজাকে পত্র দেওয়ার কাহিনীটি সকলের জানা আছে। আর বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা তো শ্রীকৃষ্ণকে পত্র রচনার জন্য 'আঙ্গুল কাটিয়া কলম' করিতে সানন্দেই রাজী হইয়াছিলেন।

সাহিত্যে গদ্যের উৎস এই পত্রসাহিত্য। আমাদের দেশে রাজা ও ভূস্বামীদের লিখিত পত্রে সমসাময়িক গদ্যের রূপ ও গতি প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়, ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম এই পত্রসাহিত্য হইতে।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক ফিল্ডিং প্রথম জীবনে একজন পত্রলেখক ছিলেন। পাড়ার অশিক্ষিতা ঝি চাকরাণীর দল তাঁহার নিকট তাহাদের প্রেম-পত্র লিখাইতে আসিত। ঐ সকল ফরমায়েসি পত্র লিখিতে লিখিতে ফিল্ডিং-এর মনে একখানি আদর্শপত্র রচনা পদ্ধতি লিখিবার ইচ্ছা জাগিল। ফিল্ডিং তাঁহার এই গ্রন্থে পামেলা নাম্নী জনৈকা কাল্পনিক দাসী চরিত্রের অবতারণা করিলেন। এই 'পামেলা' যেন একটি ধনী মনিবের কনিষ্ঠ পুত্রের প্রেমে পড়িয়া কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা তাহার বান্ধবীকে পত্র লিখিয়া জানাইতেছে।

ফিল্ডিংএর 'পামেলা' গ্রন্থখানিই ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস রূপে খ্যাত হইয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাঙ্গলাভাষাতেও এই ধরণের সচিত্র প্রেমপত্র রচনা শিক্ষা মূলক পুস্তকের অভাব ছিল না। 'যাও পাখি বল তারে সে যেন ভুলে না মোরে,' জাতীয় প্রেমপত্র রচনার নমুনা সংযুক্ত এই পুস্তকগুলি সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ চিঠিপত্র লিখিয়া থাকে। কিন্তু প্রয়োজন যখন মুখ্য হইয়া উঠে, তথ্যভারে যখন পত্র প্রপীড়িত হয় তখন সে চিঠি সাহিত্য পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে না। যে চিঠিতে লেখকের ব্যক্তিসত্তার স্পর্শ

নাই, যে চিঠি রচয়িতার অন্তরের রসে ও রঙে সঞ্জীবিত ও অনুরঞ্জিত নয়, তাহার ভিতর যত গুণই থাক না কেন, শ্রেষ্ঠ পত্র তাহাকে বলা যাইবে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিতে হয়—

> যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়—তার কোন ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস।

বিশ্ব-পত্রসাহিত্যে কীটস্, ওয়ালপোল, কুপার, লুকাস, রবার্ট লিণ্ড, বার্ণাড শ প্রভৃতি পত্ররচনায় অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কীটসের পত্র প্রায়শই গম্ভীর মননের দৃষ্টান্তবহ কিন্তু বার্ণাড শ এর পত্র লঘু আলাপের স্বচ্ছ দর্পণ। বিশেষ করিয়া এলেন টেরীর উদ্দেশ্যে রচিত বার্ণাড শয়ের যে পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহার পরিহাসতরল মননেরই পরিচয় বহন করে।

পত্রসাহিত্যকে প্রধানতঃ মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) বৈষয়িক, (২) প্রণয়মূলক পত্র বা প্রেমপত্র (২) অনুভূতি ও ভাবপ্রধান পত্র। ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত কথাশিল্পী, কবি ও রাষ্ট্রনেতাদের প্রেমপত্রের বহু সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দেশে অবশ্য এধরণের পত্র প্রকাশে কেহই উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না।

বাঙ্গলা পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র-ধর্মী অসংখ্য পত্র লিখিয়াছেন। সেগুলি হইল পুস্তকাকারে য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র (১৮৮১), ছিন্নপত্র (১৩১৯), জাপানযাত্রী (১৩২৬), যাত্রী (১৩৩৬), ভানুসিংহের পত্রাবলী (১৩৩৬), রাশিয়ার চিঠি (১৩৩৮), পথে ও পথের প্রান্তে (১৩৪৫) ও চিঠিপত্র (কয়েকখণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের মাঝেই তাহার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের পত্রমালা কখনও পরিহাসতরল, কখনও গম্ভীর দর্শনমূলক, কখনও বিষাদ ও বৈরাগ্যের কুহেলিতে সমাচ্ছন্ন, কখনও বা জীবনাবেগের সূর্যালোকে সমুজ্জ্বল। নিজের পত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—

> যেমন আমার ছবি আঁকা চিঠি লেখাও তেমনি, ঘটনার ডাকপিওন গিরি করে না সে, নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

রবীন্দ্র পূর্ববর্তী যুগে স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী বাঙ্গলা পত্রসাহিত্যের এক মূল্যবান সামগ্রী। রবীন্দ্র সমসাময়িক যুগে শরৎচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে

আচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কতকগুলি পত্র সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পত্রসাহিত্য সাহিত্যের একটি দিক নহে, তাহা by-product. সাহিত্য করিবার জন্য পত্র রচিত হয় না, রচিত পত্র রচয়িতার অজ্ঞাতে সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তাই যে দেশের সাহিত্য যত সমৃদ্ধ হইবে, সাহিত্যিকদের মনন শক্তি যত শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ হইবে সে দেশের পত্রসাহিত্যও তত সুসমৃদ্ধ হইবে।

লোকসাহিত্য

একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, সঙ্গীত হইতেই নাকি ধরণীর সৃষ্টি। বিশ্ব ইতিহাসের সেই আদিমতম যুগে মানুষের মুখে যখন ভাল করিয়া ভাষা ফুটে নাই, তখন হইতেই সুরের আগুন সকলের প্রাণে প্রাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর মানবসভ্যতা যত দ্রুত বিবর্তিত হইয়াছে, মানুষ সেই সুরকে ভাষায় রূপ দিয়াছে। মুখে মুখে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, এক দেশ হইতে অপর দেশে সে সুর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈতালিকের কণ্ঠে, দিনান্তের কুটির প্রাঙ্গনের আসরে, বারোমাসের তেরো পরবে, সে সুর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; সকলকে আকুল করিয়াছে, সকলকে আকর্ষণ করিয়াছে, কোন জরাজীর্ণ তালপাতার পুঁথির স্তুপে সে ভাষা আত্মগোপন করিয়া থাকে নাই। রাজসভায় সে সুর বন্দী হইয়া থাকে নাই। মানুষের সমস্ত হৃদয়ের মাঝে তাহার অবস্থান। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো রৌদ্রালোকিত ধরণীর তীর্থে তীর্থে তাহার পক্ষসঞ্চার।

এই ভাষা এই সুরই লোকসাহিত্য। সাধারণ মানুষের কুটিরে তাহার জন্ম, সাধারণ মানুষের হৃদয়ে তাহার অধিবাস। তাহার মধ্যে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, হয়ত ছন্দ-কৌশলের দিক দিয়াও প্রখর আভিজাত্য নাই। কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে সে দীপ্যমান। এ ঐশ্বর্য তাহার অন্তরের অলৌকিক রসধ্বনির, সুসার্থক ব্যঞ্জনার।

ইঁটকাঠের নগর সভ্যতার বুকে বাস করিয়া আমরা ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছি। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে যে সহস্র জটিলতা আজ শতপাকের বন্ধনে আমাদিগকে ক্রমশ শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছি, কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে জটিলতা ও দুর্বোধ্যতাকে আমরা প্রকট করিয়া তুলিতেছি। সম্পূর্ণ সহজ-সরল নিরাভরণ ভাষায় যে সাহিত্যের প্রকাশ সম্ভব, যাহার মধ্যে সারল্যের অনির্বচনীয়

মহিমাটুকু সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠিতে পারে তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। লোকসাহিত্য আমাদের সম্মুখে সেই অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়টি উপস্থাপিত করিয়াছে। অজস্র ছেলেভুলানো ছড়া, যাত্রা, পাঁচালী, ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা. কবিসঙ্গীত, ভাটিয়ালী-জারি-মুর্শিদা ও বাউল গান, মাণিকপীরের গান, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, গম্ভীরা গান, টুসু গান, সারি গান, আগমনী-বিজয়া গান, প্রভৃতি অসংখ্য গীতিকাব্যের মাঝে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশের লোকসংস্কৃতির অন্তর স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে

> এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বরাবর রসের যোগে লোক শুনেছে ধ্রুব প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস. কর্ণের কবচ দান. হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব-ত্যাগ। দেশে তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যেও মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে—মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতা হেয় করতে পারে না, তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। সেদিন দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না. যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণ-ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি যে সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শন শাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ এদেশের জনসাধারণের চিত্তভূমিতে।

জনমানসে লোকসাহিত্যের অপরিসীম প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দেওয়া। কিন্তু লোকসাহিত্য আনন্দ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় উদ-বোধিত করিয়াছে। তাহাকে পাপ-পুণ্যের প্রতি সজাগ ও সচেতন করিয়াছে। তাহাকে সংসার জীবনের দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের পথে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়াছে। মেয়েলী ব্রতকথা, মঙ্গলকাব্য, 'হরিসঙ্কীর্তন, দেহতত্ত্বের গান ইত্যাদির মাধ্যমে বাঙ্গালীর সমাজ চেতনা ও ধর্মচেতনা যুগপৎ প্রকাশিত হইয়া উঠিয়াছে।

লোকসাহিত্য সমাজের বিচিত্র ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'ছেলেভুলানো ছড়াগুলির' কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ছড়াগুলি যেন শরতের স্বচ্ছ-মুক্ত-উদার আকাশের জ্যোতির্ময় আলোক। যেন প্রকৃতির ঐকতান সভায় অতি সাধারণ অথচ অনিন্দ্যসুন্দর বাঁশের বাশীর সুর ঝঙ্কার।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে।
কাজি ফুল কুড়তে গিয়ে পেলুম মালা।
হাত ঝুম্‌ঝুম্‌ পা-ঝুমঝুম সীতারামের খেলা ॥

শুধু শব্দঝঙ্কারই এই ছড়াটির প্রধান উপজীব্য। কিন্তু এই শব্দের অন্তরালে কোন সদ্যবিবাহিতা যমুনাবতীর আসন্ন শ্বশুরবাড়ী যাইবার চিত্রটি এক অপূর্ব রূপ ব্যঞ্জনা লইয়া আমাদের নিকট হাজির হইয়াছে। আর একটি বিখ্যাত ছড়া—

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান ॥

এখানে প্রত্যক্ষ বাস্তব পৃথিবীটা আমাদের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া আমাদিগকে কোন এক মায়াবলে রূপকথার জগতে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। আমাদের মায়াবন বিরহিনী মনটা এক লহমায় শিবঠাকুরের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, নদীতে বান আসিয়াছে চারিদিকে এক মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ, এই মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টির সম্মুখে ধীরে ধীরে ভাসিয়া ওঠে আর একখানি ছবি—

'এপারে গঙ্গা, ওপারে গঙ্গা, মধ্যিখানে চর ॥
তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর ॥
শিব গেল শ্বশুরবাড়ী বসতে দিল পিড়ে।
জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে ॥
শালিধানের চিঁড়ে খেয়ে, বিন্নিধানের খই।
মোটা মোটা সবরি কলা, কাগমারে দই ॥'

লোকসাহিত্য এইভাবে অবাস্তবতার মধ্য দিয়াই বাস্তবতার স্বাদ আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

হাস্যরস

ইংরাজী সাহিত্যে হাস্যরসকে এ্যাপোলো দেবের উজ্জ্বল-জ্যোতির্ময় ধনুঃশরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত সাহিত্যে যত রসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে হাস্যরসই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। একমাত্র কবিকল্পিত 'রাম-

গরুড়ের ছানা' ব্যতীত হাসির কথা শুনিলে আর সকলেই অভূতপূর্ব উদ্দীপনা অনুভব করে। মানুষের মন হইতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ক্লেদ-গ্লানি এক লহমায় দূর করিয়া তাহার হৃদয়কে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা একমাত্র হাস্যরসেরই আছে। ইতর জন্তুদের সহিত মানুষের কোন না কোন বিষয়ে সামান্য কম বেশী সাদৃশ্য আছে, কিন্তু হাস্যরসের ক্ষেত্রেই একমাত্র তাহাদের বৈসাদৃশ্য। এ পর্যন্ত মানুষের যে সংজ্ঞা পণ্ডিতগণ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই সংজ্ঞাটিই যথার্থ বলিয়া মনে হয়—'Man is a laughing animal'। বাস্তবিক, একমাত্র হাস্যরস সম্পর্কে সচেতনতা আছে বলিয়াই মানুষ আজ প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হইতে পারিয়াছে।

এক প্রকার জীবনবোধ হইতেই হাস্যরসের জন্ম। হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি এক উদার ক্ষমাসুন্দর জীবনদৃষ্টি। হাস্যরসিকের সে দৃষ্টিতে জীবন ও জগতের শত ভ্রূকুটি ও সহস্র অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কোন তিক্ত অভিযোগ নাই। হাস্যরসিক শুধু চোখে আঙ্গুল দিয়া এই বৈষম্য ও অসঙ্গতির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বিদ্রোহী নন, প্রফেট নন, তত্ত্বদর্শী নন, তিনি শুধু গভীর সংবেদনশীল একজন দ্রষ্টা। জগতের সমস্ত অসঙ্গতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে যখন সমাজ ও রাষ্ট্রনেতারা বিদ্রোহ শুরু করিয়াছেন, তখন হাস্যরসিক একান্তে চিন্তা করিতেছেন কোন অমোঘ নিয়তি ও দুর্দৈবের ফলে বিধাতার সৃষ্ট এই সুন্দর পৃথিবীর মাঝে এই অযাচিত দুর্দৈব নামিয়া আসিয়াছে। তাঁহার কাছে তাই সমাজের এই সমস্ত মানুষেরা, যাহারা দুর্দৈব ও অসঙ্গতি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারা কৌতুকের পাত্র। প্রকৃত হাস্যরস জীবন রসেরই নামান্তর। হাস্যরস তাই: Is thinking in jest while feeling in earnest.

হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি ব্যাপক এবং তাঁহার সহানুভূতি অতি সচেতন। কবির ভাবপ্রবণতা তাঁহার নাই। কারণ ইহাও তাঁহার কাছে হাস্যকর। সকল রকম সংস্কারের উর্ধ্বে প্রজ্ঞা-পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি জীবন ও জগৎকে দেখিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহার দৃষ্টি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। একজন ইংরাজ সমালোচক বলিতেছেন—

> The humourist sees life more widely and wisely than any of the seers. It is not an intense and narrow nature......the humourist can gaze at the totality of world's life......

একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে অসঙ্গতি হইতেই হাস্যরসের জন্ম। এই অসঙ্গতি উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের, কথার সহিত কার্যের। কখনও কখনও কোন অদ্ভুত বিস্ময়কর অসঙ্গত ঘটনা হাস্যরসের উপাদান হইতে পারে। এ জাতীয় হাস্যরসের সুনিপুণ শিল্পী সুকুমার রায়। তাঁহার 'কাঠবুড়োর' কথা যখন শুনি -

হাড়ি নিয়ে দাড়িমুখো কে যেন কে বৃদ্ধ
রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ।

একজন দাড়ি মুখো বৃদ্ধ রোদে বসিয়া ভিজা কাঠ চাটিয়া খাইতেছে। এই অসঙ্গত দৃশ্যটি কল্পনা করিতেই আমাদের হাসি পায়। অথবা 'বোম্বাগড়ের রাজার' কীর্তি-কাহিনী শুনাইতে গিয়া তিনি যখন বলেন—

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত ভাজা।
রাণীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা ?
পাউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রাণীর দাদা ?

তখন যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিনা তাহা এই কারণেই। বলা বাহুল্য এই প্রকার অসঙ্গত উদ্ভট চিত্রের দ্বারা আমাদের মনে যে হাস্যরস সৃষ্টি হয়, তাহা কৌতুক হাস্য।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে 'যাহা অসঙ্গত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল। হাসি পাইবার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান যায় না।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে 'কৌতুক হাস্যের মাত্রা' প্রবন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইয়াছেন। কৌতুকের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নিষ্ঠুরতাও দেখিতে পাওয়া যায়। চৌকিতে বসিতে গিয়া যে লোকটি পড়িয়া গেল, তাহার পড়িবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। এখানে তাহার পতনে ইচ্ছার সহিত কার্যের অসঙ্গতি দেখা দিল এবং এই অসঙ্গতির ফলেই হাস্যরসের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ট্র্যাজেডি ও কমেডি প্রবন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে অসঙ্গতি ট্র্যাজেডি ও কমেডি উভয়েরই উৎস। যে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া ভোগ করিবার মানসে পঞ্চপাণ্ডব কুরুক্ষেত্রের বিধ্বংসী ও লোকক্ষয়ী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, যুদ্ধ জয়ের পর দেখা

গেল যাহাদের লইয়া তিনি রাজ্যশাসন করিবেন, সে সংগ্রামে তাহারা সকলেই আত্মাহুতি দিয়াছে। তাঁহাদের রাজসিংহাসনে সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য আর একটি প্রাণীও বাঁচিয়া নাই। এই ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি হাস্যরসের বদলে করুণ রস সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং কোন অসঙ্গতির ফলশ্রুতি করুণ রস আর কাহার বা হাস্যরস সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারি যখন অনেকক্ষণ তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়। কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা মাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

হাস্যরস অর্থে এতক্ষণ আমরা Humour বা কৌতুক হাস্যের কথা বলিলাম। তবে হাস্যরসের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগও আছে। Humour, wit, satire, irony, sarcasm প্রভৃতি পাঁচ প্রকার হাস্যরসের কথা Fowler উল্লেখ করিয়াছেন।

Wit এক প্রকার বাগবৈদগ্ধ্য। একমাত্র বুদ্ধিমান শ্রোতৃবর্গের কাছেই উহার আবেদন। প্রমথ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রচুর wit-এর পরিচয় পাওয়া যায়। Satire, irony এবং sarcasm-এর মধ্যে পার্থক্য হইল, satire-এ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ সুস্পষ্ট। Irony-তে ব্যঙ্গ কিছুটা কোমল। বিদ্রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন। Sarcasm বা বক্রোক্তি সুকঠোর এবং প্রধানত বাকচাতুর্যের উপর নির্ভরশীল।

ইংরাজী সাহিত্যে Swift-এর রচনায় প্রচুর satire-এর উপাদান পাওয়া যায়। Lamb-এর রচনা কিছুটা পরিহাসতরল ও humour প্রধান। মার্ক টোয়েনের রচনায় প্রচুর humour-এর সন্ধান মেলে। বাঙ্গলাসাহিত্যে মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাদের প্রকৃত হাস্যরসিকের

দৃষ্টিভঙ্গি। হাস্যরসিকের জীবনদৃষ্টি যে ক্ষমাসুন্দর তাহার প্রমাণ এই দুইজন কবির রচনায় পাওয়া যাইবে। জীবনে অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা তাঁহাদের এই দৃষ্টিকে এতটুকুও আচ্ছাদিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস কিছুটা স্থূল এবং যেন প্রাণহীন। সেইস্থানে হাস্যরসের উৎস আদিরস, এ জাতীয় প্রবণতা প্রথমদিককার বাঙ্গলাসাহিত্যে খুব বেশী মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের হাস্যরস এ জাতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই।

পরবর্তীকালে ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রে আসিয়া এ জাতীয় হাস্যরস বিশেষ পুষ্টি লাভ করিল। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম হাস্যরসকে বিদগ্ধ সভায় পরিবেশনের উপযোগী করিয়া তুলিলেন। হাস্যরসের সহিত সেই সর্বপ্রথম রুচির সংযম আসিয়া মিশ্রিত হইল।

বাঙ্গলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথ চৌধুরী, পরশুরাম, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র-না-বি, ভাস্কর, সম্বুদ্ধ, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি শক্তিমান লেখকেরা হাস্যরসকে এক অপরিসীম মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন।

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক

সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদির সংযত, সংহত এবং দৃঢ়পীনদ্ধ নিদর্শনে বিস্মিত হইয়া আমরা বলিয়া উঠি 'ক্লাসিক'। কেন আমরা এই কথা বলি তাহা হয়ত সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ করিতে পারিব না কিন্তু আমাদের ঐ বিস্ময়াবিষ্ট উক্তির মধ্যেই 'ক্লাসিক' কথাটির অর্থ নিহিত আছে। বস্তুতঃ পরিমিতি বোধই ক্লাসিকের প্রাণধর্ম। ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এই যে সাহিত্য, সমাজ ও মানুষ সব কিছুই যে এক সুকঠোর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ তাহা স্বীকার করিয়া নেওয়া। মানুষের আবেগ ও আকাঙ্খা আছে একথা সত্য কিন্তু মানুষের এমন ক্ষমতাও আছে যাহাতে সে ঐ আবেগ ও আকাঙ্খাকে সংযত করিয়া রাখিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্ষমতার অধিকারী বলিয়াই তো সে মানুষ, উহাই তাহার মনুষ্যত্ব। মানুষের আপন মনের স্থৈর্য ও শক্তির উপর দৃঢ় আস্থাই ক্লাসিকতার মূলে রহিয়াছে। কল্পনার পাখায় ভর করিয়া ক্লাসিকবাদ

কখনও নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করেন না। তাঁহার আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্থির ও সুপরিজ্ঞাত। তিনি জানেন প্রকৃতিকে অনুসরণ করাই তাঁহার ধর্ম। এই প্রকৃতি বহিঃপ্রকৃতি বা নিসর্গ নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতি বা স্বভাবও নয়, ইহা সমগ্রভাবে সাধারণ মানবপ্রকৃতি। কারণ, 'The proper study of mankind is man.' (Alexander Pope). মনুষ্যত্বের প্রতি অনুরাগই ক্লাসিকতার আদর্শ।

ক্লাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গির কথা বলিতে গেলে প্রথমই গ্রীক ক্লাসিকতার নিদর্শনের উল্লেখ করিতে হয়। এরিষ্টটলের বক্তব্য ও দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে আমরা যে পরিমিতি বোধ দেখিতে পাই গ্রীক ক্লাসিকতার মূল বক্তব্য তাহাই। গ্রীক ক্লাসিক সাহিত্য তাহাকেই রূপ দিয়াছে যাহার মধ্যে অসম্ভাব্যতা কিছুই নাই পরন্তু যাহা বহুজন স্বীকৃত ও বহুজনগ্রাহ্য। অর্থাৎ এক কথায় ক্লাসিক সাহিত্যে কল্পনার অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হইবে না। Prof. Abercrombie-র মতে :—

> There are elements which can join together in a concord of equilibrium ; and such concord, such a health is classicism.

ক্লাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বাধাবন্ধহীন উদ্দামতার স্থান নাই। উহা সব সময়ই একটি আদর্শকে অনুসরণ করিতে চায়। নির্দিষ্ট সংজ্ঞার পরিধির মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করাকেই সে সার্থকতা মনে করে। ইংলণ্ডের মহাকবি মিলটনের দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল ক্লাসিক। মাইকেল মধুসূদনের কাব্য রূপবন্ধের দিক দিয়া মিলটনের মতই ক্লাসিকাল কিন্তু ভাবাবেগের দিক দিয়া রোমান্টিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ক্লাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। গ্রীক ক্লাসিকবাদের আদর্শ পার্থিব মানুষের উৎকর্ষ অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধ্যানে নয়, রহস্যানুসন্ধানে নয়—জ্ঞান ও কর্মের সাধনাই ক্লাসিকবাদীদের মূল নীতি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের নব্য ক্লাসিকবাদীরা শুষ্ক যুক্তিবাদকেই ক্লাসিকতার আদর্শ বলিয়া মনে করিলেন। জীবন বা মনুষ্যত্বের সাধনার সঙ্গে ইহার কোনই যোগ ছিল না। নীরস যুক্তির জালে আবদ্ধ এক প্রাণহীন ফর্মসর্বস্বতা এবং রুচিবাদই (decorum) হইল এই নব্য ক্লাসিকবাদীদের আদর্শ। ইঁহারা এতদূর রুচিবাগীশ ও ফর্ম-সর্বস্ব হইয়া উঠিলেন যে, আকাশের তারাগুলি কেন সারিতে সারিতে সাজান নয়, পাহাড়গুলি কেন এবড়ো থেবড়ো তা নিয়াও তাঁহাদের আক্ষেপের সীমা ছিল না। বলাই বাহুল্য এই রুচিবাগীশতা

এবং নীতি-উপদেশ প্রবণতা মহৎ সাহিত্যের পরিপন্থী। ইংলণ্ডের কবি আলেকজাণ্ডার পোপ এবং ফরাসী দেশের অ্যাটায়ারিষ্ট ভল্‌তেয়ার এই রুচিবাগীশ ক্লাসিকতার প্রতীক ছিলেন। মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ কল্পনার বাহিরে ইঁহারা কোনদিনও পদক্ষেপ করেন নাই। ইঁহারা কখনও হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেন না—করিতেন মস্তিষ্ক দিয়া।

এই শুষ্ক তার্কিকতা ও প্রাণহীন রুচিবাগীশতার বিরুদ্ধে ঐ শতাব্দীতেই রোমাণ্টিক আন্দোলনের বিদ্রোহ দেখা দিল। ভল্‌তেয়ারের স্থানে দেখা দিলেন রুসো আর পোপের স্থানে দেখা দিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ। জার্মান দার্শনিক কাণ্টও বলিলেন,—আর্ট হইতেছে লীলা, উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য। রোমাণ্টিক-মানসের অভিযান যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই রোমাণ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গি বলিতে আমরা কি বুঝি ?

রোমাণ্টিকবাদীরা নিজের কল্পনা বলে বাস্তব জগতের পাশাপাশি আর একটি সুন্দর রহস্যময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়া রূঢ় বাস্তবতা হইতে, দৈনন্দিন জীবনের কর্ম-কোলাহল হইতে, ধূলিধূসরিত ধরণীর ক্লেদ হইতে মুক্তি চাহেন। এই জগৎ আমাদের বুদ্ধি ও চেতনায়, আমাদের নয়নে ও মনে বাস্তবাতিরিক্ত স্বপ্নসুষমাময় একটা আবেশ সৃষ্টি করে, বাস্তবের পথ বাহিয়াই আমরা মনোহর "অবাস্তব" কাব্যলোকে প্রবেশ করি। রোমাণ্টিক বলিতে আমরা সাধারণতঃ রূপকথাসুলভ অবাস্তব চটকদার কাহিনীকেই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু ইহা রোমাণ্টিকতা নয়। রূপকথা ও বাস্তবতার মাঝামাঝি আর একটি সাহিত্যের জগৎ আছে—যাহা রূপকথার মত বাস্তবের সহিত একেবারে সম্পর্কশূন্য নয়, আবার কঠিন বাস্তবের মত যাহার শিকড় একেবারে মাটির মধ্যে প্রোথিত নয়। ঐ মধ্যবর্তী জগতের নাম রোমান্সের জগৎ। ইহা কঠিন বাস্তবময়তার জগৎ ছাড়াইয়া আমাদের মনে একটা অজানা, অচেনা, কুহেলিকাচ্ছন্ন, আনন্দময় কল্পলোকের সৃষ্টি করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার বাহিরে যে জগৎ, সেখানকার নর-নারীর জীবনের বিবরণ আমাদের পরিচিত জীবন কাহিনীর চেয়ে কম মনোহর নহে। সেইজন্যই রোমান্সের প্রভাব লেখক বা পাঠক কেহই কাটাইয়া উঠিতে পারেন না। বাঙ্গলা সাহিত্যে 'কপালকুণ্ডলা' রোমাণ্টিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রোমাণ্টিক কথাটির উৎপত্তি খুঁজিতে গেলেই উহার সঙ্গে কেন অবাস্তবতার সম্পর্কটি জড়িত রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ইউরোপের মধ্যযুগের

সাধুভাষা ল্যাটিন হইতে জাত দক্ষিণ ইউরোপের প্রাকৃত ভাষাগুলিকে 'রোমান' বলিয়া অভিহিত করা হইত। ঐ সকল ভাষায় রচিত কাহিনীগুলিকেও রোমান বলা হইত। ঐ কাহিনীগুলি খুবই অবাস্তব এবং কাল্পনিক ছিল কিন্তু উহাদের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ। রোমান্টিক বলিতে লোকে ঐ সময় হইতেই বুঝিত যে উহা চমৎকার একপ্রকার অবাস্তব জিনিষ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রোমান্স অবাস্তব নয়। ইহা স্বভাবজাত কিন্তু সভ্যতাজাত নয়। যাহাদের প্রতিভা নাই তাহাদের কাছে রোমান্টিকতার সহজ অর্থ হইল—খামখেয়ালী, খাপছাড়া একপ্রকার বিশৃঙ্খল দৃষ্টি-ভঙ্গি। বাঁধাধরা ক্লান্তিকর জীবন হইতে মানুষ মুক্তি চায়। অযৌক্তিক ও কতকাংশে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত হইলেও রোমান্স মানুষকে ঐ ঈপ্সিত মুক্তি আনিয়া দেয়। কোল্‌রিজের কবিতাগুলিতে আমরা অতিপ্রাকৃতের প্রভূত সমাবেশ দেখিলেও উহা কিভাবে আমাদের মনে 'temporary suspension of disbeliefs'-এর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় তাহা আমরা জানি। কণ্টকাকীর্ণ একঘেয়ে জীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য শেলী যখন ঝড়ের নিকট আবেদন জানান তখন আমাদের হৃদয়ে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন 'স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে' পূর্ব-জন্মের প্রিয়াকে দেখিতে মানসযাত্রা করেন তখন কি তাহা আমাদের কাছে অবাস্তব মনে হয়। বরং কবির সঙ্গে আমরাও কি সেই স্বপ্নলোকে যাত্রা করিনা? কাজেই একেবারে মাটি-ঘেঁষা না হইলেও রোমান্স আমাদের জীবনের সত্যকেই রূপায়িত করে। চোখে যাহা দেখি তাহাই শুধু সত্য নয় মনে যাহা অনুভব করি তাহাও সত্য। এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে সমুচ্চ কল্পনাশক্তির অধিকারী না হইলে রোমান্স সৃষ্টি করা যায় না এবং তাহার রসও উপলব্ধি করা যায় না।

রোমান্টিক ও ক্লাসিকাল দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য আছে একথা ঠিক কিন্তু উহারা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলিয়া যাঁহারা অভিমত পোষণ করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। কারণ একই কবিতায় এই দুই দৃষ্টি-ভঙ্গি একসঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জগৎ ও জীবনকে কবি যখন একটি নিয়মশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অবলোকন করেন তখন তিনি ক্লাসিক আবার যখনই তিনি উহাকে আপনার কল্পনার মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়া দেখেন তখন তিনি রোমান্টিক। কল্পনাশ্রয়ী কবিচিন্তা রোমান্টিক আর কল্পনাকে যখন সঙ্গতি দান করা হয় তখন উহা ক্লাসিক। কাজেই উহারা বিপরীতধর্মী নয়। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা

কাব্য' পরিপূর্ণ রোমাণ্টিকতার নিদর্শন। আবার 'মেঘনাদ-বধ' রূপকল্পের দিক দিয়া ক্লসিকাল হইয়াও আবেদনের দিক দিয়া রোমাণ্টিক হইয়া উঠিয়াছে। ক্লাসিকে কবির ব্যক্তিত্বের স্থান নেই, রোমান্সে ব্যক্তিত্বই প্রধান স্থান অধিকার করে।

রূপক ও প্রতীক

আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ কিছু নতুন কথা নয়। এই অভিযোগ আজ নাটক এমনকি উপন্যাসের বিরুদ্ধে পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ইহার কারণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু স্পষ্টতঃ যে কারণে এই অভিযোগ তাহা খুব জটিল নয়।

কাব্যের কথাই প্রথম ধরা যাক। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সংবেদনশীল হৃদয়ে নানাভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতেছে। নদী, পাহাড়, চাঁদ বা শ্যামল তৃণভূমিই শুধু নয়, একটি বিশীর্ণ বৃক্ষ, তার নিষ্পত্র শাখা, একটি নেড়ী কুকুর বা একদল ভিখারী এমন কি একটা মরা ইঁদুর পর্যন্ত কবিচিত্তকে ভাবাইয়া তোলে। এই ভাবনা কবি ভাষায় প্রকাশ করিয়া সহৃদয় পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহেন। এখানেই প্রশ্ন উঠে কবি কি ভাবে তাহা প্রকাশ করিবেন। কবির কাজতো ফটোগ্রাফার বা সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ নয় যে তিনি হুবহু শুধু দৃষ্টবস্তুর বর্ণনা দিয়াই খালাস পাইবেন। কবি তাহা পারেন না। কেননা দৃষ্টবস্তু কবির মনে নানা ভাবের সৃষ্টি করে। এই ভাবগুলি কবি দৃষ্টবস্তুর অনুরূপ (বলাই বাহুল্য ভাবের অনুরূপ) বিষয় দ্বারা প্রকাশ করেন। পূর্ণিমার চাঁদে কোন কবি প্রিয়ার মুখচ্ছবি দেখিতে পান কেউবা তাহার মধ্যে দেখেন ঝলসানো রুটির সাদৃশ্য। বস্তুগত বা গুণগত সাদৃশ্যমূলক কোন উপমার সাহায্যে কবি যখন তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করেন তখন পাঠকের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু কবি যখন ভাবমূলক সাদৃশ্যদ্বারা তাঁহার মনের আবেগকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহেন তখনই বাধে গোলমাল। কবি যখন বলেন—

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;

তখন পাঠকের মনে অনায়াসে তাহার আবেদন আসিয়া পৌছে। কিন্তু তিনি যখন,

ফাল্‌গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক্‌ বদলাবে।
কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
"অবশ্য কর্তব্য নীড়।" (মড়া কাটা ঘর,—স্থানাভাবে ?)
নখাগ্রে নক্ষত্র পল্লী ; ট্যাঁকে টুকরো অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি।

তখন চট্‌ করিয়া আমরা কবি কি বলিতে চাহেন ধরিতে পারিনা। অবশ্য কথা উঠিতে পারে পাঠকের রসোপলব্ধির ক্ষমতা নিয়া। পাঠক যদি কবির ভাব গ্রহণে অক্ষম হন তবে কবির দায়িত্ব কোথায় ? যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কথা ধরা যাইতে পারে। সকলে কি তাহার রসগ্রহণ করিতে পারে ?

অথবা আধুনিক চিত্রকলার কথাও উল্লেখ করা চলে। দুই তিনটি আঁকা-বাঁকা রেখার বন্ধনে যে এক পরম সত্য বা সৌন্দর্যকে বিধৃত করা হয় তাহা কি আনাড়ির পক্ষে বোঝা সম্ভব ?

আধুনিক নাটক এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ আজ উঠিতেছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে কবি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক এমন একটি বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করেন যাহা সব সময় পাঠকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইয়া উঠেনা। এই বস্তুই প্রতীক।

প্রতীক বা সিম্‌বল্‌ মনের ভাব প্রকাশের বাহন মাত্র। শব্দ, বাক্য, অঙ্গ-ভঙ্গি প্রভৃতি সব কিছুইতো মানুষের মনের ভাব প্রকাশের বাহন বা প্রতীক। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এরূপ বহু প্রকারের প্রতীকের সাহায্য লইয়া থাকি। বহু ব্যবহারের ফলে প্রতীকের চিহ্নগুলির কথা বিস্মৃত হইয়া আমরা শুধু তার তাৎপর্যের দিকটাই মনে রাখি। অর্থাৎ এক কথায় যে দৃষ্ট বস্তুর ভাব সাদৃশ্যে আমাদের মনে অনুরূপ অদৃশ্য বস্তুর ভাবটির উদয় হয় আমরা প্রতীক বলিতে তাহাকেই বুঝি। সঙ্কেতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে সে বক্তব্য বিষয়কে প্রথমে অপ্রকাশ করিয়া রাখে। তাহার কারণ আছে। এমন কতকগুলি ভাব বা বিষয় আছে যেগুলি অতি সাধারণভাবে বর্ণিত হইলে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। কিন্তু তাহাই যদি সঙ্কেতের মধ্যে পরিবেশিত হয় তবে অতি সহজেই আমাদের মর্মে স্থান লাভ করে। যেমন,

ডুব দিয়ে এই প্রাণ সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়।

অথবা

কতকালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

কিম্বা

তুই না জেনে তোর আপন ঘরে
যাবি কোথায়।
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে
পড়বি ধাঁধাঁয় ॥

এই আকৃতি যদি সাধারণভাবে বর্ণিত হইত তবে নিশ্চয়ই আমরা ইহাকে ভগবৎ উপলব্ধির আকৃতি বলিয়া চিনিতে পারিতাম না।

কবিরা ভাবপ্রবণ। তাঁহারা স্রষ্টা ও শিল্পী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাহার রূপ রস গন্ধ লইয়া প্রতিনিয়ত শিল্পীর মনকে আন্দোলিত করিতেছে। তাঁহারা অনুভব করেন এই জগতের অন্তরালে সীমার বাহিরে একটা সত্ত্বা রহিয়াছে। তিনি আনন্দময়। এই জগৎ এবং তাহার বিচিত্র রূপ সম্ভার সেই আনন্দময়ের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। যাহা তুচ্ছ যাহা সামান্য তাহার মধ্যেও তাঁহারা অনন্ত রহস্যের সঙ্কেত ও ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতে দেখিতে পান। এই উপলব্ধির কথা যখন তাঁহারা প্রকাশ করিতে চান তখন অনিবার্যভাবেই সঙ্কেত তাহার বাহন হইয়া পড়ে। সঙ্কেতের সাহায্যেই তাঁহারা লীলাময়কে প্রকাশ করিতে চান। জীবনের এই ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য ও সাঙ্কেতিকতা সর্বপ্রথম গীতিকবিতার ছন্দে গাঁথা পড়ে। অনিবার্যভাবে এই সাঙ্কেতিকতার সঙ্গে ঈশ্বর উপলব্ধির কথাটি আসিয়া পড়ে। আধুনিক সাহিত্য এই সঙ্কেতকে এখন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার চেষ্টায় আছে।

বস্তুতঃ সাধক বা কবি যখন ইন্দ্রিয় বা মনের সাহায্যে সত্যের আসল স্বরূপটি প্রকাশ করিতে সক্ষম হন, অখণ্ড ভাবলোকে উপনীত হইয়া তিনি নিজেই যখন এক বিদেহী বিশ্ব-চৈতন্যে পরিণত হন, যখন তিনি 'Central peace at the heart of things' অনুভব করেন। যখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন,

স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণীর মাঝখানে।

তখন তাঁহার রসাপ্লুত মন আপনিই প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করে। কবি তাঁহার এই উপলব্ধি লইয়া যুক্তি, তর্ক বা পরীক্ষার মধ্যে যান না—বোধি দ্বারা (Intuition) তাঁহার কাছে এই উপলব্ধ সত্য অন্তরের গভীর বিশ্বাসের আকারেই দেখা দেয়। এই সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানে নয়, বুদ্ধিতে নয়, মেধায় নয় প্রজ্ঞায় নয়, হয় বোধিতে।

রূপকের (allegory) এবং প্রতীকের (symbol) মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। রূপকের মূলধর্ম প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা করা। রূপকের একটি আপাত প্রবহমান অর্থ থাকে এবং সেটা খুব স্পষ্ট। কারণ রূপকের কাজ যখন ব্যাখ্যা করা, বুঝাইয়া দেওয়া, তখন তাহার মধ্যে তো অস্পষ্টতা থাকিলে চলিবে না। কাজেই রূপকের আপাত প্রবহমান অর্থটি স্বয়ং সম্পূর্ণ। কিন্তু এই অর্থই রূপকের আসল কথা নয়। এই অর্থের পাশাপাশি আর একটি অন্তর্নিহিত অর্থ রূপকের আবরণে লুকাইয়া থাকে। সেই আভ্যন্তর অর্থ উপলব্ধি করা যাইতে পারে তেমন বাহ্য কাব্যরূপ রূপকে গড়িয়া তোলা হয়। অর্থাৎ রূপকের আবেদন বুদ্ধির কাছে, মননশীলতার কাছে। এ জন্যই রূপকে অর্থ অতিশয় স্পষ্ট। রূপক অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক এবং এইজন্যই যে-মুহূর্তে রচয়িতার উদ্দেশ্যটি বোঝা গেল তৎক্ষণাৎ রূপকের বাহ্য ও অন্তরালবর্তী অর্থের স্বরূপটিও মনের দ্বারে পৌঁছাইয়া গেল। যেমন দুই বন্ধু ও ভল্লুকের গল্পটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার বক্তব্যটি জলের মত সহজ হইয়া যায়। সুইফ্‌টের 'গালিভারস্‌ ট্রাভেল', বুনিয়নের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস' রূপকের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পক্ষান্তরে প্রতীক কখনও ব্যাখ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। সে শুধু ইঙ্গিত দেয়, সাজেস্ট করে। তার কোন বাহ্য অর্থ নাই, থাকিলেও তা অতিশয় নগণ্য। অন্তর্নিহিত অর্থের না বলিয়া ভাবেরই বলা উচিত—ভাবের আলোকেই সে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে ধরা যায় না—চাই অন্তর্দৃষ্টি যাহা থাকিলে প্রতীকের আবেদনে অন্তর ভাবরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। এককথায় রূপক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে চায় আর প্রতীক শুধু নিজের সাহায্যে অর্থাৎ ইঙ্গিতের সাহায্যে অনুভূতিপ্রবণ মনকে সত্যের দ্বার-প্রান্তে পৌঁছাইয়া দেয়। সেই বিশেষ মনের যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকে তবে সে আসল সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিবে আর না থাকিলে প্রতীকের আবেদন তাহার কাছে ব্যর্থ। কারণ বুঝাইয়া দিবার দায়িত্ব প্রতীক কখনও গ্রহণ করে না। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটির কথাই ধরা যাক। 'ডাকঘর' কিসের প্রতীক ? অমল যে-রাজার চিঠির জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষা করে সেই 'রাজা' কে ? নাটকটিতে কি তাহা বুঝাইয়া দিবার কোন চেষ্টা আছে ? অথচ একমাত্র ঘোর সংসারী (মোড়লের মত) জীব ছাড়া আর সকলের কাছেই কি এই নাটকের অর্থ এক গভীর দ্যোতনা নিয়া দেখা দেয় না ? রমণীর দেহ এবং তাহার দেহলাবণ্য যেমন এক নহে অথচ দুটিকে আলাদা করা যায় না, শক্তিমান এবং তাহার শক্তি

এই দুই বস্তু যেমন আলাদা হইয়াও এক অবিচ্ছিন্ন সংযোগে আবদ্ধ তেমনই এই নাটকের বাহ্য এবং অভ্যন্তরের অর্থ কি এক গভীর নিগূঢ় অর্থ-গৌরবে আবদ্ধ নয়? বস্তুতঃ সঙ্কেতের বা প্রতীকের বৈশিষ্ট্যই তাই। কিন্তু রূপকের বাহ্য ও আভ্যন্তর অর্থের মধ্যে প্রায়ই কোন সংযোগ থাকে না। কারণ রূপক একটি বস্তুকে বুঝাইবার জন্যই অন্য একটি বস্তুকে ব্যবহার করে। আর প্রতীক যাহার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাকে বুঝাইতে পারে না বলিয়াই শুধু ইঙ্গিতে কাজ সারিতে চায়। সেই ইঙ্গিত যদি কেউ ধরিতে পারিল উত্তম, না ধরিতে পারিলে কাহারও কোন মাথা ব্যথা নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যেমন ভূতের যদি একটি মূর্তি আঁকিতে বলা হয় তবে তাহা দুইভাবে করা যায়। কবন্ধ, বুকে দুইটি চোখ এক বীভৎস মূর্তি আঁকিয়া বোঝান যায় আবার একটি শূন্য আঁকিয়াও বোঝান যায়। কারণ ভূতকে কেউ দেখে নাই অথচ তাহার সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মনে কোন না কোন প্রকারের একটি ধারণা আছে। যখন তাহার বীভৎস মূর্তিটি আঁকা হইল তখন একথা স্পষ্ট যে একটি প্রতিমূর্তি খাড়া করিয়া ভূতকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে—এইটি রূপক। কিন্তু যখন শুধু একটি শূন্য আঁকা হইতেছে তখন সুস্পষ্টরূপে কিছুই বলা হইতেছে না—শুধু অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্য করিবার একমাত্র উপায় যে অনুভূতি এবং তাহাও একেক জনের একেক প্রকার এই কথাটিই বুঝি—এটি প্রতীক। তেমনি যাহাকে "অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি"—এইরূপে জানি তাহাকে কিভাবে ফুটাইয়া তুলিব? প্রতীকের সাহায্যে।

কিন্তু অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে রূপকের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা যায় না একথা সর্বাংশে ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই কাব্যে কবি মিষ্টিক। এবং মিষ্টিকমনের বাহন রূপক ও প্রতীক এই দুইই। 'শেষ খেয়া' বা 'আগমন' প্রতীকের সার্থক প্রয়োগ কিন্তু 'বালিকা বধূ' রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। কবির esoterit (ব্যক্তিগত) অভিজ্ঞতার বাণীকে এই কাব্যে প্রতীক ও রূপক উভয়ই কাব্যশ্রী দান করিয়াছে।

কিন্তু এই প্রতীককে আধুনিক যুগের কাব্য, নাটক ও গল্প উপন্যাসে আরও ব্যাপক আরও গভীরতর অর্থে প্রয়োগ করা হইতেছে। আরও যুক্তিসিদ্ধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মন তাহাতে সাড়া দিতেছে। সাহিত্যের সত্য বিজ্ঞানের সত্যকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে।

বিজ্ঞান যতই জাগতিক রহস্য উদ্ঘাটনে তৎপর হইয়া উঠিতেছে মানুষ ততই অন্তর্মুখী হইতেছে। ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত, প্লাবন, ঝঞ্ঝা ইহারা আর মানুষের কাছে বিস্ময় নয়। মানুষ ইহাদের পশ্চাতের কারণ জানিয়া ফেলিয়াছে। তেমনি ত্রিশ বৎসর এমন কি দশ বছর আগেও মানুষ যাকে দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময় বলিয়া মনে করিত বিজ্ঞান তাহাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া দিতেছে। কিন্তু এখনও এক জায়গায় গিয়া বিজ্ঞান নিরুত্তর। সে হইতেছে এই জগতের অন্তরালবর্তী এক সত্ত্বা আছে বলিয়া যে মানুষ বিশ্বাস করে সেই সত্ত্বার স্বরূপটি কি ? বিজ্ঞান তাহার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিতেছে না। অথচ ভাবুকের মনে সেই সত্ত্বার ইঙ্গিত প্রতিনিয়ত বিশ্বসৌন্দর্যের নানা দুয়ার মধ্য দিয়া আসিয়া পৌছাইতেছে। এই জগতের বাহিরে যে আরেকটি জগৎ আছে তাহা অশ্রুত-সঙ্গীত-ধ্বনি প্রতি মুহূর্তে তাহার কানে আসিয়া অপূর্ব সুর লহরী সৃষ্টি করিতেছে। বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় বলিয়া কি তা অসত্য ? কখনই তাহা হইতে পারে না কারণ অনুভূতিতে যাহা ধরা পড়িতেছে তাহাকে অগ্রাহ্য করি কি করিয়া ?

সেই অনুভূতিকে ফুটাইয়া তোলার জন্যই প্রতীকের প্রয়োজন হইল। ইউরোপে আধুনিক সাহিত্যে তিনজন ঈশ্বর বিশ্বাসী কবি উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহাদের কাব্যে বহুল পরিমাণে এই প্রতীকের প্রয়োগ করিলেন। তাঁহারা হইতেছেন মালার্মে, ভের্লেন এবং বোদলের। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে পল ভেলেরি, রিলকে, ষ্টিফান জর্জ, আলেকজাণ্ডার ব্লক এবং ইয়েটসও আছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে এই প্রতীকের প্রভূত ব্যবহার যে-কোন পাঠকের লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু কই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তো দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আসে না। প্রতীকী নাটক সম্পর্কেও একই কথা। নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন, জার্মান নাট্যকার হাউপ্টম্যান, রুশ নাট্যকার আন্দ্রিভে, ফরাসী নাট্যকার মেটারলিঙ্ক ইঁহারা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই প্রতীকী বা সাঙ্কেতিক নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের নাটকে দুর্বোধ্যতা, crudeness, বীভৎসতা, নিয়তির নিষ্ঠুর লীলার এত ছড়াছড়ি যে পাঠক বা দর্শক জীবন সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়েন। কিন্তু রাজা, মুক্তধারা, ডাকঘর বা রক্তকরবীতে পাঠক জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজিয়া পায়, অপরিসীম সৌন্দর্যবোধে তাহার মন আপ্লুত হইয়া যায়।

মিষ্টিসিজম

মিষ্টিসিজমের সংজ্ঞাটি নিরূপণ করা বড় সহজসাধ্য নয়। তাহার কারণ মিষ্টিসিজমের সঙ্গে একটি অস্পষ্টতা অনিবার্যভাবেই জড়াইয়া রহিয়াছে। মিষ্টিসিজমের দার্শনিক ও ধর্মীয় এই দুইটি দিক আছে। এবং দর্শন ও ধর্মের মর্ম শুধুমাত্র বোধিদৃষ্টি-সম্পন্ন অনুভূতিপ্রবণ মনের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। অন্যের কাছে ইহারা শুধু তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে।

মিষ্টিসিজম বস্তুটি কি? কবি এবং সাধক, কোন কোন ক্ষেত্রে দার্শনিকরাও বটে, কল্পনা করেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একটি সত্তা আছে। এই যে স্বর্ণাভ সূর্যাস্ত, উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া, গভীর অরণ্যানী অথবা নিঃসঙ্গ মরুপ্রান্তর ইহারা সেই সত্যের ইঙ্গিত প্রতি-নিয়ত বহন করিতেছে। সমগ্র জগৎ যেন প্রতীকরূপে সেই শাশ্বত সত্তার প্রতি চক্ষুষ্মান মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু শুধুমাত্র মরমী মনের কাছেই সেই ইঙ্গিতের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। কারণ সেই আবেদন মোটেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। প্রজ্ঞা বা মেধাদ্বারা তাহাকে উপলব্ধি করা যাইবেনা। শুধু তীব্র অনুভূতি বা বোধি দ্বারাই সেই অরূপের রূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তাহাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা যায়না, তাহাকে ব্যক্ত করাও যায়না অথচ সে নিকটতম প্রতিবেশী:

> আমার বাড়ীর পাশে আরশী নগর
> সেথায় এক পড়শী বসত করে
> আমি নাম জানিনা তার।

যে-অখণ্ড বোধিদৃষ্টির (intuition) সাহায্যে কবি বা ভক্ত পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালবর্তী পরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন একাত্মতা লাভ করেন এবং নিরবধি আনন্দের স্রোতে প্রবহমান থাকেন সেই বোধি-দৃষ্টিকে বা ভক্তের সেই সত্যদৃষ্টি লাভের সাধনাকে আমরা মিষ্টিসিজম নামে অভিহিত করিতে পারি। অর্থাৎ যে বিশিষ্ট দৃগ্‌ভঙ্গীর অধিকারী হইলে মানুষ সীমিত ব্যক্তিসত্তার আড়ালে অসীম প্রাণসত্তাকে আবিষ্কার করিতে পারে, এক কণা বালুকার মধ্যেও নিখিল বিশ্বলোকের প্রতিচ্ছবি ধরিয়া রাখিতে পারে কিম্বা একটি মুহূর্তের মধ্যে অনন্ত মুহূর্তের তীব্র অতৃপ্তি খুঁজিয়া নিতে পারে সেই অত্যদ্ভুত অনুভূতিকেই মোটামুটিভাবে মিষ্টিক চেতনা আখ্যা

দেওয়া যাইতে পারে। বলাই বাহুল্য ইহা কোন মতবাদ নয় শুধু অনুভূতি মাত্র। তাই ইহার সংজ্ঞা আর বেশী স্পষ্ট করা সম্ভব নয়।

মিষ্টিক কবির ধ্যানদৃষ্টিতে বাহিরের এবং অন্তরের জগৎ এক পরম ঐক্যে বিধৃত হইয়া দিব্যানুভূতির আলোকে নিত্য উদ্ভাসিত। তাঁহাদের কাব্যের মধ্যে তাই অনির্দেশ্য বিস্ময়-ব্যাকুলতা অথবা বেদনার সুর-মূর্ছনা ধ্বনিত হইয়া উঠেনা, অতৃপ্তির হাহাকারও তাঁহাদের কাব্যকে অকারণে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলেনা বরং সমাহিত, শান্ত, স্নিগ্ধ এক সত্যের জ্যোতি বিকীরণে কবির চিত্ত সহসা আলোকিত হইয়া উঠে। কবি তখন —"in the position of a man who, in a world of blindmen, has suddenly been granted sight, who gazing at the sunrise, overwhelmed by the glory of it, tries, however faultingly, to convey to his fellows what he sees". কবির কাছে ইহাইতো পরম মুহূর্ত।

কবি তখন প্রকাশ করিতে চান, আপন উপলব্ধিকে, ভাষার শৃঙ্খলে রূপদান করিতে চান কিন্তু পারেন না। কারণ সেই সত্য তখন—

> সে শুধু পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
> ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে।

তিনি উপলব্ধি করেন—সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি।

সেই অনির্বচনীয় সুর হৃদয়ের নিভৃতে নিত্য ধ্বনিত হইতে থাকে, তাহাকে শোনা যায় কিন্তু চেনা যায়না—তাহাকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু প্রকাশ করা যায় না; কবি তাহার প্রহেলিকাময় মায়াডোরে বাধা পড়েন। কিন্তু তাঁহার অনুভূতির মধ্যে অস্পষ্টতা নাই কারণ :—

> And I have felt
> A presence
> A motion and a spirit, that impels
> All thinking things, all objects of all thought,
> And rolls through all things.

ইংরাজ কবি ব্লেক এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিবৃন্দ, বাউল এবং সুফী মতাবলম্বী ধর্ম সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে এই দৃষ্টির চরম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি।

সাহিত্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য রমণীরা অঙ্গে যে-সকল ভূষণ ধারণ করিয়া থাকেন তাহাই অলঙ্কার। 'অলম্' শব্দের একটি অর্থ হইতেছে ভূষণ। কাজেই যাহা দ্বারা ভূষণ করা হয় তাহাই অলঙ্কার। কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কবিগণ এই অলঙ্কারের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইংরাজীতে এই অলঙ্কারকে 'Figure of Speech' বলা হয়।

কাব্য-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য অলঙ্কারের প্রয়োগ করা হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে সার্থক অলঙ্কারের প্রয়োগ না হইলে কাব্যের সৌন্দর্য বা 'লাবণ্য' ফুটিয়া উঠে না। রমণীদেহে যত্র তত্র অলঙ্কার পরাইলেই যেমন তাহার লাবণ্য বিকশিত হয় না তেমনি কাব্যদেহেও অলঙ্কারের ব্যর্থ প্রয়োগ তাহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে না। আচার্য বামন এই জন্যই কাব্যের অলঙ্কারকে বলিয়াছেন, 'সৌন্দর্যমলঙ্কার'—সৌন্দর্যই অলঙ্কার। কি করিয়া অলঙ্কার কাব্যের এই সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করে অলঙ্কারবাদীরা তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আলোচিত শাস্ত্রই হইতেছে 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' বা 'কাব্যসৌন্দর্য-বিজ্ঞান'। ইংরাজীতে ইহাকেই 'Aesthetic of Poetry' বলা যাইতে পারে। ধ্বনি, রস, বক্রোক্তি, রীতি প্রভৃতি যে-সকল শব্দ অহরহ কাব্যালোচনায় ব্যবহৃত হয় তাহা এই অলঙ্কার-শাস্ত্রের অন্তর্গত। এই শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত না হইলে ধ্বনি, রস ইত্যাদির সম্যক উপলব্ধি হইবেনা।

ধ্বনিবাদীরা ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 'ধ্বনি' কাহাকে বলে?

> যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেছেন। এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিভাষা হল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন, 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।'—অতুল গুপ্ত। [১]

(১) 'ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি' এবং 'রস ও ভাব'—অধ্যায়ে ধ্বনি ও রস সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

আবার রসধ্বনিই ধ্বনিবাদীদের মতে শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। রস কি? 'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (conciousness) আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার'।

প্রত্যেক কাব্যেরই একটি বিষয়বস্তু থাকে। বাচ্য দ্বারাই এই 'বিষয়' বর্ণিত হইয়া থাকে। যে অলঙ্কার শুধুমাত্র এই বাচ্যের শোভা সম্পাদন করিতে গিয়া নিজের শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলে তাহাকে 'বাচ্যালঙ্কার' বলে। এই অলঙ্কার শুধু কাব্যের বহিরঙ্গ শোভা। কিন্তু অনেক সময় (সুকবির প্রতিভার বলে) বাচ্য, বস্তু বা অলঙ্কার যখন নিজেদিগকে গৌণ করিয়া অন্য কিছুর (অন্য অলঙ্কারের) ব্যঞ্জনা করে তখন তাহাকে 'অলঙ্কারধ্বনি' বলা হয়। যেমন,

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পাদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

বাচ্যার্থ এখানে অতি স্পষ্ট, এই বাচ্যার্থ হইতে অনুরণনক্রমে ধ্বনিত হইতেছে শারদশশী হইতেও সে মুখের উৎকর্ষ। শারদশশীর সহিত কেবলমাত্র তাহার পদনখের তুলনা হইতে পারে। বাচ্য ও বস্তু নিজেকে গৌণ করিয়া এইস্থানে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কারকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। ইহাই 'অলঙ্কারধ্বনি'। অর্থাৎ এখানে অলঙ্কার নিজেই অলঙ্কার্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন বলা হয় 'মেঘের ভূষণ হইতেছে সৌদামিনী', তখন অলঙ্কার বাচ্যের শোভা সম্পাদন করিতেই তাহার শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে অর্থাৎ সে অন্য কোন কিছুর ব্যঞ্জনা করিতে পারিতেছে না। ইহাই 'বাচ্যালঙ্কার'। কোন্ কোন্ অলঙ্কারের প্রয়োগে বাচ্যালঙ্কার হয় আর কি ভাবেই বা অলঙ্কারধ্বনি হয় তাহাই প্রধানতঃ বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু তৎপূর্বে বিভিন্ন অলঙ্কারের সংজ্ঞা ও স্বরূপ জানা অত্যাবশ্যক।

অলঙ্কারের সৌন্দর্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ অলঙ্কারের তিনটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন—(১) বহিরঙ্গ অলঙ্কার—যে অলঙ্কারকে কাব্যদেহ হইতে সহজেই বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব (যেমন নারীদেহের অলঙ্কার কঙ্কণ, কুণ্ডল ইত্যাদি)। (২) মিশ্র অলঙ্কার—যেমন কেশবিন্যাসাদি প্রসাধনকলা। (৩) অন্তরঙ্গ অলঙ্কার—যেমন অলকা-তিলকা পত্রলেখা প্রভৃতি। সুকবির পদ সংঘটনায় অলঙ্কারের এই বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। উপরিউক্ত অলঙ্কার সমূহের মধ্যে অন্তরঙ্গ অলঙ্কারই সার্থক কাব্যালঙ্কার।

অলঙ্কারের শ্রেণীবিভাগ

কতকগুলি শব্দার্থময় বাক্যের সমন্বয়েই কাব্য গড়িয়া উঠে। আর শব্দ (ধ্বনি) ও অর্থ এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই বাক্যের সৃষ্টি হয়। কাব্যের অলঙ্কার সেই জন্যই শব্দ (ধ্বনি) ও অর্থ এই উভয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইতে পারে। এই অলঙ্কার ধ্বনি-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং অর্থ-সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করে। অলঙ্কারের এই দ্বিবিধ ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া অলঙ্কারকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) শব্দালঙ্কার (২) অর্থালঙ্কার।

শব্দালঙ্কার

শব্দালঙ্কার ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পাদন করিয়া কর্ণকুহরে সঙ্গীতের সুষমা বহন করিয়া আনে। যেমন—'সপ্তকোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'। এই অলঙ্কারের আবেদন প্রধানতঃ শ্রুতির কাছে অর্থাৎ এই অলঙ্কারের ভিত্তি ধ্বনি। এই অলঙ্কারকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) বর্ণাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য—ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস। (২) পদাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য—শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি ও পুনরুক্তবদাভাস। (৩) বাক্যাশ্রিত ধ্বনি-সৌন্দর্য—সর্বযমক, বাক্যশ্লেষ।

ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি—আপাতত অর্থহীন এক শ্রেণীর শব্দ যখন শুধুমাত্র ধ্বনিদ্বারাই আমাদের মনে অর্থকে ব্যঞ্জিত করিয়া তোলে তখন তাহাকে ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে ইহাকে Onomatopoeia (sound echoing sense) বলে। যেমন—হৈ হৈ, রৈ রৈ, টুক টুক, খান্ খান্, ছলাৎ ছলাৎ, বক বক ইত্যাদি শব্দ সহযোগে গঠিত বাক্যসমূহ।

চরকার ঘর্ঘর পড়্শীর ঘর ঘর!
ঘর ঘর ক্ষীর সর,—আপ্নায় নির্ভর!

ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের পার্থক্য এই যে, একই ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয় কিন্তু ধ্বন্যুক্তিতে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি নাও হইতে পারে। যেমন,

(১) এহেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার
(২) এ নহে কুঞ্জকুন্দকুসুমরঞ্জিত

অনুপ্রাস—একই বর্ণ অথবা বর্ণসমষ্টি যুক্ত বা বিযুক্তভাবে বারবার ধ্বনিত হইলে

অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। মনে রাখিতে হইবে যে ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্যকেই অনুপ্রাস বলে। ইহার ইংরাজী নাম—Alliteration. অনুপ্রাস পাঁচ প্রকার—(১) সরল অনুপ্রাস বা বৃত্ত্যনুপ্রাস—ইহাতে একটি বর্ণই দুই বা ততোধিক বার ধ্বনিত হয়। যেমন, 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে', বা 'করি লুণ্ঠন অবগুণ্ঠন বসন খোল্'। এই অলঙ্কারে ব্যঞ্জনবর্ণের গুচ্ছও একই ক্রমে যুক্ত বা অযুক্তভাবে অনেকবার ধ্বনিত হয়। যেমন, (ক) 'না মানে শাসন বসন বাসন অশন আসন যত'। (খ) 'শিশির-কণায় মাণিক ঘুমায়, দূর্বাদলে দীপ জ্বলে'। ইহাকে গুচ্ছানুপ্রাস বা মালানুপ্রাসও বলা হয়। (২) ছেকানুপ্রাস—দুইটি বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি যুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় ক্রমানুসারে দুইবার মাত্র ধ্বনিত হইলে ছেকানুপ্রাস হয়। এই অলঙ্কারের প্রয়োগ পণ্ডিতজনেরা সমধিক পছন্দ করেন বলিয়া ইহার নাম ছেকানুপ্রাস ('ছেক' শব্দের অর্থ হইতেছে পণ্ডিত)। যেমন, (ক) 'যদি না পাই কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে'। (খ) 'সে যে মুক্ত কেশীর শক্ত বেড়া'। (৩) শ্রুত্যনুপ্রাস—বর্ণমালা কণ্ঠ, তালু, নাসিকা প্রভৃতি স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। একই স্থান হইতে উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলা হয়। যেমন, (ক) 'ঈশান কোণে বিষাণ বাজে' (খ) 'দেখিয়া বিশ্বের লাগে পরম বিস্ময়' (গ) 'ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া'। (৪) অন্ত্যানুপ্রাস—একটি কবিতায় দুই চরণের অন্তে যে মিল থাকে তাহাকে অন্ত্যানুপ্রাস বলে। বাঙ্গলা পয়ারের ইহা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান ॥

(৫) লাটানুপ্রাস—অর্থসমেত একটি শব্দের পুনরাবৃত্তি হইলে লাটানুপ্রাস হয়। অবশ্য তাৎপর্যের দিক দিয়া এই অর্থের পার্থক্যও কখনও কখন লক্ষিত হয়। যেমন, (ক) 'যাও যাও, কত ভাব জানা সব আছে'। 'যাও' শব্দের পুনরুক্তির দ্বারা ক্রোধ সূচিত হইতেছে। (খ) 'গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি সুন্দর ধরাতল।'

যমক—বিভিন্নার্থে একই শব্দে পুনরাবৃত্তির ফলে যে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তাহাকে যমক অলঙ্কার বলে। 'যমক' শব্দের অর্থ হইতেছে 'যুগ্ম'; শব্দের দুইবার প্রয়োগ হয় বলিয়া এই 'যমক' নাম। অনুপ্রাসে (লাটানুপ্রাসে) একটি শব্দ একই অর্থে বাক্য মধ্যে পুনরাবৃত্ত হয় কিন্তু যমকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে শব্দের

পুনরাবৃত্তি ঘটে। যমক চারি প্রকার—

(১) ভারত ভারত খ্যাত আপনার গুণে। আদিতে যমক থাকায় আদ্য-যমক। ভারত—কবি ভারতচন্দ্র। ভারত—ভারতবর্ষ।

(২) এখন মিলেছে তারা তারার সনে। মধ্যে যমক মধ্যযমক। তারা—চোখের তারা। তারা—মহাবিদ্যা।

(৩) আট পণে আধ সের কিনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥

শেষে যমক থাকায় অন্ত্যযমক। চিনি—মিষ্টি দ্রব্য। চিনি—জানি।

(৪) পদের আদি, মধ্য ও অন্তে একই সঙ্গে যমকের প্রয়োগ হইলে তাহাকে সর্ব যমক বলে।—যেমন,

কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।
কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে॥

প্রথম চরণে কান্তার—পত্নীর, আমোদ—আনন্দ, কান্ত—স্বামী, সহকারে—সঙ্গে। দ্বিতীয় চরণে কান্তার—বনভূমি, আমোদ—সৌরভ, কান্ত—বসন্তকাল, সহকারে—সমাগমে। ইংরাজী Pun-এর সঙ্গে যমকের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

শ্লেষ—একটি ভিন্নার্থক শব্দের উভয় অর্থ লক্ষ্য করিয়াই যখন তাহাকে বাক্য-মধ্যে ব্যবহার করা হয় তখন শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যমকে শব্দটি যেখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দুইবার বা বহুবার প্রয়োগ করা হয়, শ্লেষে সেখানে শব্দ দুইটি সংযুক্ত হইয়া একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অর্থ যমকেরই মত ভিন্ন থাকিয়া যায়। এইজন্যই মনে হয় শ্লেষ যেন যমকেরই একটি পরিণত রূপ। শ্লেষের সঙ্গেও ইংরাজি Pun-এর গভীর সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ শ্লেষ ও যমক এই উভয় মিলিয়াই Pun. শ্লেষ দুই প্রকার :

(১) শব্দকে না ভাঙ্গিয়া দুই বা অধিক অর্থে প্রয়োগ করিলে অভঙ্গ শ্লেষ হয়। যেমন,

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥

ইহার এক অর্থ—আমার স্বামী 'অত্যন্ত বুড়া'; সে 'ভাঙ খোর'; তাহার 'কোন গুণ নাই'; আমার 'পোড়াকপাল'। অন্য অর্থ—আমার স্বামী 'অনাদি'; তিনি 'মুক্ত পুরুষ'; তিনি 'গুণাতীত' (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত) এবং তাঁহার ললাটে 'অগ্নি' (যাহা দ্বারা মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল।)

(২) যেখানে মূল শব্দে এক অর্থ এবং শব্দটিকে ভাঙ্গিলে আর এক অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে হয় সভঙ্গ শ্লেষ। যেমন—'রাবণ বধের হেতু জান কী ?' —'রাবণ বধের হেতু জানকী'।

'শ্লেষ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ ব্যঙ্গোক্তি (taunt) বুঝি। কিন্তু অলঙ্কারে 'শ্লেষ' শব্দের অর্থ 'সংযোগ' বা 'আলিঙ্গন'।

বক্রোক্তি—বক্রোক্তি বলিতে আমরা সাধারণতঃ 'বাঁকা কথা' বুঝিয়া থাকি। আচার্য কুন্তক বক্রোক্তিকেই কাব্যের প্রাণ বলিয়াছেন (সাহিত্যে বাণী-ভঙ্গি ও রীতি প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে)। কিন্তু অলঙ্কার রূপে বক্রোক্তি এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বক্রোক্তিতে দুইটি পক্ষ থাকে—বক্তা ও শ্রোতা। বক্তা একটি ভিন্নার্থক শব্দকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলেন আর শ্রোতা বক্তার অভিপ্রেত অর্থকে গ্রহণ না করিয়া অন্য অর্থে গ্রহণ করিলে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার দুই প্রকার।

(১) **শ্লেষ বক্রোক্তি**—বক্তা যে অর্থে শব্দ প্রয়োগ করেন প্রতিবক্তা অন্য অর্থে গ্রহণ করিলে শ্লেষ বক্রোক্তি হয়। যেমন,

প্রশ্ন—'বলি এত সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?'
উত্তর—'সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয়।'

এখানে সুরা+আসক্ত (সুরা = মদ) এই অর্থে প্রশ্ন করা হইয়াছে কিন্তু প্রতি-বক্তা সুর = দেবতা এই অর্থ করিয়া উত্তর দিয়াছেন।

(২) **কাকু-বক্রোক্তি**—'কাকু' মানে কণ্ঠস্বর। যে বক্রোক্তি বক্তার কণ্ঠ-স্বরের উপর নির্ভর করে তাহাই কাকু-বক্রোক্তি। যেমন—'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?' অর্থাৎ পদ্মের পাপড়ি কি কেউ ছিঁড়ে ? বলাই বাহুল্য ছিঁড়ে না। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যে Affirmation এখানে Negation হইয়াছে।

পুনরুক্তবদাভাস—বাক্যে যখন একার্থক অথচ পৃথক আকৃতিবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয় এবং শুনিবার সময় এইগুলিকে পুনরুক্ত বলিয়া মনে হইলেও যদি দেখা যায় যে, আসলে তাহারা পুনরুক্ত নয় তবে পুনরুক্ত-বদাভাস অলঙ্কার হয়। যমক ও পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কারের পার্থক্য এই যে যমকে ভিন্নার্থক একই প্রকারের শব্দ বিভিন্ন অর্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয় কিন্তু পুনরুক্ত-বদাভাসে একার্থক ভিন্নাকৃতি দুইটি বা ততোধিক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য অনুযায়ী বারবার ব্যবহৃত হয়। আবার লাটানুপ্রাসে একার্থক একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য অনুসারে একাধিকবার উচ্চারিত হয় কিন্তু পুনরুক্তবদাভাসে একার্থক ভিন্ন

ভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য অনুযায়ী একাধিকবার ব্যবহৃত হয়। পুনরুক্ত-বদাভাসের দৃষ্টান্ত :—

(ক) একরত্তি ছোট ছেলে। এখানে 'একরত্তি' আর 'ছোট'-র অর্থ একই। তবুও একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, 'ছোট'-র উপর বিশেষ গুরুত্ব দিবার জন্যই 'একরত্তি' কথাটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আপাতশ্রবণে একই অর্থের পুনরাবৃত্তি মনে হইলেও ইহাদের তাৎপর্য বিভিন্ন।

অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কারের ভিত্তি অর্থ। যে অলঙ্কার দ্বারা অর্থের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় তাহা অর্থালঙ্কার। এই অলঙ্কারের আবেদন মানুষের বুদ্ধির কাছে। অর্থালঙ্কারকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—(ক) সাদৃশ্যবোধজনিত অলঙ্কার (খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার (গ) গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার (ঘ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার (ঙ) অন্যান্য অলঙ্কার। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পার্থক্য করা যায় না। পার্থক্য যাহা হয় তাহা সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের দিক হইতে। শব্দালঙ্কারে ধ্বনির সৌন্দর্য অর্থ হইতে প্রধান এবং অর্থালঙ্কারে অর্থের সৌন্দর্য ধ্বনি হইতে প্রধান। একটির আবেদন মানুষের শ্রুতির নিকট অপরটির আবেদন বুদ্ধির নিকট। অনেক সময় দেখা যায় একই অলঙ্কার শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার দুইই হইতে পারে। যেমন, 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ'—ইহা শ্লেষ এবং ব্যাজস্তুতি দুইই হইতে পারে।

(ক) সাদৃশ্য বোধজনিত অলঙ্কার

অর্থালঙ্কারের অধিকাংশই সাদৃশ্যবোধজনিত অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে। এই অলঙ্কারের প্রধান উপকরণ তিনটি : (১) উপমেয় (২) উপমান (৩) সাধারণ ধর্ম। যাহা উপমার বিষয়ীভূত হয় অর্থাৎ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া অলঙ্কারটি সৃষ্ট হয় তাহাকে 'উপমেয়' বলে। যেমন—তাহার দন্তরাজি মুক্তার ন্যায় শুভ্র। এখানে 'দন্তরাজি' উপমার বিষয়ীভূত, ইহাই প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, এইজন্য ইহা উপমেয়। বর্ণনীয় বিষয়কে অপরের সঙ্গে তুলনায় পরিস্ফুট করা হয়। যাহার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয় তাহাকে 'উপমান' বলে। 'মুক্তা' জিনিষটি বর্ণনীয় বিষয় 'দন্তরাজি'-রই

সাধর্ম্যসূত্রে (শুভ্রতার দিক দিয়া) আকৃষ্ট বাহিরের পদার্থ। ইহার সঙ্গে দন্তরাজির তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এই যে উপমান ইহাকে 'অপ্রকৃত'ও বলা হয়। যে 'অপ্রকৃত' বিষয়ের সহিত 'প্রকৃত' বিষয়ের তুলনা করা হয় সেই 'অপ্রকৃত' বিষয়কে উপমান বলা চলে। শুভ্র শব্দটি উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম বোধক। অর্থাৎ শুভ্রতা 'দন্ত' ও 'মুক্তা'য় সমভাবে বিদ্যমান। এই সাধারণ ধর্মেরই বলে বাহিরের একটি বিশেষ বস্তুবর্ণনায় আকৃষ্ট হইয়া তুলনা সম্পন্ন করে। বস্তুর ঐ সাধারণ ধর্মই উপমার ভিত্তি। আরও একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তুলনা ভিন্ন-জাতীয় বস্তুর মধ্যে না করিলে তাহা অলঙ্কারের পর্যায়ভুক্ত হইবে না। যেমন 'রাম দেখিতে শ্যামের মত'– অলঙ্কার নয়। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্যের আবিষ্কার করাই অলঙ্করণের লক্ষ্য। কবি যখন বলেন, 'পাখীর নীড়ের মত চোখ', তখনই অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। 'সমান, মতন, তুল্য, সদৃশ, ন্যায়, যেন, হেন, মত', প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক প্রত্যয় সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, সন্দেহ, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, প্রতীপ, অতিশয়োক্তি, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, দীপক—ইহারা সাদৃশ্যবোধজনিত অলঙ্কার।

উপমা—ভিন্ন জাতীয় দুইটি বস্তুর মধ্যে যে সাদৃশ্য থাকে, তাহাকে যদি এক-বাক্যে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে উপমা অলঙ্কার হয়। যেমন 'অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি।' জলরাশি নীল, আকাশও নীল। ভিন্ন জাতীয় বস্তু হইলেও ইহাদের মধ্যে 'নীল' এই সাদৃশ্য আছে এবং ইহা একবাক্যে প্রকাশ করা হইল। 'জলরাশি' উপমেয় 'আকাশ' উপমান, 'নীল' সাধারণ ধর্ম। উপমাকে এই কয়ভাগে ভাগ করা যায় :—(১) পূর্ণোপমা– উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ (সমান, তুল্য ইত্যাদি) উপমা অলঙ্কারের এই চারিটি বৈশিষ্ট্যই যে উপমায় উপস্থিত তাহাকে পূর্ণোপমা বলে। যেমন, 'কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়'। 'কানুর পিরীতি' উপমেয়, 'চন্দন' উপমান, 'রীতি' (মত) সাদৃশ্য বোধক পদ, 'ঘষিতে সৌরভময়' সাধারণ ধর্ম। (২) লুপ্তো-পমা—যে উপমায় সাদৃশ্যবাচক পদ, সাধারণ ধর্ম এবং উপমান—এই তিনটির মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটি লুপ্ত থাকে তাহাকে লুপ্তোপমা বলে। যেমন—'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' (সাদৃশ্যবাচক শব্দ 'যেমন' লুপ্ত)। 'পাণি তব পল্লব সমান' ('কোমল' এই সাধারণ ধর্মের লোপ)। 'মুখখানি তার ঢলঢল' (তরল পদার্থের মত ঢলঢল—'তরল পদার্থ' এই উপমান লুপ্ত, ইহা অনুভূতি

সাপেক্ষ)। (৩) স্মরণোপমা—কোন সামগ্রীর অনুভব হইতে তৎসাদৃশ্য অন্য কোন সামগ্রীর স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিলে স্মরণোপমা হয়। যেমন, 'এই পদ্ম দেখে তোমার মুখ যে মনে পড়ে' (মুখের সঙ্গে পদ্মের তুলনা)। (৪) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের উপমা—'বস্তু' মানে উপমেয়ের ধর্ম, 'প্রতিবস্তু' মানের উপমানের ধর্ম। উপমানের ধর্মটি উপমেয়ের ধর্মেরই অনুরূপ, তাহাদের অর্থ এক, কেবল শব্দ দুইটি পৃথক। যে উপমার উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন অর্থাৎ ধর্ম দুইটির ভাষা ভিন্ন কিন্তু অর্থ এক এবং সাদৃশ্যবাচক পদটি লুপ্ত নয়, তাহাকে বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমা বলে। যেমন, 'ফুটিল পদ্ম আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র উঠে'—এখানে 'ফুটিল' ও 'উঠে' ক্রিয়া দুইটির কাজ স্বতন্ত্র হইলেও আসলে ইহারা এক অর্থাৎ আকাশে যেমন চাঁদ উঠে সরোবরে তেমনই পদ্ম ফোটে। সরোবর = আকাশ, চাঁদ = পদ্ম। ধর্ম দুইটি রূপে পৃথক হইলেও একার্থক অর্থাৎ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। (৫) বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা—'বিম্ব' মানে উপমেয়ের ধর্ম, 'প্রতিবিম্ব' উপমানের ধর্ম। যে উপমায় উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম দুইটি শব্দ ও অর্থের দিক হইতে একেবারে ভিন্ন, শুধু তাহাদের সাদৃশ্য প্রণিধানগম্য এবং যাহাতে সাদৃশ্যবাচক শব্দ সর্বদা উপস্থিত তাহাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা বলে। যেমন,

> কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো,
> যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।

জীব ভবে আসিবার আশা করিয়াছিল কিন্তু তাহার আসাই সার হইল। কারণ অসার সংসার-রসে মজিয়া গিয়া সে আসল রসের সন্ধান পায় নাই। ভ্রমর যেমন চিত্রে অঙ্কিত পদ্মকে আসল পদ্ম বলিয়া ভুল করিয়া পড়িয়া রহিল জীবও তেমনই সংসার-রসকে আসল রস বলিয়া মনে করিয়া ভুলিয়া থাকিল। ঐ যে সাদৃশ্য যাহা 'যেমন' এই সাদৃশ্যবাচক শব্দ দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে উহাকে বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের উপমা বলে। 'জীব' উপমেয়—'আসামাত্র হলো'—উপমেয়ের ধর্ম-ইহাই 'বিম্ব': 'ভ্রমর' উপমান—'চিত্রের পদ্মেতে...... রলো'—উপমানের ধর্ম-ইহা প্রতিবিম্ব। (৬ মালোপমা—একটি মাত্র উপমেয়কে ফুটাইবার জন্য যখন একাধিক উপমান ব্যবহৃত হয়। যেমন,

> 'সুন্দর আনন তব স্ফুট পদ্মসম.
> কিংবা যথা পূর্ণচন্দ্র শারদ গগনে—'

উপমেয় 'আনন'কে ফুটাইবার জন্য 'পদ্ম', 'চন্দ্র'—একাধিক উপমান ব্যবহার করা

হইয়াছে। অর্থাৎ উপমার মালা সৃষ্টি করা হইয়াছে। (৭) মহোপমা (Epic Simile অথবা Homeric Simile) মহাকাব্যের উপযোগী উপমাকে মহোপমা বলা হয়। যেমন,

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে, হানে
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে।

এখানে উপমানের বিশদ বর্ণনা রহিয়াছে। 'বিহঙ্গী' এই উপমানকে বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে উপমেয় 'সতী'কে (সীতা) ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। মাহোপমা একাধিক উপমানের সাহায্যে করা হয়।

রূপক—উপমেয় ও উপমানের অভেদরূপ (উপমেয়কে গোপন না করিয়া) কল্পনা হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। যেমন,

এমন মানব-জমিন রইলো পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

'মানব' উপমেয় ; 'জমিন' উপমান। মানবকে আবাদ করা যায় না কিন্তু তাহাকে জমিনের সহিত তুলনা করিলে আবাদ করিয়া সোনা ফলানো যায়। উপমেয় ও উপমানকে এইভাবে অভেদ কল্পনা করা হইয়াছে। উপমেয় উপমানের রূপেই সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়াছে। এখানে উপমানের প্রাধান্য থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উপমেয়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপকের ইংরাজির Metaphor-এর মিল সঙ্গে আছে (যেমন, A camel is the ship of desert.)। রূপক অলঙ্কারকে চারভাগে ভাগ করা যায়—(১) নিরঙ্গ রূপক— একটি উপমেয়ের উপর একটি উপমানের আরোপ। যেমন —খেয়েছ বিষয়-মদ সে মদের ঘোর ঘুচে না। (২) মালারূপক —একটি উপমেয়ের উপর একাধিক উপমানের আরোপ। যেমন—

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥

(৩) সাঙ্গরূপক—(স+অঙ্গ) অর্থাৎ অঙ্গসমেত। যে রূপকে উপমেয় ও উপমানকে তাহাদের অঙ্গসমেত (উপমেয়ের ও উপমানের বিভিন্ন অঙ্গ থাকিতে পারে) অভেদ কল্পনা করা হয়। যেমন,

শোকের ঝড় বহিল সভাতে
শোভিল চৌদিকে সুর সুন্দরীর রূপে
বামাকুল, মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিঃশ্বাস প্রবল বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।

—শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক ; 'শোক' উপমেয়, 'ঝড়' উপমান ; ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রুবারিধারা শোকের অর্থাৎ উপমেয়ের অঙ্গ ; সুরসুন্দরী = বিদ্যুৎ, জীমূতমন্দ্র = মেঘগর্জন, মুক্তকেশ মেঘমালা ইত্যাদি ঝড়ের অর্থাৎ উপমানের অঙ্গ। এইভাবে অঙ্গসমেত উপমেয় এবং উপমান এখানে অভেদরূপে কল্পিত হইয়াছে। (৪) পরম্পরিত রূপক—কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত রূপক। যখন একটি বস্তুতে রূপের আরোপ হওয়ার ফলে, তাহার সহিত সম্পর্কিত অন্য বস্তুতেও রূপের আরোপ ঘটে তখন পরম্পরিত রূপক হয়। যেমন,

সংসার-সাগর দুঃখ-তরঙ্গের খেলা
আশা তার একমাত্র ভেলা।

'সংসার-সাগর'—রূপক ; ইহাতে দুঃখ-তরঙ্গের খেলা আরোপিত হওয়ায় 'আশা' রূপ 'ভেলা'র রূপক কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই এখানে পরম্পরিত রূপক। (৫) অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক :—(অসম্ভব ধর্মযুক্ত রূপক)—। উপমানে কোন অবাস্তব (অধিক+আরূঢ়) গুণধর্ম কল্পনা করিয়া তাহা যদি উপমেয়ে আরোপিত হয়। যেমন,

থির বিজুরি নবীনা গৌরী
পেখনু ঘাটের কূলে।

'নবীনা গৌরী' (রাধা) উপমেয় ; তাহাতে 'বিজুরি' এই উপমানের ধর্ম আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু 'বিজুরি' কখনও স্থির হয় না। উপমানের এই ধর্ম অধিকারূঢ় (অসম্ভব)।

উৎপেক্ষা—(সংশয়)—গভীর সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে যদি উপমান বলিয়া সংশয় হয়। উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার—(১) বাচ্যোৎপ্রেক্ষা—'যেন', 'বুঝি' 'মনে হয়', 'জনু' প্রভৃতি সংশয়-বাচক শব্দের প্রয়োগে যখন উপমেয়কে উপমান বলিয়া সংশয় হয়। যেমন,

'বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।'

যুবতী (সরমা) সীতার পদতলে বসিলেন, মনে হইল যেন তুলসীর মূলে সুবর্ণ প্রদীপ দীপ্তি পাইতেছে। বলা বাহুল্য, উপমেয় সরমার স্নিগ্ধকান্তি রূপ বর্ণনাই এখানে কবির উদ্দেশ্য। কিন্তু উপমানের (সুবর্ণ দেউটি) বর্ণনাও এখানে অত্যন্ত প্রাধান্য পাইয়াছে—ফলে সংশয়। (২) প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা—যে উৎপ্রেক্ষায় 'যেন', 'মনে হয়' ইত্যাদি সংশয়বাচক শব্দগুলি অনুপস্থিত থাকে, সম্ভাবনার ভাব প্রতীয়মান (অনুমান) হয়। যেমন,

'লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে।'

অর্থাৎ 'যেন' মৌন অপমানে। কারণ মেখলা নারীর কটিদেশের অলঙ্কার বিশেষ। উহা কি করিয়া অপমান বোধ করিবে?

সন্দেহ—অনেকটা উৎপ্রেক্ষারই মত। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে উপমান বলিয়া সন্দেহ হয়। এখানে উপমেয় এবং উপমান উভয়পক্ষেই যুগপৎ সন্দেহ বর্তমান থাকে। অর্থাৎ উপমেয় ও উপমান উভয়পক্ষেই যুগপৎ সন্দেহ বর্তমান থাকিয়া কবি-কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করিলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যেমন,

'সোনার হাতে সোনার চুড়ি কে কার অলঙ্কার?"

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণযোগ্য। 'সন্দেহ' যদি বাস্তবিক হয় তবে কিন্তু অলঙ্কার হইবে না। যেমন—তুমি মানুষ না পিশাচ?

অপহ্নুতি–(অর্থাৎ অস্বীকার)–উপমেয়কে অস্বীকার করিয়া যদি উপমানের প্রাধান্য স্থাপন হয় তবে অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। যেমন,

ভাবুক স্বভাবে ভাবে কোরে অনুরাগ।
বলে, ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ॥

আনারসের গায়ে চোখের মত লাল দাগ থাকে, এখানে সেই রাঙা রঙকে (উপমেয়) অস্বীকার (অপহ্নব) করিয়া উপমান 'নয়নরাগ'-এর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

নিশ্চয়—উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়া যখন উপমেয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা অপহ্নুতির বিপরীত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে উপমেয়-উপমান ভাব না থাকিলে নিশ্চয় অলঙ্কার হয় না। 'নিশ্চয়' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত—

'অসীম নীরদ নয়,
ওই গিরি হিমালয়!'

এখানে উপমান 'নীরদ'-কে (মেঘ) নিষিদ্ধ করিয়া উপমেয় 'হিমালয়'-কে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

ভ্রান্তিমান—সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমান বলিয়া যদি ভুল করা হয় এবং সেই-ভুল যদি বাস্তব ভ্রম না হইয়া কবিকল্পনাজাত ভ্রম হইয়া সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তবে 'ভ্রান্তিমান' অলঙ্কার হয়। যেমন,

নিদ্রায় আকুল রামা হন অচেতন।
চরণ-পঙ্কজ ভ্রমে ধায় অলিগণ॥

পদযুগলকে পদ্ম মনে করিয়া অলিগণ ধাবিত হইল। ইহা বাস্তব ভ্রম। কিন্তু এই ভ্রমের মধ্য দিয়া চরণযুগলের অপরিসীম সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উল্লেখ—বহুবিধ গুণের বিভিন্ন মুখী প্রকাশ। যেমন,

'স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ'।

প্রতিবস্তূপমা—উপমেয় ও উপমানের সাধারণ ধর্ম যদি দুইটি সমার্থক শব্দে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহারা হয় বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। যেমন, 'ফুটিল পদ্ম আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র উঠে'—এখানে 'ফুটিল' ও 'উঠে' ক্রিয়া দুইটির কাজ স্বতন্ত্র হইলেও আসলে ইহারা এক অর্থাৎ আকাশে যেমন চাঁদ উঠে সরোবরে তেমনই পদ্ম ফোটে। ধর্ম দুইটি রূপে পৃথক হইলেও একার্থক অর্থাৎ বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবাপন্ন। বস্তু-প্রতিবস্তু ভাবের উপমাই প্রতিবস্তূপমায় পরিণত হয় 'যেন যেমন, যথা, তথা' ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দটি লুপ্ত থাকে। যেমন,

'একটী মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে .
(যেন) একটী মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজসাপের নিশ্বাসে'।

বন্ধনীযুক্ত 'যেন' কথাটি লুপ্ত।

দৃষ্টান্ত—এই অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমান দুইটি পাশাপাশি বাক্যে থাকে। ইহাদের গুণক্রিয়াদি ধর্ম এক না হইয়াও ভাবসাদৃশ্য সূচনা করে এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ উহ্য থাকে। এই 'অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমান এবং তাহাদের সাধারণ ধর্ম অনুমান-গম্য অর্থাৎ বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবমূলক। (বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের উপমা দ্রষ্টব্য)। যেমন,

'ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে পড়ে মাতা চুমা দিয়ে তা'রে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু যদি বা কল্লোল তুলি' ছুতে না পারে;
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।

নিদর্শনা—সম্ভব বা অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে উপমান-উপমেয়ভাবে (বিম্ব-প্রতিবিম্ব) বোঝানো হয়। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে দুইটী বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধটি সর্বদা

সম্ভবপর কিন্তু নিদর্শনা অলঙ্কারে উহা সাধারতঃ অসম্ভব। দৃষ্টান্তে উপমেয় ও উপমান দুইটা স্বতন্ত্র বাক্যে থাকে, নিদর্শনায় দুইটা বস্তুর উপমেয়-উপমান্ ভাব একবাক্যে প্রকাশিত হয়। দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে বাক্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাদৃশ্যের প্রতীতি হয় না কিন্তু নিদর্শনায় সাদৃশ্য দেখাইয়াই বাক্য শেষ হয়। নিদর্শনার উদাহরণ—

'অবরণ্যে বরি
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল কানন।'

পদ্মবন ভুলিয়া শ্যাওলায় গড়াগড়ি খাওয়ার সঙ্গে অযোগ্যকে বরণ করার ক্ষোভকে প্রকাশ করা হইয়াছে। দুইটা বস্তুর সম্বন্ধ অসম্ভব হইলেও সাদৃশ্যটা লক্ষণীয়।

সমাসোক্তি—উপমেয়ে অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তুতে যদি উপমানের অবস্থা আরোপ করা হয় তবে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কারে উপমেয় ও উপমানের বিষয় সংক্ষেপে (=সমাসে) হয় বলিয়া ইহার নাম সমাসোক্তি। যেমন,

'এমনি সাঁঝে আমার প্রিয়া
যেতো ছোট কলসীখানি কোমল তাহার কক্ষে নিয়া;
সোহাগে জল উথলে উঠে বক্ষে তাহার পড়ত লুটি।'

এখানে দেখা যাইতেছে যে অচেতন জলে চেতনধর্মী সোহাগময়ীর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে। সমাসোক্তি অলঙ্কারে বর্ণনীয় বিষয়টি হয় কোন অচেতন পদার্থ এবং তাহাতে চেতন পদার্থের ধর্ম আরোপ করা হয়।

ব্যতিরেক—উপমান হইতে উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রদর্শিত হইলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ উপমেয় ও উপমানের বৈষম্য প্রতিপন্ন করাই ব্যতিরেকের লক্ষণ। যেমন—(ক) চাঁদের মতই সুন্দর তাহার মুখ; প্রভেদ এই যে চাঁদ কলঙ্কযুক্ত তাহার মুখ নিষ্কলঙ্ক।

(খ) বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

অতিশয়োক্তি—সৌন্দর্য সৃষ্টি করিবার জন্য অতিশয়পূর্ণ উক্তির নাম অতিশয়োক্তি। বর্ণনীয় বস্তুর এবং আরোপ্যমান বস্তুর অভেদ সৃষ্ট হওয়াতে যদি বর্ণনীয় বস্তুর (উপমেয়ের) লোপ ঘটে অথবা ঐ বস্তু বর্ণনা যদি কল্পনার আশ্রয়ে লৌকিক সীমা ছাড়াইয়া যায় তবে এই অলঙ্কার হয়। রূপক অলঙ্কারে এই অভেদ প্রধান্য লাভ করে কিন্তু অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে অভেদই সর্বস্ব অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তু এবং আরোপ্যমান বস্তুর অভেদ সৃষ্ট না হইলে এই অলঙ্কার হইবে না। উপমেয়কে (বর্ণনীয় বস্তু) সম্পূর্ণ লোপ করিয়া উপমান উপমেয়রূপে প্রকাশ পাইলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যেমন,

'দেবাসুর সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুইল লুকাইয়া॥

বিদ্যার মুখ সুধার মতই স্নিগ্ধকান্তি। অথচ মুখের সঙ্গে সুধার তুলনা হয় না। এই অসম্বন্ধে সম্বন্ধরূপ আরোপিত হওয়া অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে।

প্রতীপ—উপমান যখন উপমেয়রূপে কল্পিত হয় তখন প্রতীপ অলঙ্কার হয়। 'মুখ' কে 'চাঁদ-এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। কিন্তু চাঁদকে যদি মুখের সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে উপমান উপমেয় হইয়া যায়। উপমেয় ও উপমানের এই যে প্রতি-লোম (উল্টা) সাদৃশ্য কথন ইহাকেই প্রতীপ অলঙ্কার বলে। যেমন,

নক্ষত্র মণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো।

উপমেয়ের উৎকর্ষ হেতু উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণিত হইলেও প্রতীপ অলঙ্কার হয়। যেমন,

কিবা অঙ্গ আভা মরি কি সৌরভ তার।
কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতার।

(খ) বিরোধমূলক অলঙ্কার

বিরোধ বা বিরোধাভাস—দুইটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধবৎ মনে হইলেও যখন দেখা যায় যে, তাৎপর্যে ঐ বিরোধের অবসান ঘটিয়া চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তখন এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

ইংরাজি oxymoron এবং Epigram এর সঙ্গে এই অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে।

বিষম—বি-সদৃশ বস্তুদ্বয়ের বর্ণনা হইতে যখন চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয় তখন এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

বিভাবনা—কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হইলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যেমন,

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত
বিনা বাতে নিভে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।

বিশেষোক্তি—কারণ সত্ত্বেও কার্যোৎপত্তি না হইলে এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

'মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্য কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক?

অসঙ্গতি—কার্য ও কারণ যদি একস্থানে না থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে তবে এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।

(গ) গূঢ়ার্থমূলক অলঙ্কার

অপ্রস্তুত প্রশংসা—যাহা মুখ্যভাবে বর্ণনার বিষয় নয় তাহা 'অপ্রস্তুত' অর্থাৎ উপমান। আর মুখ্যভাবে বর্ণনীয় বিষয় হইল 'প্রস্তুত' অর্থাৎ উপমেয়। আর 'প্রশংসা' শব্দটির অর্থ বর্ণনা।

অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা হইতে যদি প্রস্তুত বিষয়ের অবগতি জন্মায় তবে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়। যেমন,

'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে
মানুষের শোভা পায়?'

অধর্মের আচরণ উত্তমে করে না এই প্রস্তুত বিষয়টি একটি অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছে।

অর্থান্তরন্যাস—'ন্যাস' মানে কথন বা ক্ষেপন। একটি বাক্যার্থ দ্বারা অন্য একটি বাক্যার্থের সমর্থন এই অলঙ্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষের দ্বারা সামান্য, সামান্যের দ্বারা বিশেষ, কারণের দ্বারা কার্য অথবা কার্যের দ্বারা কারণকে সমর্থিত করিয়া একটি বাক্যার্থরূপ বস্তুকে অপ্রস্তুতের মত কীর্তন বা কথন করিলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যেমন,

চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥

এখানে একটি বিশেষ উক্তির (সর্পদষ্ট ব্যক্তির ব্যথা যাহাকে সাপে কামড়ায় নাই সে বুঝিতে পারিবে না) দ্বারা একটি সামান্য (general) উক্তি (চিরসুখী জন দুঃখীর বেদনা বুঝিতে পারে না) সমর্থিত হইয়াছে। মনে রাখা দরকার যে, প্রতি বস্তূপমায় সাধারণ ধর্মের (প্রস্তুত ও অপ্রস্তুতের) অভিন্নত্ব থাকে, একের দ্বারা অপরের সমর্থনের কথা আসে না; দৃষ্টান্তে সামান্য ধর্মের ভিন্নত্বে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব। ইহাতে সামান্যে সামান্যে অথবা বিশেষে বিশেষে বিম্ব-প্রতিবিম্বভাবের সাদৃশ্য থাকে কিন্তু অর্থান্তরন্যাসে সামান্য দ্বারা বিশেষকে অথবা বিশেষ দ্বারা সামান্যকে সমর্থন করা হয়। যেমন,

উদ্যোগ বিহনে ধর্ম না হয় অর্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে দেবগণ॥

ব্যাজস্তুতি—নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতির দ্বারা নিন্দা প্রতীয়মান হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। যেমন,

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন।

এখানে নিন্দার ছলে স্তুতি। আবার,

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ !

সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন হওয়ায় যেন সমুদ্রের গলায় মালা। কিন্তু ইহা পরাধীনতার চিহ্ন। পুত্রশোকাতুর রাবন সমুদ্রকে স্তুতির ছলে নিন্দা করিতেছেন।

স্বভাবোক্তি—কোন বস্তুর আকৃতি প্রকৃতির অকৃত্রিম বর্ণনাই স্বভাবোক্তি। অর্থাৎ কোন বস্তুর নিখুঁত বর্ণনার মধ্য দিয়া যখন তাহার সৌন্দর্য বিকশিত হয় তখন এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকল স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
সারস ঘুমায়েছিল, দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে।

(ঘ) শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কার

কারণমালা—কোন কারণের কার্য যদি কারণ হইয়া পরবর্তী কার্যের উৎপত্তি করে এবং এইভাবে কারণ পরম্পরা চলে তবে কারণমালা অলঙ্কার হয়। যেমন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।'

একাবলী—একটি বাক্যের বিশেষ্য যদি পূর্ব বাক্যের বিশেষণরূপে দেখা দেয় এবং পর পর এইরূপ চলিতে থাকে তবে একাবলী অলঙ্কার হয়। যেমন—'নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম, পদ্মের ভূষণ মধুকর।'

সার—বস্তুর উত্তরোত্তর উৎকর্ষ যখন প্রদর্শিত হইতে থাকে তখন সার অলঙ্কার হয়। যেমন,

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তা-প্রেম সর্বসাধ্য সার॥
ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

তুল্যযোগিতা—প্রস্তুত বা অপ্রস্তুত বস্তুসমূহকে একই ধর্মের বন্ধনে সংযুক্ত করা হইলে এই অলঙ্কার হয়। প্রস্তুত = বর্ণনার বিষয়; অপ্রস্তুত = অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। যেমন, 'জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল।' এক 'রাঙা'র বন্ধনে জবা, করবী ও কুসুম ফুল আবদ্ধ।

দীপক—প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত এই দুইটি বস্তুকে একই ধর্ম (গুণ) দ্বারা আবদ্ধ করিলে দীপক অলঙ্কার হয়। তুল্যযোগিতার একই ধর্ম্ম দ্বারা উপমান অথবা উপমেয় সংযুক্ত হয় কিন্তু দীপকে উপমান এবং উপমেয় উভয়েই এক গুণ দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত। যেমন,

যম আর প্রেম।
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্বভূতে।

(৬) অন্যান্য অলঙ্কার

লক্ষ্যোক্তি—'অভিধা' ও 'লক্ষণা' শব্দের এই দুইটি শক্তি। অভিধা দ্বারা শব্দের সাধারণ অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন, মস্তক—মাথা। কিন্তু লক্ষণা দ্বারা শব্দের অন্য অর্থ লক্ষিত হয়। যেমন, 'তিনি এই গ্রামের মাথা'। এখানে 'মাথা' মানে প্রধান ব্যক্তি। শব্দের এই লক্ষণা শক্তির প্রয়োগে বাক্যে যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় তাহাকে লক্ষ্যোক্তি অলঙ্কার বলে। ইংরাজি Metonymy ও Synecdoche-র সঙ্গে ইহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। যেমন —অমি রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি।

আক্ষেপ—যে অলঙ্কারে নিষেধের দ্বারা বিধি ব্যঞ্জিত হয়। যেমন,

'নিজগৃহপথ তাত, দেখাও তস্করে?
চাড়ালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য।'

হেতু—বাক্যের অর্থ ব্যঞ্জনার সাহায্যে কোন বর্ণনীয় বিষয়ের কারণরূপে প্রতীয়মান হইলে এই অলঙ্কার হয়। ইহাকে কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কারও বলা হয়। যেমন,

কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?'

সঙ্কর—একাধিক অলঙ্কার অঙ্গাঙ্গী হইয়া রচনায় যদি এমন ভাবে অবস্থান করে যাহাতে কোন্‌টি প্রধান এই সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে সঙ্কর অলঙ্কার হয়। যেমন,

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥

অনুপ্রাস এবং শ্লেষ এই দুইটি অলঙ্কার এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে যাহাতে কোন্‌টি প্রধান তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

সংসৃষ্টি—পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া একাধিক অলঙ্কার একই রচনায় থাকিলে এই অলঙ্কার হয়। যেমন,

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥

অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তি উভয় অলঙ্কারই নিরপেক্ষভাবে এখানে বর্তমান।

ব্যঞ্জনা ও ধ্বনি

কাব্যের আত্মা ধ্বনি

উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সৃষ্টির অলৌকিক রহস্যসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া একদা বনস্পতির কাছে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কেন প্রাণাঃ প্রথম প্রৈতিযুক্ত ?' প্রথম প্রাণ কোন অপূর্ব রহস্যসম্ভার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে এই বিশ্বে! আর্য-ঋষির সে মহাজিজ্ঞাসার উত্তর সেদিন মিলিয়াছিল কিনা জানি না, তবে সৃষ্টির সেই অবাঙমানসগোচর রহস্যের সন্ধান আজও মানুষের শেষ হয় নাই।

কাব্যের ক্ষেত্রেও সকল রস পিপাসুর এই মহাজিজ্ঞাসা। কাব্যের মধ্যে যে চিরন্তন রসমাধুর্য রসিকজনকে নিরবধিকাল ধরিয়া সমস্ত সুধার সন্ধান দিয়া আসিতেছে, যে অলৌকিকত্ব 'পাদবদ্ধোঽক্ষর'-কে কাব্যের সীমায় পৌঁছাইয়া দিতেছে তাহার স্বরূপ কি? অর্থের সাম্য শব্দশৃঙ্খলকে বাক্য করে কিন্তু বাক্য কাব্য হইবে কখন? মহাকবিরও তাই জিজ্ঞাসা,

'এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর-বিদারণ।'

এই জিজ্ঞাসার উত্তর যুগ যুগান্ত ধরিয়া বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সে উত্তর বিভিন্ন কৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন জীবনবোধের। তবে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়ে তাহাদের গুরুত্ব কোন অংশেই ন্যূন নহে।

কাব্যবিচারে যিনি কাব্যের বহিরঙ্গের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক বামন। বামনের মতে, 'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'। অলঙ্কারের গুণেই বাক্য কাব্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অলঙ্কারবাদীরা বলেন—শব্দ আর অর্থই কাব্যের মূল কাঠামো। তাহার বুকে যখন অলঙ্কারের অস্থি-মেদ-মজ্জা লাগানো হয় তখন কাব্যলক্ষ্মী প্রাণবন্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু অলঙ্কারবাদীদের এই সংজ্ঞাটি অন্য আলঙ্কারিকদের মতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি এই উভয়

দোষে দুষ্ট। অলঙ্কার রহিয়াছে অথচ বাক্যটি কাব্য হয় নাই এমন অনেক উদাহরণ তাঁহারা দেখাইয়াছেন, আবার এমন অনেক কাব্যের সন্ধান মিলিয়াছে, যাহাদের মধ্যে ছিটেফোঁটা অলঙ্কারও নাই, অথচ কাব্য সৌন্দর্যে তাহা যেকোন অলঙ্কারবহুল রচনা অপেক্ষা অধিকতর রমণীয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

একজন আলঙ্কারিক আলঙ্কারবাদের এই অপূর্ণতাকে শুধরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। কাব্যের আত্মা হইতেছে রীতি বা style. অলঙ্কৃত বাক্য যে কাব্য হয় তাহা এই style-এর গুণে। আর রচনার মধ্যে রীতি না থাকিলে অলঙ্কৃত বাক্যও কাব্যসীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারেনা। 'রীতি'-র সংজ্ঞা তাঁহারা দিয়াছেন—'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি'। রীতি হইল এক বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি—এক বিশেষ সৃষ্টি কৌশল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রেষ্ঠ কাব্য কেবল অর্থ ও শব্দের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া না থাকিয়া বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। তাহা অর্থের বাহিরে আরও অতিরিক্ত কিছুর সন্ধান আনিয়া দিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত বিষয়ান্তরের নাম আলঙ্কারিকেরা দিয়াছেন 'ধ্বনি'।

ধ্বন্যালোকের টীকাকার ধ্বনির স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনী কৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিত॥

'যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেছেন। ব্যঞ্জিত অর্থের আলঙ্কারিক পরিভাষা হল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন, এ 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।'—অতুল গুপ্ত।

প্রত্যেক শব্দেরই দুইটি শক্তি আছে। একটি অভিধা, অপরটির নাম লক্ষণা। শব্দের অভিধানগত একটি অর্থ থাকে। যেমন 'জনক'শব্দটির অভিধানগত অর্থ 'যিনি জন্ম দেন'। ইহাই বাচ্যার্থ। আবার কোথাও দেখা যায় কোন শব্দের অভিধানগত অর্থ বা বাচ্যার্থ ধরিলে সেই শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না। যেমন যদি বলা যায় 'তুমি সেক্সপীয়র পড়িয়াছ?' সেক্সপীয়র তো একজন নাট্যকারের নাম। তাহাকে তো পড়া যায় না। অতএব সেক্সপীয়রের অর্থ এখানে সেক্সপীয়র রচিত নাট্যাবলী। এরূপ বাক্যে শব্দের লক্ষণাশক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রকাশ পায়, তাহাকে বলা হয় লক্ষ্যার্থ।

ধ্বনি একটি পারিভাষিক নাম। ধ্বনি বলিতে যেমন sound বুঝায় তেমনই কাব্যের ধ্বনি বলিতে বাচ্যার্থের অতিরিক্ত এবং বাচ্যার্থ হইতে প্রধান প্রতীয়মান অর্থকে বুঝায়। ধ্বনিবাদীদের মতে এই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা: 'কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ'।

অভিধা ও লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হইবার পরও যে শক্তি বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়া এতদুভয়ের অতিরিক্ত একটি নূতন অর্থের দ্যোতনা করে তাহাই শব্দের ব্যঞ্জনা বৃত্তি। এই বৃত্তির সাহায্যে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে তাহাই ব্যঙ্গ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ, প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনি। ধ্বনি দুই প্রকারের— (১) অবিবক্ষিত বাচ্য (২) বিবক্ষিতান্যপর বাচ্য।

যেখানে বাক্যের বাচ্যার্থ একেবারেই অ-বিবক্ষিত (অনভিপ্রেত) ব্যঙ্গ্যার্থই কবির একমাত্র অভিপ্রেত, সেখানে যে ধ্বনি থাকে তাহাকে বলা হয় অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি। যেমন

'ঘনবন তলে এসো ঘন নীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণ রসনা।

এইখানে 'স্বর্ণ রসনা'র অভিধেয় অর্থ সোনার দ্বারা নির্মিত রসনা। কিন্তু বাক্যে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব এই বাচ্যার্থ এইস্থানে অবিবক্ষিত বা অনভিপ্রেত। অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি আবার দুই প্রকার। অর্থান্তরে সংক্রমিত ও অত্যন্ততিরস্কৃত। অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি: বাচ্যার্থই এই স্থানে প্রধান। তবে সমগ্রের সহিত বিচারে বাচ্যার্থ না বুঝাইয়া অর্থান্তরের দ্যোতনা হইয়া থাকে। বাচ্যার্থের অর্থ দ্যোতনা করিবার উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও যেখানে তাহা অন্য অর্থে প্রবেশ করে সেখানে তাহাকে অর্থান্তরে সংক্রমিত বাচ্যধ্বনি বলে। যেমন,

পাণ্ডব পাণ্ডব থাক্, কৌরব কৌরব—
ঈর্ষা নাহি করি কারে।

'কৌরব', ও 'পাণ্ডব' বলিতে এইস্থানে ঠিক যথাযথভাবে বাচ্যার্থকে গ্রহণ করা হইতেছে না।

অত্যন্ততিরস্কৃত বাচাধ্বনি:

অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন তরে প্রলয় তিমিরে চলিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র বাহিরে অন্ধ কিন্তু তাঁহার অন্তরে অন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। বাচ্যার্থ এইস্থলে অত্যন্ত তিরস্কৃত (প্রচ্ছন্ন) থাকায় ইহা অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যধ্বনি হইয়াছে।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি :—আলঙ্কারিকগণ বস্তু ও অলঙ্কারকে কখনও ধ্বনি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ভাব ও রসকেই তাঁহারা ধ্বনির মর্যাদা দিয়াছেন। কিন্তু কখনও কখনও বস্তু ও অলঙ্কারও ধ্বনির পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। এইরূপ কোন শব্দের বাচ্যার্থ যেখানে বিবক্ষিত (অভিপ্রেত) হইয়াও তাহা 'অন্যপর' অর্থাৎ অন্য একটি অর্থকে প্রধান রূপে (পর) দ্যোতিত করে সেখানে হয় বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনি। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির উদাহরণ রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গীত গুলির মধ্যে পাওয়া যাইবে। রামপ্রসাদ যখন বলেন :

মা হওয়া কি মুখের কথা ?
প্রসব করলে হয় কি মাতা ?

বাচ্য এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রসব করিলেই মাতা হয় না। মা হওয়া মুখের কথা নয়। কিন্তু এখানেই কি বাচ্য শেষ হইয়া গেল ?

বিবক্ষিতান্য পরবাচ্যধ্বনি দুই প্রকার—(১) সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি (২) অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি।

সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি :—বাচ্যার্থ হইতে কিভাবে ধ্বনির দ্যোতনা হইতেছে তাহার পূর্বাপর সম্বন্ধ যেখানে অনুসন্ধান করা যায় তাহাকে সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি বলে। সংলক্ষ্যক্রমধ্বনি দুইপ্রকার—বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি। বস্তুধ্বনি—প্রত্যেক কাব্যেরই একটি বিষয় বস্তু থাকে। বাচ্য দ্বারাই এই বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে। আমরা পূর্বেই জানি যে এই বাচ্যার্থ ধ্বনি নয়। ধ্বনি বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা। বাচ্যকে অবলম্বন করিয়া যখন এই ব্যঞ্জনার দ্বারা বাচ্যাতিরিক্ত বস্তু সূচিত হয়—তখন তাহার নাম বস্তুধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস'—কবিতাটিতে সাগরের উদ্দাম জলস্রোতের চিত্র বর্ণনা হইতে এই বস্তুধ্বনির একটি উদাহরণ দেওয়া গেল,

জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহ জিহ্ব সর্প সম ক্রুর
খল জল জল ভরা, তুলি লক্ষ ফণা—
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

এই অংশে বাচ্যার্থ হইতে উদ্দাম জলরাশির একটি বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে।

বাচ্যার্থ প্রকাশই এই বর্ণনার উদ্দেশ্য নহে। পরবর্তী অংশে রাখালের নিয়তি যে এই জলস্রোতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত তাহার ইঙ্গিতটুকু ব্যঞ্জিত করিবার জন্যই এই ভয়াল বর্ণনার অবতারণা।

অলঙ্কার ধ্বনি—বাচ্য, বস্তু বা অলঙ্কার যখন নিজদিগকে গৌণ করিয়া অন্য অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা করে, তখন তাহাকে 'অলঙ্কার ধ্বনি' বলে। যেমন,

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পাদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

বাচ্যার্থ এখানে অতি স্পষ্ট: এই বাচ্যার্থ হইতে অনুরণন ক্রমে ধ্বনিত হইতেছে শারদশশী হইতেও সে মুখের উৎকর্ষ। শারদশশীর সহিত কেবলমাত্র তাহার পাদনখের তুলনা হইতে পারে। বাচ্য ও বস্তু নিজেকে গৌণ করিয়া এইস্থানে 'ব্যতিরেক' অলঙ্কারকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং ইহাই অলঙ্কারধ্বনি।

অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি :—বাচ্যার্থ হইতে কি ভাবে ধ্বনির দ্যোতনা হইতেছে তাহার ক্রমটি যখন লক্ষ্য করা যায় না তখনই অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনি হয়। অসংলক্ষ্য ক্রমধ্বনি দুইপ্রকার। ভাবধ্বনি ও রসধ্বনি।

ধ্বনিবাদিগণের মতে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রসধ্বনিকে তাঁহারা বলিয়াছেন—'ধ্বনিসম্রাট'।

ধ্বন্যালোকের টীকাকার কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' হইতে ভাবধ্বনির একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন :—

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

পার্বতীর পিতা হিমালয়ের কাছে দেবর্ষি অঙ্গিরা মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন। তখন পার্বতী অধোমুখে বসিয়া পদ্মফুলের পাপড়ি গুণিতেছেন, তাহাতে নবযৌবনা পার্বতীর পূর্বরাগের লজ্জাটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। মূলভাব এখানে রতি। কিন্তু মূলভাব এখানে প্রাধান্য লাভ না করিয়া সঞ্চারী ভাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রসধ্বনি :—যেস্থানে ব্যঙ্গার্থ অলক্ষ্যক্রম হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে রসের ব্যঞ্জনা দ্যোতিত করে সেইস্থানে রসধ্বনি হইয়া থাকে। যথা :—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা॥

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥

এইস্থলে কৃষ্ণ আলম্বন বিভাব, মেঘ উদ্দীপন বিভাব। অনুভাব—রাধিকার বিরলে বসিয়া থাকা, ধ্যান নেত্রে মেঘের পানে তাকানো ইত্যাদি। সঞ্চারী ভাব-চিন্তা ও আবেগ, স্থায়ী ভাব রতি। পূর্বরাগজনিত বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবের সংযোগে স্থায়ীভাব রতি এখানে 'শৃঙ্গার' নামক আস্বাদ্যমান রসে পরিণত হইয়াছে।

ধ্বনির স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করিয়া আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—(১) গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনির আলোচনা করা হইয়াছে। প্রতীয়মান অর্থ প্রধান হইলে তাহা ধ্বনির বিষয় আর ব্যঙ্গ্য অপ্রধান হইলে তাহা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। যেমন—কি আমার বন্ধু রে! অর্থাৎ মোটেই বন্ধু নহে—এই ব্যঙ্গ্যার্থই ইহা দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত এই ধ্বনিটি প্রধান হয় নাই, মূল অলঙ্কারেরই অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা গুণীভূত ব্যঙ্গ্য।

কাব্যের আত্মা তাহার বাচ্য, অলঙ্কার, রীতি বা অন্য কিছু নয়—কাব্যের আত্মা তাহার ধ্বনি। এই ধ্বনি আবার অলঙ্কার কিংবা বস্তুর হইলে কাব্যের সার্থকতা রক্ষিত হইবে না। এই ধ্বনিকে নিঃসন্দেহে রসের ধ্বনি হইতে হইবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে সেই 'রস'—আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু।

ধ্বনিবাদের প্রথম আচার্য কে তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। 'ধ্বন্যালোক' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থখানিই ধ্বনিবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের চারিটি বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগ (১) কারিকা—অর্থাৎ সূত্র (২) বৃত্তি—সূত্রের ব্যাখ্যা (৩) টীকা—সূত্র ও বৃত্তির বিস্তৃত ভাষ্য এই তিনটী অংশে বিভক্ত। ইহার বৃত্তি অংশ শ্রীআনন্দবর্ধনের রচনা। ইনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক ছিলেন। ইহার টীকা অংশ শ্রীঅভিনবগুপ্তের রচনা। ইনি দশম শতাব্দীর শেষ ভাগের ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক ছিলেন। ইঁহারা উভয়ই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন।

রস ও ভাব

সাধারণভাবে রস বলিতে স্বাদকে বোঝায়। অম্ল, মধুর, তিক্ত, কটু, কষায় ইহারা রস। বস্তুর এই রস রসনা দ্বারা আমরা আস্বাদ করিয়া থাকি। সাহিত্যেরও এই প্রকার রস আছে। আমরা সাহিত্যের রসকে সহৃদয় মন দ্বারা আস্বাদ করি এবং একপ্রকার অলৌকিক আনন্দ লাভ করি। যে সাহিত্য রস সৃষ্টি করিয়া আমাদের মনে এই অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করে তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম'—এই হইল কাব্য সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত। বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যেমন রসনা রসের আস্বাদ পায় স্থায়ী ভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যে যে রসের সৃষ্টি হয় অন্তরিন্দ্রিয় তাহা হইতে তেমনই রসের আস্বাদন লাভ করে। সাহিত্যে রস সৃষ্টির এই উপাদানগুলি কি ?

স্থায়ী ভাব—মানুষের হৃদয়ে শোক, ক্রোধ, আনন্দ, চিন্তা, আবেগ, কাম প্রভৃতি অসংখ্য ভাব আছে। সমুদ্রের তরঙ্গের মত মানুষের মনে এই ভাব মালার উদয় ও বিলয় হইতেছে। যুগ যুগান্তরের সংস্কার রূপে মানুষের চিত্তে এই ভাবরাশি বাসনারূপে অবস্থান করে। এই ভাবরাশির মধ্যে এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা চিরন্তন সংস্কাররূপে মানবচিত্তে বিদ্যমান থাকে এবং ইহারাই 'রসাস্বাদ অঙ্কুরের মূল'। এইরূপ নয়টি স্থায়ী ভাবকে (১) রতি (২) হাস (৩) শোক (৪) ক্রোধ (৫) উৎসাহ (৬) ভয় (৭) জুগুপ্সা (ঘৃণার ভাব) (৮) বিস্ময় (৯) শম (নির্লিপ্ত মনের বিশ্রাম জনিত সুখ) বলে। এই স্থায়ী ভাবগুলি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে আস্বাদ্যমান রসে পরিণত হয়। নয়টি ভাব হইতে নয়টি রসের পরিণতি লাভ ঘটে—রতি হইতে শৃঙ্গার রস , হাস—হাস্যরস ; শোক—করুণ রস ; ক্রোধ—রৌদ্ররস ; উৎসাহ—বীররস ; ভয়—ভয়ানক রস ; জুগুপ্সা—বীভৎস রস ; বিস্ময়—অদ্ভুত রস ; শম—শান্ত রস।

বাসনা—বাসনা মানে সংস্কার। মাতৃক্রোড়ে শিশুকে দেখিলে দশ হাজার বৎসর পূর্বে মানুষের যেমন আনন্দ হইত এখনও তেমনই হয়। অর্থাৎ ঐ আনন্দিত হওয়ার ভাবটি মানুষের মনে বাসনারূপে (সংস্কাররূপে) অবস্থান করিতেছে। কাব্যে মানুষের হৃদয়কে বাসনালোক (যেখানে বাসনার অবস্থান) বলা চলে।

বিভাব—একটি ফুল দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়, কাহারও মৃত্যু দেখিলে আমরা দুঃখিত হই। অর্থাৎ বহির্জগতের বস্তুরাশির সান্নিধ্যে আসিলে আমাদের মনে বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়। সাহিত্যে ঐ সকল বস্তু নিবেশিত হইয়া যখন ভাবের উদ্বোধন করে তখন উহাদের নাম হয় বিভাব। বলাই বাহুল্য ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার ফলে আমাদের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয় কাব্যে নিবেশিত হইয়া তাহারা সেই একই পরিমাণ ভাবের সৃষ্টি করে না, তাহারা যাহা সৃষ্টি করে তাহা অলৌকিক। বিভাব দুই প্রকার—(১) আলম্বন বিভাব (২) উদ্দীপন বিভাব।

আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব—যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হয় তাহাকে আলম্বন বিভাব এবং পারিপার্শ্বিক যে সমস্ত অবস্থা এই রস সৃষ্টির সহায়ক হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। যেমন, 'বাসন্তী রঙ বসনখানি নেশার মত চক্ষে ধরে'। বাসন্তী রঙ বসন মনে উদ্দীপনা আনিতেছে।—ইহা উদ্দীপন ভাব। যাহাকে এই বসন মানায় সেই সুন্দরী হইল আলম্বন বিভাব। তাহাকে আলম্বন করিয়াই এখানে শৃঙ্গার রসের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনুভাব—শোকগ্রস্ত হইলে আমাদের চোখে অশ্রু দেখা দেয়, ক্রুদ্ধ হইলে চোখ লাল হইয়া যায়। মনে ভাব উপস্থিত হইলে তাহার যে বহিঃপ্রকাশ তাহা যদি কাব্যে নিবেশিত হয় তবে তাহাকে অনুভাব বলা হয়। যেমন,

দুই নেত্রে বহি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনা দুই ধার॥

অশ্রু এখানে অনুভাব।

ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব—মানুষের হৃদয়ে অসংখ্য ভাব আছে। তাহাদের মধ্যে নয়টি ভাব স্থায়ী, বাকীগুলি ব্যভিচারী অর্থাৎ স্থায়ী নয়। কিন্তু উহারা স্থায়ী ভাবকে পুষ্ট করে। আলঙ্কারিকেরা ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা তেত্রিশটি নির্ধারিত করিয়াছেন। যেমন 'চাঞ্চল্য' 'আবেগ', 'ঔৎসুক্য'—ইহারা সঞ্চারী ভাব। যেমন,

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

এখানে 'রতি' এই স্থায়ী ভাবকে উপরিউক্ত ব্যভিচারী ভাবগুলি বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। কাজেই রস নিষ্পত্তিতে ইহাদের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

কাব্যের বিভাব, অনুভাব সবই অলৌকিক কিন্তু তাহারা বাস্তব কার্য ও কারণের উপর নির্ভরশীল। মানুষের চিত্ত বা সম্বিৎ রসরূপতা লাভ করে। কিন্তু কি ভাবে? বাস্তব জগতের ভাব, ভাব সৃষ্টির কারণ ও কার্য কবিরা শব্দার্থ সম্পদ দ্বারা (অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সহযোগে) বর্ণনা করেন। ঐ বর্ণনা ব্যভিচারী ভাবসমূহ দ্বারা বৈচিত্র্যমণ্ডিত হইয়া রসাত্মক কাব্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ ঐ বৈচিত্র্য মণ্ডিত বাক্যসমূহ পাঠ করিতে করিতে সহৃদয় সামাজিকের (চেতনাযুক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ রসজ্ঞ পাঠকের) চৈতন্য বা সম্বিৎ রসাপ্লুত হইয়া উঠে তখন তিনি এক অপূর্ব আনন্দ লাভ করেন। ঐ আনন্দই রসের ফলশ্রুতি।

> রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হলেই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাব'-এর কারণ ও কার্য কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সমবাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য-পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে। (অতুল গুপ্ত কৃত আচার্য অভিনব গুপ্তের সংজ্ঞার অনুবাদ।)

মনে রাখিতে হইবে বিভাব ও অনুভাবগুলি সকল সময়ে সমবাদী হওয়া চাই। 'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ তা প্রেমিকের হৃদয়ে আবদ্ধ; তা লৌকিক সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়। কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত লৌকিক ভাবকে 'সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী" অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্যচিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়। যার ফলে কাব্য পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়, আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়, এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোন ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না। ...সহচরী-বিয়োগ-কাতর ক্রৌঞ্চের মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্ত বৃত্তির আস্বাদনস্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি করে ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত

হয়েছে।'—অতুল গুপ্ত। কাজেই রসসৃষ্টিতে এই সাধারণীভবন ব্যাপারটি অপরিহার্য। বাহ্য জগতের জিনিষ আত্মসাৎ করিয়া কবি শব্দ ও অর্থের সহযোগে তাহা রসজ্ঞ পাঠকের উপলব্ধির জন্য প্রকাশ করেন। কবি মানসের সেই উপলব্ধির কথা রসজ্ঞ পাঠকের বাসনালোকে অনুরূপ ভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে। তখন কবির অভিজ্ঞতা ও পাঠকের অভিজ্ঞতা এক হইয়া যায়। ইহাই সাধারণীকরণ। 'বিভাবাদির বর্ণনা দ্বারা পাঠক ও দর্শকের চিত্তে একটি সৌন্দর্যঘটিত চিত্ত বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই চিত্তবৃত্তিকে বিভাবাদির সাধারণীভাব কহে।'

সাধারণীকরণের ফলে কবির অভিজ্ঞতা আর সামাজিকের (রসজ্ঞ পাঠক) অভিজ্ঞতা এক হইয়া যায়। তখন কবির কাব্য হইতে রসিকের শান্ত চিত্তে স্মৃতির পুনরুজ্জীবন বশতঃ যে চর্বণা ঘটে তাহারই নাম রস। লৌকিক জগতে আম্র ভক্ষণে আমাদের মনে একটি স্বাদের (রসের) অনুভূতি জন্মে, পরে যে কোন সময় আম খাইলেই ঐ অনুভূতির অর্থাৎ স্মৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। কাব্যের ক্ষেত্রেও তাহাই হয় অর্থাৎ বাসনালোকে যে সংস্কার আছে তাহা যথাযথ ভাবের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হইলেই তাহা রসে পরিণত হয়। তবে লৌকিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমানায় আবদ্ধ, কাব্যের ক্ষেত্রে ঐ অভিজ্ঞতা অলৌকিক। তবে মনে রখিতে হইবে যে, সহৃদয় সামাজিক (রসজ্ঞ পাঠক) না হইলে কাব্যের ঐ রস আস্বাদন অপরের পক্ষে অসম্ভব।

বাঙ্গলা কবিতার ছন্দ

আমরা প্রাত্যহিক প্রয়োজন নিষ্পন্নের জন্য অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন অন্যকে জ্ঞাত করাইবার জন্য সে সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাই ভাষা। প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাষার আর কোন আবশ্যকতা থাকে না। বলিতে পারি 'মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে ঘেরা'। কিন্তু ভাষার সঙ্গে যখন ছন্দ যুক্ত হয় তখন তাহাতে এক স্বতন্ত্র আবেদন আসিয়া পড়ে যাহা প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য কিছু, যাহা মনে আবেগ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে এক অলৌকিক জগতে লইয়া যায়। অবশ্য বলাই বাহুল্য বিশেষ কবিত্ব প্রতিভা না থাকিলে এই অলৌকিকত্বের সৃষ্টি সম্ভব নয়। শুধু মিল দিয়া কবিতা লিখিলেই হয়তো ছন্দের সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু তাহা আমাদের মনের কোন স্থায়ী ভাবকে উদ্রিক্ত করিতে পারে না। কাজেই ছন্দোবদ্ধ পদের সঙ্গে

উচ্চভাবের সংযোজনও সার্থক কবিতার পক্ষে অপরিহার্য বস্তু। এই ছন্দ কবে কেমন করিয়া উদ্ভব হইল তাহা বলা দুষ্কর। এই ছন্দ বস্তুটি কি?

আমরা কথাবার্তায় যে শব্দগুলি ব্যবহার করি তাহারা কতকগুলি ধ্বনির লিখিত রূপ মাত্র। অর্থাৎ আমরা যখন বলি, 'আজ বড় গরম', তখন কতকগুলি ধ্বনি শ্রোতার কানে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়। শ্রোতা তখন আমাদের মনের ভাবটি বুঝিতে পারেন। এই ধ্বনিগুলিকে ভাষায় কতকগুলি বর্ণ বা হরফের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হয়। এই বর্ণ বা হরফগুলি ধ্বনির প্রতীক চিহ্নমাত্র। তাহা হইলে বর্ণ হইতেছে, 'শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ।' এই ধ্বনিই ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ।

যখন আমরা নিতান্তই কাজের কথা বলি তখন এই ধ্বনিগুলির মধ্যে আমরা বিশেষ কোন সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে পারি না। কিন্তু এই ধ্বনিগুলি আমরা একটানা হড়্‌বড়্‌ করিয়া বলিয়া যাই না। যখন ক্রুদ্ধ হইয়া আমরা চীৎকার করি তখন কোথায়ও থামিয়া, কোথায়ও অল্প জোরে, কোথায়ও বেশী জোরে কথা বলিয়া থাকি। ফলে গদ্যময় ভাষাতেও ধ্বনির উত্থান পতন পরিলক্ষিত হয় হয়। কিন্তু তাহার কোন সুসমঞ্জস্য নিয়ম নাই। ছন্দোময় ভাষায় এই নিয়মটি রক্ষা করিতে হয়। তখনই তাহা ছন্দ হইয়া উঠে।

> বাক্যস্থিত পদগুলিকে যে ভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। পদগুলির অবস্থান এমনভাবে হওয়া চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণ পদ্ধতির কোনও পরিবর্তন না হয় এবং রচনাটির মধ্যে একটি সহজ লক্ষণীয় এবং সুসঙ্গত পরিপাটি বা আদর্শ [Pattern] দেখিতে পাওয়া যায়।—ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

এখন কথা হইতেছে এই আদর্শটি কিভাবে সৃষ্ট হয়?

একটি কবিতায় হয়তো পাঁচটি স্তবক (Stanza) আছে। প্রতি স্তবকে ছয়টি করিয়া চরণ (লাইন) আছে। প্রথম স্তবকের ছয়টি চরণ যে আদর্শে (অর্থাৎ যতগুলি অক্ষর আছে, পড়িবার সময় যে রকম জায়গায় ধ্বনির উত্থান পতন হইতেছে ইত্যাদি) রচিত হইয়াছে পরবর্তী চারটি স্তবকও ঠিক একই আদর্শে রচিত হইয়াছে। ফলে কবিতাটি পাঠ করিবার সময় একটি ধ্বনি প্রবাহগত সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়। এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ কবিতাটি পাঠ করিবার

সময় যে একটি কম্পন ও স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তাহা হইতে উদ্ভূত। এই কম্পন ও স্পন্দনকে ছন্দোস্পন্দ বা Rhythm বলা হয়। মনে রাখিতে হইবে এই ছন্দোস্পন্দ এবং ছন্দ এক জিনিষ নয়। ছন্দোস্পন্দ যখন চরণের অন্তর্গত পরিমিত পদবিন্যাসের মধ্য দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে তখনই উহা ছন্দ হইয়া উঠে। অর্থাৎ কবিকে এমনভাবে পদ সাজাইতে হইবে যাহাতে তাহা পাঠ করিবার সময় ঐ স্পন্দন ও কম্পনের সৃষ্টি হয়। পদবিন্যাস-কৌশল এবং তাহা হইতে উদ্ভূত স্পন্দন—সামগ্রিক ভাবে ইহাই ছন্দ। স্পন্দন ছন্দের প্রাণবস্তু।

কবিতা যে সব সময়ই স্তবকে বিভক্ত থাকে এমন নয়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঁচালী কাব্যগুলি স্তবকে বিভক্ত নয়। উহাদের ছন্দের প্রকৃতিটি দুই হইতে চার চরণের মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। অবশ্য ইহাই উহাদের স্তবক। অর্থাৎ কবিতার পদবিন্যাস-কৌশলের বিভিন্ন রীতি আছে এবং তাহাই হইতেছে ছন্দের বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিলেই ছন্দের জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

অক্ষর ও মাত্রা

পদ্যের প্রতি চরণে কতকগুলি শব্দ থাকে। ঐ শব্দগুলি কতকগুলি অক্ষরের দ্বারা বিধৃত হয়। ঐ অক্ষরগুলি ধ্বনির প্রতীক চিহ্ন মাত্র। ধ্বনি ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনিকে অক্ষর বলে। অ, আ, ক, খ এইগুলি কিন্তু অক্ষর নয়, এইগুলি বর্ণ বা হরফ। অক্ষর বলিতে ইংরাজীতে যাহাকে Syllable বলে তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন, In-ci-dent—এই শব্দটিতে তিনটি Syllable আছে অর্থাৎ তিনটি অক্ষর আছে। I, n, c, i এইগুলি অক্ষর নয়, বর্ণ। তেমনই হাত্, চল্, মা, ইত্যাদি এক একটি অক্ষর বা syllable, যেমন, বন্ধন—ইহাতে দুইটি অক্ষর আছে:—বন্+ধন্।

অক্ষর দুই প্রকার:—স্বরান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত বা হলন্ত। হলন্ত মানে যে অক্ষরের শেষে হসন্ত আছে। বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাহাই স্বরধ্বনি। স্বরের অপেক্ষা হ্রস্বতম উচ্চার্য ধ্বনি আর কিছু নাই। বাঙ্গলা লিপিমালায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও ঔ—এই স্বরবর্ণগুলি আছে। তন্মধ্যে ঐ ঔ-কে যৌগিক স্বর বা দ্বিস্বর ধ্বনি (Dipthong) বলা হয়। কারণ ইহারা প্রকৃতপক্ষে দুইটি মৌলিক স্বরধ্বনির যোগে সৃষ্ট—ঐ=অ +ই, ঔ=অ+উ। এই স্বরধ্বনিগুলি যে অক্ষরের অন্তে আছে অর্থাৎ যে অক্ষরের শেষধ্বনি স্বর তাহাই স্বরান্ত অক্ষর। এই স্বরান্ত অক্ষর 'বিবৃত' (open

syllable) অর্থাৎ বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চার্য। স্বরান্ত অক্ষরকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর (২) যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর। মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর—যে অক্ষরের শেষধ্বনি একটি মৌলিক স্বর; 'রাশি রাশি ভারা ভারা', শেফালিকা, রীতি ইত্যাদি। যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর— যে অক্ষরের শেষধ্বনি একটি দ্বি-স্বর বা যুগ্মস্বর। যেমন, বৌ, হৈ, হৈ, ইত্যাদি।

হসন্ত অক্ষর বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর—যে অক্ষরের শেষ ধ্বনি একটি ব্যঞ্জনধ্বনি। যেমন, রাত্‌ দিন্‌, জল্‌, বন্ধন্‌ ইত্যাদি। হলন্ত অক্ষর কখনই স্বরধ্বনির সহায়তা ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না। অর্থাৎ হলন্ত অক্ষরের আদিতে অথবা মধ্যে কোথায়ও না কোথায় একটি স্বরধ্বনি থাকিতেই হইবে। হলন্ত অক্ষরকে closed বা সংবৃত অক্ষর বলা হয়।

মাত্রা—এক-একটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কিছু পরিমাণ সময় লাগে। হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে দীর্ঘস্বরে তাহার দ্বিগুণ সময় লাগিবে। অক্ষর উচ্চারণের এই সময়কে (duration) মাত্রা বলে। বাঙ্গলা কবিতার ছন্দে এই মাত্রার হিসাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কবিতার এক একটি চরণকে কয়েকটি ভাগে (পর্বে) ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগে সম-সংখ্যক মাত্রা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। ধ্বনিপ্রবাহের সামঞ্জস্যই ছন্দের মূল ভিত্তি। আর এই ধ্বনির হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্য অক্ষরের মাত্রানুসারে স্থিরীকৃত হয়। এক কথায় ধ্বনি মাপিবার মানদণ্ডকেই মাত্রা বলা যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা কবিতার ছন্দে ধ্বনি মাপিবার এই মানদণ্ডটি সুনির্দিষ্ট নয়। বাঙ্গলা ছন্দকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইতেছে)। প্রত্যেকটি প্রকারের ছন্দে অক্ষরের মাত্রা সংখ্যা বিভিন্ন রূপ। যেমন, যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে সাধারণতঃ দুই মাত্রার ধরা হয়। যেমন, ছন্দ, তপ্ত, রক্ত, গন্ধ ইত্যাদি। এই শব্দগুলির ছ, ত, র, গ ইত্যাদি অক্ষরকে দুইমাত্রার ধরিতে হইবে। কিন্তু তান প্রধান বা পয়ার জাতীয় ছন্দে এই সব অক্ষরকে একমাত্রার ধরা হইয়া থাকে। কাজেই বাঙ্গলা কবিতায় অক্ষরের মাত্রা শেষ পর্যন্ত কবিতার ছন্দের প্রকৃতি অনুসারেই স্থির করিতে হয়। অর্থাৎ কবিতাটি দেখিয়া ইহা কোন ছন্দে রচিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই অক্ষরের মাত্রা নিরূপণ করা সহজ সাধ্য হইবে। তবে প্রথমেই কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে কি ভাবে? প্রধানতঃ চরণের পর্ববিভাগের দ্বারাই ছন্দের প্রকৃতিটি জানা যায়। এই পর্ব বিভাগ প্রণালী এবং ছন্দের অন্যান্য

আনুষঙ্গিকের কথা পরে উল্লেখ করা যাইতেছে। তৎপূর্বে অক্ষরের মাত্রা সম্পর্কে যে সাধারণ নিয়মগুলি প্রচলিত আছে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

বাঙ্গলা উচ্চারণে মৌলিক স্বরমাত্রই এক মাত্রার ধরা হয়। যেমন, 'রাশি রাশি ভারা ভারা', এই চরণের অন্তর্গত প্রত্যেকটি অক্ষর মৌলিক স্বরান্ত এবং প্রত্যেকটি এক মাত্রার। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—'ঐ' এবং 'ভৈ' অক্ষর দুইটি যৌগিক স্বরান্ত এবং ইহারা দুইমাত্রার অক্ষর। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতিভেদে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর যেমন দীর্ঘ অর্থাৎ দুইমাত্রার হইতে পারে, তেমনই আবার যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্রার হইতে পারে। যেমন, 'আসিল যত | বীরবৃন্দ | আসন তব | ঘেরি'—এই চরণে আ, বী, আ, ঘে ইত্যাদি মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরগুলি দ্বিমাত্রিক। আবার, 'ফেরে দূরে. মত্ত সবে | উৎসব-কৌতুকে'—এখানে 'কৌ' যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর হইলেও এখানে এক মাত্রার হইবে।

হলন্ত, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর শব্দের শেষে থাকিলে দুই মাত্রার, মধ্যে থাকিলে এক মাত্রার ধরা হয়। যেমন, 'অঞ্জন' শব্দটি = অন্‌ + জন্‌ (১ + ২ মাত্রা) = তিনমাত্রার। যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে সাধারণতঃ দুই মাত্রার ধরা হয়। যেমন ছন্দ, তপ্ত, রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু তানপ্রধান বা পয়ারজাতীয় ছন্দে এই সব অক্ষরকে এক মাত্রারই ধরা হইয়া থাকে। আবার স্বরবৃত্ত ছন্দে শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষর যাহা সাধারণতঃ দুই মাত্রার তাহাও একমাত্রার হইতে পারে। এই যে প্রয়োজন মত অক্ষরকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ করা ইহাকেই অক্ষরের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ বলে। এই হ্রস্বীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কোন পর্বে পর পর তিনটি হলন্ত অক্ষর থাকিলে উহাদের মধ্যে দুইটিকে হ্রস্ব ধরিয়া একটিকে দীর্ঘ অর্থাৎ দুইমাত্রার ধরিতে হইবে। যেমন, চঞ্চল মন = চন্‌ + চল্‌ + মন্‌ = ১ + ১ + ২ = চারমাত্রা।

অক্ষরের উচ্চারণ সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে—

(১) সংস্কৃত অ-কারান্ত শব্দের শেষের 'অ' স্পষ্ট উচ্চারিত হয়। বাঙ্গলায় হয় না, যেমন—জল, ফল, সাগর, জলধর ইত্যাদি। অবশ্য তাহারও ব্যতিক্রম আছে, যেমন—তব, মম, এগার, বার, বড়, ছোট ইত্যাদি।

(২) একাক্ষরী হলন্ত শব্দে স্বরধ্বনিকে দ্বিত্ব করিয়া উচ্চারণ করা বাঙ্গলা উচ্চারণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন, জল্‌—ইহার উচ্চারণ জ—ল্‌। অর্থাৎ 'জ' এর উচ্চারণ দীর্ঘ।

ছেদ, যতি ও লয়

ছেদ—নিঃশ্বাস গ্রহণের সুবিধার জন্য একটি বাক্যের কোন কোন অংশে বিরাম গ্রহণ করিতে হয়। অবশ্য যেখানে-সেখানে বিরাম নিলে চলিবে না, যেখানে বাক্যাংশে একটি অর্থ পরিস্ফুট হয় সেইখানেই বিরাম নিতে হয়। এইরূপ বিরামকে ছেদ বলে। বাক্যের শেষে যে বিরাম হয় তাহাকে 'পূর্ণচ্ছেদ' এবং অর্থবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাক্যাংশের শেষে যে বিরাম হয় তাহাকে 'উপচ্ছেদ' বলে।

যতি—বাক্য পড়িবার কালে জিহ্বা যেখানে স্বেচ্ছায় বিরাম গ্রহণ করে তাহাকে যতি বলে। এই যতির উপরই কবিতার সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাক্যের বা চরণের মধ্যে যেখানে জিহ্বা ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেয় সেইখানে মধ্যযতি এবং চরণটি যেখানে শেষ হয় অর্থাৎ ভাবের দিক হইতে পূর্ণ বিরতি লাভ করে সেইখানে পূর্ণযতির অবস্থান। এই পূর্ণযতির স্থলে শ্বাসযন্ত্রও বিশ্রামের সুযোগ পায়—এজন্য এইস্থানে পূর্ণচ্ছেদও পড়ে।

ছেদ ও যতির পার্থক্য—ছেদে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ক্ষণিকের জন্য হইলেও একেবারে বন্ধ থাকে। কিন্তু যতি স্থানে জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাইলেও শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না অর্থাৎ ধ্বনির প্রবাহ ক্ষণিকের জন্যও থামিয়া যায় না। ছেদ নিঃশ্বাসের বিরামস্থল আর যতি জিহ্বার বিরামস্থল। মনে রাখিতে হইবে যে যতি দ্বারাই বাঙলা কবিতার চরণের পর্ববিভাগ হয়, ছেদের দ্বারা নয়। কাজেই মধ্যযতি ও পূর্ণযতির স্থান চরণে নির্দেশ করিতে পারিলেই ছন্দের বিভাগ করা সম্ভব। এই ছন্দোবিশ্লেষণে ছেদ বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না। ছেদ ও যতির দৃষ্টান্ত :—

ধনঞ্জয় * আনন্দাশ্রু | কর বরিষণ *।
তোমার * আমার * আজি | ভগ্নি সুভদ্রার।
সার্থক জীবন * * ॥

'*' চিহ্নিত অংশে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকিবে—অর্থাৎ ছেদ পড়িবে। আর '|' চিহ্নিত অংশে জিহ্বা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেও ধ্বনিপ্রবাহ থামিবেনা অর্থাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ হইবেনা। কাজেই ঐস্থানে যতি পড়িবে। আবার 'জীবন'-এর পর ধ্বনিপ্রবাহ পূর্ণ বিরতি লাভ করিয়াছে, ফলে ঐস্থানে পূর্ণচ্ছেদ ও পূর্ণযতি উভয়ই পড়িয়াছে।

লয়—তালের নির্দিষ্ট কাল পরিমাণকে 'লয়' বলে। কবিতার চরণ যতি দ্বারা বিভক্ত হইয়া এক স্পন্দন (ধ্বনির গতি) সৃষ্টি করে। যতির গতি অনুসারে

এই স্পন্দন বিলম্বিত, দ্রুত এবং মধ্যম হইতে পারে। যতির গতির এই নির্দিষ্ট কাল পরিমাণকে 'লয়' বলা হয়।

পর্ব, পর্বাঙ্গ, চরণ ও স্তবক

পর্ব—যতি দ্বারা বিভক্ত পংক্তির এক একটি ভাগকে পর্ব বলে। অর্থাৎ কবিতা পাঠকালে বাগ্‌যন্ত্রের এক ঝোঁকে যতগুলি শব্দ উচ্চারিত হয় তাহাদের সমষ্টি লইয়া পর্ব গড়িয়া উঠে। এই পর্বগুলিতে সমসংখ্যক মাত্রা থাকে। এইমাত্রা দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর সংখ্যার উপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে শ্রুতিগ্রাহ্য অক্ষরের মাত্রা সংখ্যার উপর। অর্থাৎ বাঙ্গলা ছন্দে দৃশ্যমান অক্ষরের সমকত্ব নাই কিন্তু মাত্রার সমকত্ব আছে। অক্ষরের উচ্চারণের সময় (শ্রুতিগ্রাহ্য) এই মাত্রা ধরা পড়ে। একটি পর্বে সাধারণতঃ কম পক্ষে চার মাত্রা, উর্ধ্বপক্ষে দশমাত্রা থাকে।

পর্বাঙ্গ—একটি পর্বে কয়েকটি অঙ্গ (অর্থাৎ এক কথায় শব্দ) থাকে। তাহাকে পর্বাঙ্গ বলে। একটি পর্বে দুইটির কম এবং তিনটির বেশী পর্বাঙ্গ থাকে না।

চরণ - যতি দ্বারা বিভক্ত কয়েকটি পর্ব লইয়া (কমপক্ষে দুই পর্ব, উর্ধ্বপক্ষে পাঁচ পর্ব) একটি চরণ হয়।

স্তবক—কয়েকটি চরণ লইয়া এক একটি স্তবক হয়। অক্ষরের সমষ্টি শব্দ বা পদ, পদের সমষ্টি পর্বাঙ্গ, পর্বাঙ্গের সমষ্টি পর্ব, পর্বের সমষ্টি চরণ—এইরূপ কয়েকটি চরণের সমষ্টিই স্তবক। স্তবক দুই চরণ হইতে চৌদ্দ চরণ পর্যন্ত লইয়া গঠিত হইতে পারে।

বিলাপ : করেন : রাম | লক্ষ্মণের : আগে।
ভুলিতে : না : পারি : সীতা | সদা : মনে : জাগে॥
':' পর্বাঙ্গের চিহ্ন। ' | ' যতির চিহ্ন।

পর্বাঙ্গ, যতি দ্বারা বিভক্ত পর্ব, দুই পর্বের চরণ, দুই চরণের স্তবক।

বাঙ্গলা ছন্দের শ্রেণী বিভাগ

সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার প্রভূত সাদৃশ্য থাকিলেও বাঙ্গলা ছন্দের সঙ্গে সংস্কৃত ছন্দের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উভয় ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি ও উচ্চারণ রীতিই এই বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের দুইটি শ্রেণী—'বৃত্ত' ও 'জাতি'। বৃত্তচ্ছন্দ অক্ষর সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট, জাতিচ্ছন্দ মাত্রা সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট। বৃত্তচ্ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত বা বর্ণবৃত্ত আর জাতিচ্ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা হয়।

বাঙ্গলা ছন্দের তিনটি বিভাগ—(ক) তানপ্রধান ছন্দ বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (খ) ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (গ) শ্বাসাঘাত প্রধান বা বলবৃত্ত ছন্দ।

তান প্রধান ছন্দ—ইহাই কবিতার সুপ্রাচীন পয়ার ছন্দ। এই ছন্দে স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ বিচার করা হয়না, ইহাতে প্রতিটি অক্ষরকে এক মাত্রার ধরা হয়। কখনও কখনও শব্দের শেষে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রার ধরা হয়। তবে মোটামুটি শুধুমাত্র অক্ষর গুণিয়া এই ছন্দের মাত্রাসংখ্যা গণনা করা চলে। এই ছন্দের লয় 'ধীর'। ফলে সমস্ত অক্ষরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা সুরের অর্থাৎ টান বা তানের প্রবাহ ইহার চরণগুলির মধ্যে বিচিত্র ভাবে ক্রীড়াশীল থাকে। অক্ষরের হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা এই তানের প্রবাহে বিশেষরূপে প্রভাবিত। ফলে যুক্তাক্ষর, যুগ্মধ্বনি বা যুক্তব্যঞ্জনের গুরুভার বহনের শক্তি ইহার বিস্ময়কর। আবৃত্তিকালে এই লঘু-গুরু অক্ষরের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায়। তানের প্রভাবহেতু যুক্তাক্ষরের মাত্রা সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পয়ারের এই শক্তিকে 'শোষণশক্তি' বলিয়াছেন। প্রত্যেক পংক্তির আট মাত্রার (অক্ষরের) পর মধ্যযতি (অর্থাৎ আট মাত্রার পর্ব) এবং চৌদ্দ অক্ষরের পর পূর্ণযতি অর্থাৎ প্রতি পংক্তিতে দুইটি পর্ব, একটি আট মাত্রার, অপরটি ছয় মাত্রার এবং অন্ত্যানুপ্রাস অর্থাৎ প্রতি দুই চরণের শেষে মিল—পয়ারের এই হইল প্রধান কাঠামো। কিন্তু এই ছন্দের বিভিন্ন রূপকল্প (Pattern) পরিলক্ষিত হয়—

প্রচলিত পয়ার—প্রতি চরণে ৮+৬=১৪ অক্ষর এবং চরণান্তিক মিল থাকে—

(ক) মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান॥

(খ) তরল পয়ার—চরণান্তিক মিলতো থাকিবেই উপরন্তু চতুর্থ ও অষ্টম অক্ষরেও মিল থাকে—

দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্ম নেত্রে | পরশয়ে শ্রুতি॥

(গ) মালঝাঁপ পয়ার—চরণান্তিক মিল বাদেও চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে অনুপ্রাস—

মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন | শশীহীন শশী।
আস্তবর, হাস্তবর | বিম্বাধর রাশি॥

(ঘ) ভঙ্গপদী পয়ার—যে পয়ারে প্রথম চরণের অক্ষর সংখ্যার সহিত দ্বিতীয়

চরণের অক্ষর সংখ্যার মিল থাকে না অথবা যেখানে সেখানে যতি পড়ে—

কন্যা বলি পৃথিবী | সীতারে ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে | তুলিল সিংহাসনে॥

(ঙ) দীর্ঘ পয়ার—চৌদ্দর বেশী অক্ষরের সমাবেশ এবং চরণান্তিক মিল লইয়া যে পয়ার গঠিত হয় তাহাকে দীর্ঘ পয়ার বলে। ইহার অক্ষর সংখ্যা ৮+৮=১৬; এই পয়ার যখন ৮+১০=১৮ অক্ষরের চরণ লইয়া গঠিত হয় তখন তাহাকে মহাপয়ার বলে—

(১) আর কেন কাঁদ রাণী | উমারে আনিতে যাই। ৮+৮=১৬
গেলে যদি কৃত্তিবাস | না পাঠান ভাবি তাই॥ ৮+৮=১৬

(২) যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে | নামি আসে আসন্ন আষাঢ়, ৮+১০=১৮
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার ৮+১০=১৮

(চ) পর্যায়সম পয়ার—এই পয়ারের প্রথম-তৃতীয় চরণে এক ধরণের মিল এবং দ্বিতীয়-চতুর্থ চরণে যার এক ধরণের মিল থাকে—

মা আমার স্নেহময়ী | করুণারূপিণী।
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার?॥
স্নেহের মূরতিরূপে | আছ গো জননী।
অনুপম স্নেহ তব | অনন্ত অপার॥

(ছ) মধ্যসম পয়ার—এই পয়ারে প্রথম-চতুর্থ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় চরণে অনুপ্রাস থাকে—

স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন কাননে।
একাকী দেখিনু দূরে | যুবা একজন॥
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র রণে।

(জ) একাবলী বা একপদী পয়ার—পয়ারের চরণের পর্ব ৬, ৮, বা ১০ অক্ষর লইয়া গঠিত। একাবলীতে চরণের একটি পর্বে এই মাত্রা সংখ্যা (অর্থাৎ ৬ বা ৮ যে কোন একটি) ঠিকই থাকে। অপর পর্বটিতে ৬ অক্ষরের কম হইয়া যায়। এই জন্যই ইহাকে একপদী বলা হয়। একপদী পয়ারের প্রতি চরণে ১১টি অক্ষর থাকে—

বড়র পিরীতি | বালির বাঁধ। ৬+৫=১১
ক্ষণে হাতে দড়ি | ক্ষণেকে চাঁদ॥ ৬+৫=১১

দীর্ঘ একাবলীর মাত্রা সঙ্কেত ৬+৬=১২। যেমন,

চলে কালস্রোত | নাহি দয়া মায়া।
চলে সুখে নিয়া | শিশুবৃদ্ধ কায়া ॥

(ঝ) ত্রিপদী এই পয়ারের প্রতি চরণে তিনটি করিয়া পর্ব থাকে। ত্রিপদী দুই প্রকার—লঘুত্রিপদী (৬+৬+৮), দীর্ঘ ত্রিপদী (৮+৮+১০)।

লঘু ত্রিপদী—

এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী—

বলোনা কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন।
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার, কে তোমার
বলে জীব করনা ক্রন্দন ॥

চৌপদী—প্রতি চরণে চারিটি পর্ব। লঘু চৌপদী-(৬+৬+৬+৫)। যেমন,

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশী বিষে দংশেনি যারে ॥

দীর্ঘ চৌপদী—(৮+৮+৮+৬) বা (৮+৮+৮+১০) যেমন—

ভরদ্বাজ-অবতংশ ভূপতি রায়ের বংশ
সদা ভাবে হত-কংশ ভুরশুটে বসতি।

(পয়ারের অন্ত্যানুপ্রাসের নিয়মটি হইতেছে—জোড় অক্ষরের সহিত জোড় অক্ষরের এবং বিজোড় অক্ষরের সহিত বিজোড় অক্ষরের মিল।)

সনেট বা চতুর্দশপদী—('সনেট' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)

অমিত্রাক্ষর ছন্দ—এই ছন্দটি পয়ারের আধারেই প্রতিষ্ঠিত। পয়ারে ছেদ ও পূর্ণ যতি উভয়েই চরণের শেষে থাকিত। মাইকেল মধুসূদন যতি ও ছেদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া এই দুইয়ের বন্ধন হইতে ছন্দকে মুক্তি দিলেন। পয়ারের

অন্ত্যানুপ্রাসও তিনি তুলিয়া দিলেন। ছেদ ও যতি স্থাপনের এই বিপর্যয়ের ফলে ছন্দে প্রবহমানতা আসিয়াছে। এই প্রবহমানতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল কথা। ইহার ফলে কবিতার অর্থ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাবকে ছন্দের অনুরোধে থামিয়া থাকিতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ পয়ারের দুই চরণের অন্ত্যানুপ্রাস রাখিয়াও এই ছন্দের প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। ইহাকে সমিল অমিত্রাক্ষর বলে।

মধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর :—

কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

সমিল অমিত্রাক্ষর—

নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
দূর বন-অন্তরালে পাণ্ডু চন্দ্রলেখা
আজি অস্ত গেল—আজি কুরু সূর্য একা,
আজি আমি জয়ী।

গৈরিশ ছন্দ :—অমিত্র ছন্দকে আবৃত্তি করিলে গদ্যের মতই শোনায়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অমিত্র ছন্দের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইয়াছেন। তিনি অমিত্রাক্ষরের চৌদ্দ অক্ষরের চরণ ভাঙ্গিয়া ভাবানুযায়ী ছেদ টানিয়া চরণ রচনা করিয়াছেন। ফলে ইহা নাটকীয় সংলাপের উপযোগী হইয়াছে। যেমন—

দেব, তব পদে | শত নমস্কার
হল মম | ভ্রান্তি নাশ,
প্রবুদ্ধ অন্তর | তব বীরবাক্য শুনে।

এক কথায় এই ছন্দে পদ্যের পর্বকেই চরণ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

মুক্তক ছন্দ :—এই ছন্দ সমিল অমিত্রছন্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মিত্রাক্ষরের অবস্থান বুঝাইবার জন্যই পয়ার ও মহাপয়ারের অন্তর্গত পর্বকে ভাঙ্গিয়া রবীন্দ্রনাথ নানা পংক্তিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন। এই ছন্দের চরণগুলি তাই প্রায়শই অপূর্ণ পদী। ইহার পূর্ণ চরণের দৈর্ঘ্য (৮+১০) বা (৮+৬) অর্থাৎ মহাপয়ার বা পয়ার-এর চরণ-দৈর্ঘ্যের সমান। এই ছন্দে পর্বগুলি যুক্ত অবস্থায় পয়ার বা মহাপয়ারের চরণ সৃষ্টি করে, কোথাও একটি অপূর্ণপর্বিক চরণরূপে

অবস্থান করে, আবার কোথায়ও বা তিনটি চরণ একত্র হইয়া একটি ত্রিপদী গঠন করে। মনে রাখিতে হইবে যে এই ছন্দের প্রতিটি ছত্র এক একটি চরণ নয়। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সমিল অমিত্র ছন্দের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে অসম চরণ সমিল অমিত্রাক্ষরও বলা হয়। যেমন—

যদি তুমি মুহূর্তের তরে।
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,
তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে;

অসম চরণ অমিল মিত্রাক্ষর ছন্দ—ইহাও মুক্তক ছন্দ। যেমন,

হে সবিতা! তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অনাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি। আপন সত্তারে
মৃত্যুর অতীত।

ধ্বনি প্রধান ছন্দ—এই ছন্দের চরণস্থ পর্বসমূহে প্রতিটি অক্ষর ধ্বনিই প্রাধান্য লাভ করে। এই জন্য ইহাকে ধ্বনি প্রধান ছন্দ বলে। অক্ষরধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণ হইতেই মাত্রার পরিমাণ স্থির করা যায় এই জন্যই এই ছন্দ ধ্বনিমাত্রিক। এই ছন্দকে এই কারণেই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলা হয়। ইহার রীতি (১) পর্ব স্বরান্ত ও হলন্ত বা কেবল স্বরান্ত অক্ষর দ্বারা গঠিত হয়; (২) একই শব্দের অন্তর্ভুক্ত যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বর, হলন্ত অক্ষরের স্বর, অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ববর্তী হলন্ত অক্ষরের স্বর, ঐ, ঔ এই যৌগিক স্বরদ্বয়—এই সকল ক্ষেত্রে দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরা হয়; এ ছাড়া সকল স্বরই হ্রস্ব বা একমাত্রিক; (৩) ইহার পর্বগুলি চার, পাঁচ, ছয়, সাত অথবা আট মাত্রার হইয়া থাকে; (৪) এই ছন্দের লয় মধ্য। সমস্ত গানই এই ছন্দে রচিত বলিয়া ইহাকে পদ ছন্দও বলা হয়। মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্ত—

১ ২ ১ ১ | ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ | ১ ১
(১) জগৎ জুড়ে | উদাস সুরে | আনন্দ গান | বাজে
১ ২ ১১ | ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ ১ | ১ ১
সে গান কবে | গভীর রবে | বাজিবে হিয়া | মাঝে।

২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ | ২ ১ ১ ২ ১
(২) হাথক দরপন | মাথক ফুল

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ | ১ ১ ১ ২ ১ ১
নয়নক অঞ্জন | মুখক তাম্বুল

(প্রাচীন মাত্রাছন্দে আ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঐ, ঔ—ইহারা দীর্ঘস্বর, ফলে দ্বিমাত্রিক)

শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ—চরণের প্রত্যেক পর্বের গোড়ায় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত বা প্রস্বর পড়ে বলিয়াই এই নাম। ইহাকে বলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দও বলা হইয়া থাকে। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য (১) এই ছন্দের পর্ব স্বরান্ত ও হলন্ত উভয়বিধ অক্ষরের মিশ্রণে গঠিত হয় (২) প্রতি পর্বের প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে প্রবল শ্বাসাঘাত থাকে (৩) পর্বের অক্ষরের স্বর কোনটিই দীর্ঘ নয়, সব হ্রস্ব, যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও হ্রস্ব (৪) প্রতি পর্বে চারিটি করিয়া অক্ষর থাকে, বেশী অক্ষর থাকিলেও দ্রুত উচ্চারণের গতিতে তাহারা চার অক্ষরে পরিণত হইয়া যায় (৫) ইহার চরণগুলি ঊর্ধ্বপক্ষে চার-পর্ব-বিশিষ্ট হয়, শেষের পর্বটি অপূর্ণপদী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' কাব্যে পাঁচ-ছয়টি পর্যন্ত পর্ব ব্যবহার করিয়াছেন। (৬) এই ছন্দের লয় দ্রুত। যেমন—

(১) কে মেরেছে | কে ধরেছে | কে দিয়েছে | গাল
তাইতো খুকু | রাগ করেছে | ভাত খায়নি | কাল

(২) যেদিন ওরা | গিনি দিয়ে | দেখলে কনের। মুখ
সেদিন থেকে | মঞ্জুলিকার | বুক

[শ্বাসপর্বের অর্থাৎ সাদা কথায় পর্বের গোড়াতে একটুকু ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করাই বাঙ্গলা ছন্দের স্বাভাবিক রীতি। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঝোঁক আসিয়া থাকে। কাজেই স্বরধ্বনির প্রাধান্যই এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য নয়। মাত্রা প্রধান বা তানপ্রধান ছন্দেও এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দে চরণের প্রত্যেকটি পর্বের প্রথমে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত পড়ে। ইহার ফলে পর্বস্থিত শব্দের হলন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হয়। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হলন্ত অক্ষর দীর্ঘই থাকে। মাত্রাবৃত্তের সাধারণ পর্ব গঠিত হয় স্বরান্ত অক্ষর লইয়া, বিশেষ পর্ব গঠিত হয় স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের মিশ্রণে; কিন্তু শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের সাধারণ পর্ব গঠিত হয় স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষরের মিশ্রণে, বিশেষ পর্ব শুধুমাত্র স্বরান্ত অক্ষর লইয়া গঠিত

হয়। যেমন,

আ´মি যদি | জ´ন্ম নিতেম | কা´লিদাসের | কা´লে
দৈ´বে হতেম | দ´শম রত্ন | ন´ব রত্নের | ভা´লে

মাত্রাবৃত্তের ঢঙে পড়িলে পর্বগুলি কোনটা চার, কোনটা পাঁচমাত্রার হইয়া যায়। শ্বাসাঘাত দিলে পর্বসন্মিতি ঠিক থাকে। ইহা যে শ্বাসাঘাত ছন্দের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহা বিশেষ পর্বগুলির (কালে, ভালে) দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যাইবে। কারণ ইহারা স্বরান্ত অক্ষর লইয়া গঠিত হইয়াছে। তদুপরি পর্বের গোড়ায় তো প্রবল শ্বাসাঘাত আছেই। অবশ্য কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়।]

গদ্যছন্দ—আমরা গদ্যে কথা বলি। কিন্তু ঐ কথাগুলি একই সুরে একটানা বলি না। ভাব অনুযায়ী কখনও আস্তে কখনও জোরে এইগুলি উচ্চারিত হয়। ফলে অলক্ষ্যে একটা অস্পষ্ট ছন্দের আভাষ পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সার্থক গদ্যশিল্পীদের রচনায় এই ছন্দ উপলব্ধি করা যায়। গদ্যের অন্তর্নিহিত এই ছন্দকে যখন কোন কবি আত্মসচেতনভাবে গদ্য কবিতায় সঞ্চারিত করেন তখনই মুক্তগতি গদ্য কবিতার সৃষ্টি হয়। তখনই নীরস গদ্য রূপে-রসে অপরূপ হইয়া উঠে, 'কোমলে কঠিনে মিলিয়া একটা সংযত রীতির আপনা-আপনিই উদ্ভব হয়।' 'লিপিকা,' 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী' প্রভৃতি গ্রন্থে এই গদ্য কবিতার নিদর্শন মিলে। যেমন,

কিনু গোয়ালার | গলি।
দোতলা | বাড়ীর
লোহার গরাদে দেওয়া | একতলা ঘর
পথের | ধারেই

ইহা নিঃসন্দেহে গদ্য কিন্তু সেই সঙ্গে কবিতা। কারণ ইহার মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। এই গদ্যছন্দ 'মুক্তকছন্দ'-এর মতই কবিতাকে নানা বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়।

ছন্দো-বিশ্লেষণ (Scansion)

ছন্দের বিশ্লেষণ করিতে হইলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিতে হইবে—(১) ছন্দের নাম (২) চরণের পর্ব-বিভাগ (৩(

প্রতি পর্বে কয়টি করিয়া মাত্রা আছে অর্থাৎ মাত্রাবিন্যাস (৪) পর্বগুলি সম-মাত্রিক, না অসম মাত্রিক (৫) স্তবকের চরণ সংখ্যা (৬) কোন অতিমাত্রিক চরণের ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা (৭) ছন্দের লয়।

স্তবকটি পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ছন্দের প্রকৃতিটি (তানপ্রধান, ধ্বনি-প্রধান অথবা স্বরাঘাত প্রধান) বোঝা যায় তবে ছন্দোবিশ্লেষণে কোন অসুবিধা হইবে না। স্তবক পাঠ করিবার পর সাধারণতঃ বিভিন্ন রূপকল্পসহ পয়ার ও স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রকৃতি প্রায়শই বোঝা যায়। ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেলাতেই সন্দেহের সৃষ্টি হয়। পর্বই বাঙলা ছন্দের মূল উপাদান। মধ্যযতি দ্বারা বিভক্ত করিয়া চরণান্তর্গত পর্বগুলিকে প্রথমতঃ বাহির করিতে হয়। মধ্যযতি কোথায় পড়িবে কানই তাহা স্থির করিয়া দেয়। সাধারণতঃ একটি চরণে দুই হইতে চারিটি পর্ব থাকে। অতঃপর পর্বগুলির মাত্রাসংখ্যা (পয়ার ছন্দে শুধু অক্ষর গুণিলেই চলে) নির্ণয় করিতে হইবে। পর্বে সমানসংখ্যক মাত্রা থাকে। কিন্তু ঐ মাত্রা স্থির করিবার বেলাতেই গোলমাল বাধে। কাজেই স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত যে পর্ব চরণ মধ্যে থাকে তাহার মাত্রাই প্রথম গুণিতে হয়। স্বরান্ত অক্ষরের স্বর সর্বদাই হ্রস্ব এবং একমাত্রার হইয়া থাকে। কাজেই স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত পর্বের মাত্রাসংখ্যা নির্ণয় করা সহজ। আর ঐ পর্বে মাত্রাসংখ্যা যাহা হইবে অন্যান্য পর্বের মাত্রাসংখ্যা তাহাই হইবে। যেমন,

পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছ একী | সন্ন্যাসী
বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে

এখানে 'করেছ একী' বা 'দিয়েছ তারে'—এই দুইটি পর্ব স্বরান্ত অক্ষরে গঠিত। ইহাদের মাত্রা সংখ্যা পাঁচ। দেখা যাইবে যে অন্যান্য পর্বগুলিও পঞ্চমাত্রিক। অতঃপর কয়টি পর্ব লইয়া চরণ গঠিত, পর্বগুলি অপূর্ণপদী না অতিপূর্ণপদী তাহা বলিয়া দিতে হইবে। যেমন,

(মা) নিম খাওয়ালে | চিনি বলে | কথায় করে | ছলো। স্বরবৃত্ত ছন্দ ; চারপর্বের চরণ ; প্রতি পর্বে চার মাত্রা ; চরণের পূর্বে একটি অতিপর্বিক (মা) ধ্বনি আছে ; শেষের পর্বটি অপূর্ণপদী। চরণের গোড়ায় যে অতিরিক্ত ধ্বনি থাকে তাহাকে অতিপর্বিক ধ্বনি এবং সাধারণতঃ পর্বের শেষে যে অপূর্ণ পর্বটি থাকে তাহাকে অপূর্ণপদী পর্ব বলে। অতঃপর স্তবকে কয়টি চরণ আছে, প্রত্যেকটি চরণ সমপর্বিক, না অসমপর্বিক. চরণগুলি অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত, না অন্ত্যানুপ্রাস বিহীন তাহা উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে। সর্বশেষে ছন্দের লয় কি তাহাও

বলিয়া দিতে হইবে। যেমন—

১ ১ ১   ১ ২ ১ | ১১ ১   ২ ১ ১ | ২
এ সখি   হমারি | দুখের   নাহিক | ওর

১ ১ ১   ২ ১ ১ | ২ ১   ২ ১ ১ | ২ ১   ২ ১ ১ | ২
ই ভরা   বাদর | মাহ   ভাদর | শূন্য   মন্দির | মোর

সপ্তমাত্রিক পর্ব। প্রথম চরণ তিনপর্বিক। দ্বিতীয় চরণ চতুষ্পর্বিক। উভয় চরণেরই শেষ পর্বটি অপূর্ণপদী। দুই চরণের অন্ত্যানুপ্রাস রহিয়াছে। এই ছন্দের লয় মধ্যম। কাজেই ইহা মধ্যলয়ের ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।

[অলঙ্কার ও ছন্দের অধ্যায় রচনায় মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' ও অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'সাহিত্য দীপিকা' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।]

১৮১ পৃষ্ঠায় ফিল্ডিং-এর স্থানে রিচার্ডসন পড়িতে হইবে।